সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতি

রবীন্দ্র গুপ্ত



চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

Samajtantra O Sanaskriti

a collection of essays on art and literature by

Dr. RABINDRA GUPTA

প্রথম প্রকাশ

শ্রাবণ, ১৩৩০

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর

এন. গোস্বামী

নিউ নারায়ণী প্রেস

১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৭০০০১২

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম : ১৪.০০ টাকা

(Rs. 14.00.)

(গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন)

কথামুখ

'সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতি' লেখকের নানা সময়ে লেখা ষোলটি প্রবন্ধের সঙ্কলন। এদের মধ্যে প্রথম দুটি প্রবন্ধে আত্মিক ঐক্য আছে। এ দেশে সাহিত্য-সংস্কৃতি আলোচনায় বেশ কিছুকাল ধরে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্ত হচ্ছে। গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, রাধারমণ মিত্র, সুশোভন সরকার, সরোজ আচার্য প্রমুখ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এঁদের মধ্যেও মতান্তর আছে, পার্থক্য আছে। সেটা অস্বাভাবিক নয়। এর দ্বারা সমাজতন্ত্র যে মৌমাছিতন্ত্র নয় এবং মার্কসবাদ কোনো দেবতার দোর-ধরা বিশ্বাসের মাদুলি নয়, তারই অভ্রান্ত প্রমাণ মেলে।

মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে সমাজতন্ত্রী শিবিরেও অনেক বিতর্ক। স্বাস্থ্যের লক্ষণ এই বিতর্ক এখনও চলছে। ১৯৫২ সালে 'মডার্ন কোয়ার্টারলি' পত্রিকার কড্ওয়েল বিতর্কের কথা অনেকেরই মনে পড়বে। কিন্তু আমাদের দেশে তেমন-কিছু হয়নি। অবশ্য এক কোটি থেকে একেবারে ভিন্ন কোটিতে দোলনের দৃষ্টান্ত আছে। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কখনো নিন্দার অঙ্কুশে আক্রান্ত, কখনো অতি-প্রশংসায় অর্চিত। তবু আলোচনা হওয়া ভালো।

বর্তমান রচনাগুলি সে কথা মনে রেখেই সঙ্কলিত। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন সময়ের, কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজতন্ত্রের সমস্যা, নেগেটিভ হিরো, ট্রাজেডির রসাস্বাদ, বাংলা নাটকে ট্রাজেডির অভাব ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। রামমোহন বিষয়ক দুটি লেখা একত্রে পড়লে সম্পূর্ণ মূল্যায়নের প্রয়াস চোখে পড়বে। গর্কি, লু স্যুনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের কথা মনে হতে পারে সঙ্গতিহীন। মহৎ

সাহিত্যের ঐতিহ্য যে শেষ পর্যন্ত সমকালের বাস্তবতার আত্মীকরণে, সমাজবিপ্লবের কোনো না কোনো পর্যায়ের প্রতিবিম্বনে —তার নিদর্শন তিনটি প্রবন্ধেই লেখকের অন্বেষা। এখানেই যোগসূত্র। নজরুল ইসলাম, অমরেন্দ্র ঘোষ, সুকান্ত ভট্টাচার্যের আলোচনা সঙ্গত কারণেই এ-বইতে স্থান পেয়েছে।

কিছু বানান ভুল আন্তরিক যত্ন সত্ত্বেও এড়ানো যায়নি।

এবার কিছু ব্যক্তিগত কথা। অরুণ রায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, শ্যামসুন্দর দে, হীরেন ভট্টাচার্য, পল্লব সেনগুপ্ত, শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতা ছাড়া বইটি প্রকাশিত হত না। নন্দন-সম্পাদক সৈয়দ শাহেদুল্লাহের প্রেরণায় রামমোহন মূল্যায়নে ব্রতী হই। রামমোহন বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি 'ক্যালকাটা অ্যাকাডেমি অফ সোশ্যাল স্টাডিজ'-এর অধিবেশনে পঠিত।

রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অর্থানুকূল্যে বইটি প্রকাশিত হল। সে জন্য রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিউ নারায়ণী প্রেসের কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে দ্রুত ছাপার কাজ সম্পন্ন করেছেন, সে জন্য অকুণ্ঠ সাধুবাদ তাঁদের প্রাপ্য।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্র গুপ্ত

উৎসর্গ

বার্হস্পত্য বৈঠকের বন্ধুদের প্রতি

সূচীপত্র

সমাজতন্ত্র ও শিল্পসংস্কৃতির সমস্যা

সমাজতান্ত্রিক শিবিরে শিল্পসংস্কৃতির সমস্যা দেখা দেয় দু' ধরনের। এক, বুর্জোয়া দুনিয়া তার শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজতন্ত্রকে আঘাত হানতে চেষ্টা করে। যেমন সমাজতান্ত্রিক সমাজকে ধ্বংস করার জন্য নানা জঙ্গী চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের আয়োজন, তেমনি নান্দনিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা উঠে-পড়ে প্রমাণ করেন —শিল্প-সংস্কৃতির অপমৃত্যু আসন্ন, মানব সংস্কৃতি বিপন্ন। কারণ প্রতিভা মাত্রেই নিঃসঙ্গ, একক ; কমিউনিস্টরা 'Collective being'-কেই মান্য করে। দল বেঁধে সাহিত্য সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় না। দুই, ভিতরের দিক থেকে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, কৃষক-মজুর সংগঠনে যুক্ত ছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের অনুগত, তাঁরাও শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এমন ভুল মতবাদ প্রচার করতে পারেন যা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্মত নয়, বরং দূরগত সূত্রে প্রতিক্রিয়ার শিবিরকেই মজবুত করে।

কিন্তু মার্কসবাদ যেহেতু ডগ্মা নয়, তাই বাস্তবক্ষেত্রে তার সৃজনশীল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বের মধ্যে সংস্কৃতির উপরিতলের সমস্যা সমাধানেরও ইঙ্গিত রেখে গেছে। মার্কস-এঙ্গেলসের চিঠিপত্র এবং অন্য রচনাবলী থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যে সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তা সংকলন করা যায়, তার মধ্যে প্রধান হল বনিয়াদ-উপরিতল সম্পর্ক, বাস্তবতার স্বরূপ, প্রকৃতিবাদের সঙ্গে তার পার্থক্য, সৃজনকার্যে শ্রমের ভূমিকা, প্রচার ও সুন্দর, অন্য প্রাণীর সৃজনশীলতা থেকে মানুষের সংস্কৃতি-নৈপুণ্যের পার্থক্য এবং কয়েকজন গ্রীক, জার্মান, ইংরেজ, ফরাসী সাহিত্যিক সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য।

১৯১৭ সালে মার্কসবাদী দর্শন লেনিনের নেতৃত্বে প্রথম বাস্তব প্রতিষ্ঠাভূমি পেল সোভিয়েত রাশিয়ায়। তারপরে বেশ কিছুকাল চলল নিরবচ্ছিন্ন ঘরে-বাইরে

সংগ্রাম। শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশ্বপ্রতিক্রিয়াকে পর্যুদস্ত করে নতুন অর্থনীতিক বনিয়াদ রচনা করল। তারই সঙ্গে নতুন উপরিতলের সূচনা। অথচ পাশাপাশি পুরনো চিন্তাধারার প্রভাবও যথেষ্ট প্রবল। সেক্ষেত্রে চাই মতাদর্শের সংগ্রাম। নতুন সমাজ-বনিয়াদ কিছু উৎসাহী শিক্ষক অধ্যাপক কবি শিল্পীকে রাতারাতি নতুন উপরিতল সৃষ্টির নেশায় উত্তেজিত করে তুলল। যেমন বাস্তবক্ষেত্রে, তেমনি শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রেও লেনিন পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদের তত্ত্ব প্রয়োগ করতে শেখালেন। তাঁর প্রধান অবদান —শিল্পসংস্কৃতির শরী·ী সত্তা —Partisanship Principle বা Principle of Commitment, এ ছাড়া শিল্পীর নিজস্ব বিশ্বাস, চিন্তাধারা এবং শিল্পকর্মের স্ববিরোধ, বনিয়াদ-উপরিতলের জটিল, বিপ্রতীপ সম্পর্কে আলোকপাত, 'সর্বহারা সংস্কৃতির' তত্ত্ব এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে মার্কসীয় ধারণার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি সৃজনেও পর্যালোচনে অপরিহার্য। মার্কস-এঙ্গেলসের মন্তব্যগুলি সূত্রাকারে স্মরণ করা যেতে পারে—

১॥ অর্থনৈতিক বনিয়াদ পরিবর্তনের পরই কমবেশি দ্রুতগতিতে সমগ্র সাংস্কৃতিক উপরিতলেরও পরিবর্তন ঘটে। ···কিন্তু বনিয়াদ ও উপরিতলের মধ্যে পরস্পর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিছুই সুস্থির নির্লিপ্ত (passive) থাকে না।

২॥ শিল্পসংস্কৃতির চেতনা বা নান্দনিকবোধ শ্রমেরই বিবর্তনের ফল। চতুষ্পদ জীব থেকে হাতের মুক্তি, মানুষের কল্পনা প্রয়োগ করে ধাতু বা পাথর থেকে আয়ুধ সৃষ্টি, আদিম সাম্যবাদী সমাজে দৈনন্দিন জীবনসংগ্রামেরই অনুকরণে শিল্পসংস্কৃতির সৃষ্টি প্রভৃতি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় ঘটনা।

৩॥ পিঁপড়ে, পাখি, মৌমাছি সকলেই সৃষ্টি করে। পিঁপড়ে তার ঢিবি, পাখি তার বাসা, মৌমাছি তার বহু কামরাযুক্ত চাক। কিন্তু সবই স্থূল প্রয়োজনের তাগিদে। নিজেদের অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখার জন্যে। মানুষ সারা প্রকৃতিকে নিয়েই সৃষ্টি করে, আবার নিজের পছন্দমতো তাকে বদলায়। সেই বদলানোর ইচ্ছাই তাকে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের (Humanization of Nature) সামর্থ্য দিয়েছে। তাই মানুষই কেবল সৌন্দর্যের নিয়মে সৃষ্টি করতে পারে।

৪॥ শিল্পসংস্কৃতির প্রাণ সামাজিক বাস্তবতা ; কিন্তু সমাজবাস্তবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাতেই শিল্পের উৎকর্ষ ঘটে না। বালজাকের 'হিউমেন কমেডি'-কে এঙ্গেলস ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্তী যুগের সার্থক বাস্তবতার নিদর্শন বলেছেন। এবং তিনি আরও বলেছেন, বালজাক পুরনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজেরই প্রতিনিধি ছিলেন। তবু তাঁকে জোলার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে প্রচুর প্রশংসা করেছেন। অথচ যে মিন্না কাউটস্কি উপন্যাসে কমিউনিস্ট পক্ষ অবলম্বন করেছেন, কমিউনিস্ট চরিত্রকে সর্বদা জিতিয়ে

দিয়েছেন, তাঁর উদ্দেশ্যকে সাধুবাদ জানিয়েও এঙ্গেলস বলেছেন, লেখকের শরীকী মনোভাব (Partisanship) চরিত্র বিকাশের স্তরে স্তরে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি। ('The Bias should flow by itself from the situation and action…')

৫। বুর্জোয়া যুগের অভ্যুত্থানে প্রথম বিশ্বসাহিত্যের সম্ভাবনা দেখা দিল। দুনিয়ার বাজারকে শোষণ করে বুর্জোয়ারা প্রত্যেক দেশের উৎপাদন এবং উপভোগকে একটা কসমোপলিটান চরিত্র দিয়েছে। …ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানস-সৃষ্টি এখন বিশ্বের সাধারণ সম্পদ। কারণ একই নিয়মে চলেছে শোষণ ও শোষিতের সম্বন্ধ-বন্ধন। 'From the numerous national and local literatures there arises a world literature.'

এই বহু-আলোচিত মূল সূত্রগুলি মনে রাখলে পরবর্তী যুগে শিল্পসংস্কৃতি প্রসঙ্গে লেনিন ও স্তালিনের তাৎপর্যময় আলোচনাগুলি স্পষ্ট হবে। বোঝা যাবে, সমাজ-তান্ত্রিক শিবিরে শিল্পসংস্কৃতির সমস্যাগুলি কিরূপ আকার নেয়; শিল্পের স্বরূপ বিচারে কি ধরনের বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে এবং লেনিন-স্তালিনের সমাধানপ্রয়াস আজও আমাদের সঠিক দিশারী। শিল্পসংস্কৃতি বিচারে মার্কসবাদের যান্ত্রিক বা আক্ষরিক প্রয়োগের সর্বনাশা ঝোঁক সম্বন্ধেও তাঁরা আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন।

১৯০৫ সালে লেনিন লেখেন 'পার্টি সংগঠন ও সাহিত্য।' তাতেই প্রথম শিল্পসংস্কৃতির শরীকী সত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তিনি বললেন, পার্টি নেতৃত্বে সংগঠিত জনগণ সমাজতন্ত্র গড়বে, সুতরাং সাহিত্য-সংস্কৃতিকেও সেই গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। অনেকে মনে করেন, দেশের বিশেষ মুহূর্তে তিনি এ কথা বলেছেন; আবার গর্কি পার্টি-সাংবাদিকতায় না যোগ দিয়ে সৃষ্টিকর্মে আরও বেশি ব্রতী হলে তিনি খুশী হবেন জানিয়েছিলেন। তবে কি সাহিত্যের 'ফলিত' ও 'বিশুদ্ধ' সত্তা লেনিন মানতেন? এর চেয়ে অসত্য, উদ্ভট আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু কেউ কেউ ব্যাখ্যা দিলেন, আপৎকালীন অবস্থার জন্য Principle of Commitment, এ-ছাড়া স্বভাবত শিল্পসাহিত্য অন্য নিরপেক্ষ। স্বয়ং মার্কস স্বপক্ষে উদ্ধৃত হলেন, 'The writer in no way regards his works as a means. They are end in themselves.' এখানেই না-কি অনেকে 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য, 'স্বাধীন' সংস্কৃতি চিন্তার উৎস পেয়ে গেলেন।

কিন্তু লেনিন কোথাও আবেগ-অনুভূতি সঞ্চারের শিল্পগত দায়িত্বকে গৌণ করেননি; এবং শিল্পীর শিল্পপ্রেরণার মুক্তির জন্যই চাই সমাজপ্রেক্ষিতের আত্মীকরণ। 'শিল্প সম্বন্ধে আমাদের মতামতটা বড় জিনিস নয়। কোটি কোটি, কয়েক শ', এমন কি কয়েক হাজার মানুষ শিল্প থেকে কী পেল সেটাও জরুরী নয়। শিল্প জনগণের সম্পদ। …তাদের অনুভব, চিন্তা ও অভিপ্রায়কে সমন্বিত করতে হবে।' এতে শিল্পীর স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় না। বুর্জোয়া সমাজে শিল্পীর স্বাধীনতা

মানে টাকার দাসত্ব, প্রশাসনের আনুগত্যে মোক্ষলাভ। 'The Freedom of bourgeois writer, artist or actress is simply masked (or hypocritically masked) dependence on the money-bag, on corruption, on prostitution.' সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সামিল শিল্পসংস্কৃতিই যথার্থ স্বাধীন। কারণ, it will serve, not some satiated heroine, not the bored 'upper ten thousand' suffering from fatly degneration, but the millions of working people.

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনকে লেনিন তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন: (১) পুশকিন, লারমন্তভ প্রমুখ বিপ্লবী অভিজাতবর্গই উল্লেখযোগ্য। (২) বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের আবির্ভাব —নেক্রাসভ, হারজেন, বেলিন্স্কি, চেরনিসেভস্কি, দব্রোলুবভ প্রমুখ এই পর্যায়ের। (৩) শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত, যার পরিণতি শ্রমিক-কৃষক শক্তির ক্ষমতালাভ —১৯১৭ সালের বিপ্লবে। সমগ্র দেশে (সমগ্র বিশ্বেও) নতুন মূল্যবোধ —সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক চেতনা শিল্পসাহিত্যেও নতুন মূল্যমান সৃষ্টি করল। মায়াকভস্কি-গর্কি থেকে শলোকভ-আলেক্সি তলস্তয় পর্যন্ত জনগণসান্নিধ্যের এক নতুন দিক, সাম্যবাদের জন্য শরীকী চেতনার উদ্দীপন এই পর্যায়ে বিশেষ লক্ষণীয়।

এই তিন পর্যায়ের প্রধান শিল্পীদের কাছেই 'integral part of the Proleterian Cause' হিসেবে শিল্পসংস্কৃতির দায়িত্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল। লেনিন কথিত 'inexorably objective analysis of realities' সাহিত্য-শিল্পের কাজ হলে সুন্দরের সাধনা এই শরীকী চেতনা ব্যতীত অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। 'The Heritage We Renounce' রচনাতেও তিনি এ বিষয়ে জোর দিয়েছেন।

মার্কসের সূত্র (লেখক জীবিকার জন্য লিখবেন না, বাঁচবার জন্যই লিখবেন) উদ্ধৃত করে হেনরিয়েটা হোলস্ট্ 'Studies on Socialist Aesthetics' (১৯৬০) গ্রন্থে লিখেছেন, 'It is common knowledge that art does not recognise any goal outside itself; It sees its meaning in itself.' মার্কস এঙ্গেলস-লেনিনের উক্তির সঙ্গে এই উদ্ধৃতি আপাত সঙ্গতিপূর্ণ, অথচ মূলত মার্কসবাদ-বিরোধী এই চিন্তাধারা রাশিয়াতেও প্রাধান্য পেয়েছিল। এ যেন কার্ল কাউটস্কির ঘোষণারই (Communism in material production, anarchy in intellectual production) উত্তরপর্ব।

এক সময়ে 'ভেখি' নামক রচনাসঙ্কলনে লেনিনবাদের বিকৃতি প্রকাশ পেয়েছিল। অন্যদিকে শরীকী সত্তার ওপর জোর দিতে গিয়ে একদল আন্তরিক সৎ শিল্পী-সাহিত্যিকও অতিসরলীকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অর্থাৎ তাঁরা প্রচার করতে থাকেন, সমাজতান্ত্রিক চেতনা দ্রুত সম্প্রসারণের জন্য পূর্ববর্তী সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা দরকার। কি প্রয়োজন ঐ সব বনেদী অবসরবিলাসীদের সৃষ্টি! ও সব

ভেঙে ফেলা দরকার। তবেই তরুণদের চিত্ত যথার্থ সমাজতান্ত্রিক শিল্পসংস্কৃতি সৃজনের এবং আস্বাদনের যোগ্য হবে। পুরনো সংস্কৃতির জড় তাহলে আর বাধা সৃষ্টি করবে না। ১৯২৩ সালে লেভিডফ লিখলেন, শতকরা নব্বই জন যখন অশিক্ষিত, তখন পুশকিন, চেখভ, বুনিন, ব্লক প্রমুখের আবির্ভাব ঘটেছে। সংস্কৃতিকে জনগণের সমীপবর্তী করলে আরও শিল্পী-সাহিত্যিক প্রতিভার উদয় হবে। সুতরাং, 'The Museum-bottle in which culture floated on sweat, blood and tears like a proud white swan, must be smashed.' এই প্রবণতা মারাত্মক এবং অ-মার্কসীয়। অথচ সমাজতন্ত্রের পিতৃভূমিতেই এই প্রবণতা এক সময় মাথা চাড়া দিয়েছিল। যেমন আমাদের দেশে রিভাইভালিস্টদের প্রাচ্যবিদ্যাসর্বস্বতা এবং প্রগতিশীল জনগণের অতীত ঐতিহ্য বিষয়ে অনীহা যথার্থ সামাজিক বাস্তবতাবোধের অন্তরায়। দুই চরম পন্থাই সঙ্কীর্ণ, সত্য থেকে দূরবর্তী, সুতরাং বর্জনীয়।

আলেক্সি তলস্তয় লিখেছেন, 'আমি যতক্ষণ না মার্কসবাদসম্মতভাবে বুঝতে শিখেছি, ততক্ষণ আমি প্রকৃত শিল্পীদের স্বাধীনতার স্বাদ পাইনি।'

হারজেন, বেলিন্স্কি, দব্রোলুবভ, তলস্তয় প্রমুখের আলোচনায় লেনিন বনিয়াদ-উপরিতলের বিপ্রতীপ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। হারজেন বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি নারদনিক; কিন্তু জারতন্ত্র উচ্ছেদে তিনি কৃষক-অভ্যুত্থানের আন্তরিক সমর্থক। বুর্জোয়া ভাবধারায় আক্রান্ত, ঈশ্বরবিশ্বাসী ধার্মিক লোক হলেও লেনিনের মতে হারজেন 'stood on the threshold of Dialectical Materialism and halted —before Historical Materialism.' দেশের বাইরে থেকে তিনি কৃষক-অভ্যুত্থানের সংবাদকে বহির্বিশ্বে প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে বিপ্লবের কাজকেই ত্বরান্বিত করেছেন। চেরনিসেভস্কি, বাকুনিন, তুর্গেনেভের সঙ্গে তাঁর মতভেদের মূলেও আছে বলিষ্ঠ মানবপ্রীতি। শ্রেণীসংগ্রাম এবং সর্বহারাশ্রেণীর শক্তিতে হারজেনের যেহেতু অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাই লেনিনের মতে, প্রতিটি শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির হারজেন-বার্ষিকী পালন করা উচিত।

তলস্তয়-প্রসঙ্গে লেনিনের রচনাবলী তাঁর সাহিত্য বিচারবোধের বিস্ময়কর নিদর্শন। যে সব শিল্পী-সাহিত্যিক শিল্পের শরীকী সত্তায় বিশ্বাসী নন, এমন কি বিরোধী, তাঁরাও সেই শরীকী তত্ত্বের নিরিখে মহৎ শিল্পী হতে পারেন। আজও মার্কসীয় সাহিত্যবিচারে এই প্রবন্ধগুলি পথনির্দেশক। লেনিন এমন একজন শিল্পীকে রুশ বিপ্লবের দর্পণ বলেছেন, যিনি কখনও বিপ্লবের রাজনীতিকে সমর্থন করেননি, বরং কমিউনিজম, বলশেভিক, বিপ্লবী প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে বিরক্ত হয়েছেন। তলস্তয় ছিলেন ঈশ্বরে এবং মানুষের নৈতিক শুদ্ধিতে (moral purification) বিশ্বাসী। বিদেশের পত্রিকায় বিপ্লবের বিজয় মুহূর্তেও তলস্তয় রুশ সমাজ ও বলশেভিক আদর্শের নিন্দা করেছেন। তবু লেনিন তাঁকেই বিপ্লবের

মহান্ শিল্পী বলেছেন। কারণ তিনিই রাশিয়ার প্রথম শিল্পী যিনি যথার্থ 'মুজিক' চরিত্র (দরিদ্র কৃষক) সৃষ্টি করেছেন। তিনি কৃষকদের জমি বিলিয়ে দিয়ে নিজে মুজিকের জীবন কাটিয়েছেন। শ্রেণীমোহের শৃঙ্খল ভাঙতে তলস্তয় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি 'সামাজিক মিথ্যাচার ও কপটতার বিরুদ্ধে' সোচ্চার, ১৮৬১ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে রুশ সমাজের আমূল পরিবর্তনের যথার্থ চিত্র তিনিই এঁকেছেন। (অন্যদিকে আছেন 'তলস্তয়বাদী' —রুশ বুদ্ধিজীবী বলে অভিহিত পরিশ্রান্ত মৃগীরোগগ্রস্ত ছিঁচকাদুনে, যিনি সর্বসমক্ষে বুক চাপড়াচ্ছেন আর হাহাকার করছেন —তলস্তয়-শিল্পীব্যক্তিত্বের এই নেতিবাচক দিকও নিখুঁত বিশ্লেষিত।) লেভিনের চিন্তায় (আনা কারেনিনা) সেই বনিয়াদ-রূপান্তরের ছবি ফুটেছে।

'ফসলের কথা, মজুর ঠিকে করার কথা এবং এ রকমের আরও সব কথাকে খুব ইতর ধরনের একটা কিছু মনে করাই ছিল রেওয়াজ, লেভিন তা জানত। …কিন্তু সেগুলোই এখন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে হতে লাগল।' এই 'তলস্তয়-প্রসঙ্গ' থেকে সিদ্ধান্তে আসা গেল, 'তিনি যদি বাস্তবিকই মহান্ শিল্পী হন, তাহলে তাঁর রচনাবলীতে নিশ্চয়ই বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির অন্তত কয়েকটিকেও প্রতিফলিত করবেন।' এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই স্তালিনের আমলে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের স্বপক্ষে পৃথিবীর মহান্ সাহিত্যিকদের রচনাকৃতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। ইবসেন, বার্নাড শ, গলসওয়ার্দি, রমাঁ রলাঁর সঙ্গে গ্যেটে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, ভিক্টর হুগো, আবিসেনা, কালিদাস, অলবেরুণি প্রভৃতি শিল্পীর উত্তরাধিকার যে সর্বহারা মানবতাবাদেরই অনুকূল —এই বিশ্বাস ঘোষিত হয়েছে।

আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। ডস্টয়েভস্কির উপন্যাস 'The Possessed' মস্কো আর্ট থিয়েটারে অভিনীত হলে তীব্র আক্রমণ করে গর্কি লেখেন, On the karamazov Attitude, (২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৩)। স্বভাবতঃই কারামাজভ-দর্শন এবং ডস্টয়েভস্কির জীবনদর্শনকে গর্কি আঘাত করেছিলেন। বুর্জোয়া সংবাদপত্র গর্কির প্রবন্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তখন গর্কি আবার একটি প্রবন্ধ লেখেন Once again on the Karamazov Attitude।

সেই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য যতই মার্কসবাদী দৃষ্টিতে প্রশংসনীয় হোক, গর্কির চিন্তাধারায় কিছু বিচ্যুতি ছিল। লেনিন (১৯১৩-র নভেম্বর ১৩/১৪ তারিখে) এই প্রসঙ্গে লেখেন, গতকাল 'রেচ' (ভাষণ) পত্রিকায় ডস্টয়েভস্কির ওপর আপনার আক্রমণ পড়ে আমি আনন্দ পেলুম। কিন্তু আজ আর একটি কাগজে আপনার লেখা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, তাতে এমন একটি অনুচ্ছেদ দেখছি যা 'ভাষণ' পত্রিকায় ছাপা হয়নি। অনুচ্ছেদটি এই—

'And God-seeking' should be for the time being (only for the time being ?). Put aside —it is a useless occupation, its' no use

seeking where there is nothing to be found. Useless you sow, you can not reap. You have no God, you have not yet (Not yet !)' ...Created him. Gods are not sought —they are created ; People do not invent life, they created it.' তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে লেনিন এই অনুচ্ছেদে বিবৃত অ-মার্কসীয় চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করেছেন। 'আপাতত ঈশ্বর খোঁজা শিকেয় তোলা থাক ?' এতে মনে হয়, গর্কি যেন 'God-seeking'-এর বদলে God-building চান।

প্রাক-বিপ্লব যুগের মহান্ শিল্পীদের রচনাবলী সম্পর্কে লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গী আজও পুরনো শিল্পীদের ভূমিকা নির্ণয়ে আমাদের পথপ্রদর্শক।

১৯২০ সালে লেখা লেনিনের 'যুবকর্মীদের প্রতি নির্দেশ' এবং 'সর্বহারা সংস্কৃতি' বিষয়ের আলোচনাও সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে সৃজনশীল সম্প্রসারণের দৃষ্টান্ত। যুব কমিউনিস্টদের মধ্যে যা বুর্জোয়া, সামন্ততন্ত্রী চিন্তাধারার ঐতিহ্য, তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করবার একটা প্রবণতা দেখা যায়। 'গণসংস্কৃতি' বা 'সর্বহারা সংস্কৃতি' বলতে তাঁরা বোঝেন, প্রত্যক্ষভাবেই মেহনতী শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করা, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে আক্রমণ করা। তাঁরা পুরনো চিন্তাধারা বা ঐতিহ্যকে একেবারেই মূল্য দিতে চান না ; তার অনুশীলন করা দূরে থাক, সাধারণ পরিচয় নেওয়াকেও তাঁরা প্রাচীনপন্থী বা প্রতিক্রিয়াশীল ঝোঁক মনে করেন। এর চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছু নেই। মার্কসবাদের নামে এ হল মার্কসবাদের বিকৃতি। মায়াকভস্কি পড়া ভালো, কিন্তু পুশকিন-বর্জন চিন্তাদৈন্যের পরিচায়ক।

লেনিন যুব কমিউনিস্টদের স্পষ্টই নির্দেশ দিয়েছেন, বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারাও জানতে হবে, মার্কসীয় চিন্তাধারায় পূর্বতন ইতিহাসও গভীরভাবে অনুশীলন করতে হবে। লেনিনের উক্তি, 'Proletarian culture is not something that has sprung nobody knows whence, it is not an invention of people who call themselves experts in proletarian culture. That is all nonsense. Proletarian culture must be the result of a natural development of the stones of knowledge which mankind has accumulated under the yoke of Capitalist society, landlord society, bureaucratic society.' যেমন মার্কসের দ্বারা পুনর্বিন্যস্ত অর্থনীতি আমাদের দেখিয়েছে, মানবসমাজের চূড়ান্ত পরিণতি কোন দিকে, দেখিয়েছে অন্তবর্তী স্তর থেকে শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সর্বহারা বিপ্লবের সূচনা পর্যন্ত ক্রমবিকাশ, তেমনি সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির সব পথই শেষ পর্যন্ত গিয়ে মিলবে সর্বহারা সংস্কৃতিতে। বগ্দানভ ও লুনাচারস্কির 'প্রোলেটকাল্ট' মতবাদকে তিনি তত্ত্বগতভাবে অসার এবং কার্যত ক্ষতিকর বলেছেন। 'বুর্জোয়া দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন নয়, এমন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিউনিজম গড়া সম্ভব হলে সেটা খুবই সহজ হয়ে যায়

বটে, তবে সে কমিউনিজম হবে আকাশ-কুসুম। আর তেমন আকাশ-কুসুম কমিউনিজমের স্বপ্ন যারা দেখে, কাজের লোকেদের প্রতিটি সম্মেলন থেকে তাদের তাড়ানো উচিত এবং থাকতে দেওয়া উচিত কেবল তাদের —যারা পুঁজিবাদের অবশেষ থেকেই কাজ চালাতে পারে।'

পুঁজিবাদী সমাজ বা সামন্ততন্ত্রী সমাজের বিজ্ঞান, যন্ত্র, শিল্প-সাহিত্যের উত্তরাধিকারকে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও অনুশীলন করতে হবে। নতুবা মানুষের সংস্কৃতি-চেতনা তথা নান্দনিক বোধ পূর্ণাঙ্গ হবে না। .লেনিনের উক্তি, 'আমরা যদি পরিষ্কার করে এ কথা না বুঝি —মানবজাতির সমগ্র বিকাশের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট সংস্কৃতির যথাযথ জ্ঞানলাভ করেই এবং সে-সংস্কৃতিকে ঢেলে সেজেই কেবল আমরা প্রোলেতারীয় সংস্কৃতি গড়তে পারি।' 'ঢেলে-সাজা'র ইঙ্গিত মার্কসের 'পুরনো শিল্পরীতি প্রয়োগ বিষয়ক' মতামতেও আছে। একই ইমারতের উপকরণ দিয়ে যেমন ধনীর প্রাসাদ, তেমনি কৃষকদের জন্য হাসপাতাল হয়। জ্ঞানের উপকরণগুলিকে সেইভাবে জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করাই সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির লক্ষ্য। 'পুঁজিবাদী, সামন্ত ও আমলাতন্ত্রী সমাজের জোয়ালের নীচে মানবজাতি যে জ্ঞানভাণ্ডার জমিয়েছে, প্রোলেতারীয় সংস্কৃতিকে হতে হবে তারই সুনিয়মিত বিকাশ।'

লেনিনের মৃত্যুর পর সমাজতন্ত্র সাম্যবাদে উত্তরণের পথে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বিজ্ঞানের সহযোগিতায় নতুন নতুন আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ সমাজতন্ত্রের বনিয়াদকে দৃঢ়তর করেছে। ধনবাদী শিবিরও তার আক্রমণের কায়দা বদলেছে। তাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্তালিনের নেতৃত্বে সেগুলির সঠিক সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। স্তালিনের আমলের সবচেয়ে বড় বিপদ ফ্যাসিবাদ। কিভাবে শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার মোকাবিলা হয়, ইতিহাসে তার নজির আছে। লেনিনের principle of commitment-কে নতুন প্রেক্ষিতে স্তালিন আবার গুরুত্ব দিলেন। সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে সোভিয়েত জনগণের সাফল্যের কথা শিল্প-সাহিত্যে রূপ দিতে হবে। লেখক সমিতিগুলিও এই নীতি ঘোষণা করেন। যৌথখামার ব্যবস্থায় চাষীর অবস্থার উন্নতি, সাখারিন অঞ্চলের জেলেদের নতুন সংগঠন গড়ে ওঠা, স্তাখানভাইট আন্দোলন প্রভৃতি উপন্যাস-নাটকের বিষয়বস্তু হল। কাব্যেরও ফর্মে একটা সরলীকরণের ঝোঁক দেখা গেল। তবুও মনে রাখতে হবে পাস্তারনাকের কাব্য, শেক্সপীয়র-অনুবাদ ও অভিনয়, শলোকভের, এরেনবুর্গের উপন্যাসও স্তালিন আমলেরই রচনা। সমাজতন্ত্রের নতুন সাহিত্যকে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র উৎসাহ দিয়েছে লেনিন পুরস্কার দিয়ে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সাফল্য বিশ্বের মানুষের কাছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। নতুন বনিয়াদেই নতুন নায়কের জন্ম। এরেনবুর্গের 'ঝড়', 'নবম তরঙ্গ', 'প্যারীর পতন', ভান্দা

ভাসিলিয়েভস্কা-মিখাইল শলোখভের উপন্যাস-ছোটগল্প, নিকোলাই টিখোনভ, স্যামুয়েল মারশাক, আলেক্সি সুরকভ, ইলিয়া ফ্রেংকেলের কবিতা সার্থক নতুন উপরিতলের নিদর্শন। এভাবেই নাটকে কথাসাহিত্যে 'positive hero'-র উদ্ভব।

বলা বাহুল্য, 'পজিটিভ হিরো' সৃষ্টির অর্থ এই নয় যে, সমাজতন্ত্রী সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অসাফল্য, ব্যক্তিগত অসন্তোষ, শ্রেণীগত সংকীর্ণতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, পুরনো সংস্কৃতির প্রভাব, পেটি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি সমাজে নেই বা সাহিত্য-শিল্পে স্থান পাবে না। পাভলেংকোর (হ্যাপিনেস) 'সুখ', অস্ত্রোভস্কির (হাউ দ্য ষ্টীল ইজ টেম্পারড) 'ইস্পাত', আলেক্সি তলস্তয়ের (অর্ডিয়াল) 'অগ্নিপরীক্ষা', চাকোভস্কির (ইট ইজ মরনিং হিয়ার) 'এখন সকাল' উপন্যাসগুলিতে যেমন নতুন নায়কের আবির্ভাব, তেমনি মানুষের দুর্বলতা, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির মনোবলের পার্থক্যও সু-অঙ্কিত।

পাভলেংকোর 'সুখ' এবং অস্ত্রোভস্কির 'ইস্পাত' বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, স্তালিনযুগে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি সাহিত্য-সংস্কৃতিরও নবপর্যায় সূচিত করেছে। কোনো কোনো লেখক আক্ষরিক অর্থে 'পজিটিভ হিরো'-র নীতি গ্রহণ করেছিলেন—সে তাঁদের ত্রুটি। কিন্তু সেই ত্রুটি বিষয়ে লেখকেরা অবহিতও ছিলেন। নানা লেখক-সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে তার পরিচয় আছে। একালের সোভিয়েত সমালোচক বলেছেন, 'A certain section of writers, in particular playwrights, fell victim to the no-conflict theory which is alien to the Leninist principle.' (আধুনিক নন্দনতত্ত্বের সমস্যা পৃ:. ৩৩) তাঁর মতে এই হল পার্সোনালিটি কাল্টের ফলশ্রুতি। অথচ স্তালিনের আমলে প্রাভদায় লেখা হয়েছে, রুশ সাহিত্যে, বিশেষত নাটকে সমাজতন্ত্রের জয় ঘোষণার আনন্দে দ্বন্দ্বহীন অবাস্তব জীবনচিত্র অঙ্কন করা হচ্ছে। 'It is the duty of the art of socialist realism to examine all aspects of life, to reflect faithfully the rich intellectual and emotional life of the Soviet Citizen, to depict life in all its variety, revealing the struggle between the new and the old.' শুধু তাই নয়, লিতুরানায়া গেজেটে আলেক্সি সুরকভ নাটকের এই দ্বন্দ্বহীনতা যে অসত্য এবং অ-শিল্প তা বিশদ বিশ্লেষণ করেন। প্রাভদা 'Overcome the lag in Dramaturgy' প্রবন্ধে ('theory that there are no more conflicts to depict') এই ধারণাকে তীব্র আক্রমণ করে। সোভিয়েত লিটারেচারে এ কথাও লেখা হয় (আগস্ট ১৯৫২), কর্মী মানুষকে দেখাতে গিয়ে ব্যক্তি মানুষ বাদ পড়েছে। সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা ব্যক্তির বিচিত্র অন্তর্জগতকেও ('adequate depiction of the rich inner world of the individual') রূপায়িত করে। সেদিকে যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এত বছর পরে স্তালিন-নেতৃত্বে গড়া বনিয়াদের ওপর

দাঁড়িয়ে নতুন সোভিয়েত সমালোচক যা বলেছেন, স্তালিন স্বয়ং এবং স্তালিনযুগের সাহিত্য-শিল্প সমালোচকেরা আরও চড়া সুরে সে কথা বলেছেন। তবু সেই ক্রটি স্তালিনেরই 'ব্যক্তিত্ব'-সর্বস্বতাজনিত ?

এরেনবুর্গের 'Writer and his craft' নতুন নায়কের তত্ত্ব স্বীকার করেছে। প্রকৃতির বাধা জয় করা এবং মানব-কল্যাণের জন্য ব্যাধির বিরুদ্ধে জেহাদ ; চন্দ্র সূর্যলোকে অধিকার বিস্তারের কথাও আছে।

লেনিন-স্তালিনের আমলে রাশিয়ায় ট্র্যাজেডি রচন' হয়নি বলাই সমীচীন। পজিটিভ হিরো ট্র্যাজিক চিন্তার বিরোধী ; ট্র্যাজেডি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানুষের বৈকল্যের চিত্র। কিন্তু এ বিষয়ে রাষ্ট্রের কোনো কঠোর নির্দেশ ছিল মনে হয় না। কারণ শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলি সমাদরেই স্তালিন-আমলে অভিনীত হয়েছে। 'বায়রন বেঁচে থাকলে প্রতিক্রিয়াশীল হবার সম্ভাবনা ছিল' —মার্কসের এই উক্তি সত্ত্বেও সোভিয়েত দেশে বায়রন-চর্চা ব্যাহত হয়নি। পুশকিন, তলস্তয় সম্পর্কে নতুন মূল্যায়নও (কে. লমুনভ) প্রকাশিত হয়েছে। গর্কি সম্বন্ধে একাধিক গবেষণাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ভাষা-প্রসঙ্গে রাশিয়ায় ১৯৪৯-৫০ সালে প্রবল তত্ত্ব সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। অধ্যাপক এন. ওয়াই. মার এবং তাঁর নেতৃত্বে বহু ভাষা-তত্ত্ববিদ মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন মতামত উদ্ধৃত করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, 'সর্বহারা সংস্কৃতি'-র মতো 'সর্বহারা ভাষা' একটা গড়ে উঠবে ; তাই হবে বিশ্বের মেহনতী সম্প্রদায়ের ভাষা। অনেক প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনার পর 'প্রাভদা' আলোচনা আহ্বান করেছিল। দুশোর বেশি প্রবন্ধ জমা হল। স্তালিন লিখলেন, 'Concerning Marxism in Linguistics' এবং কয়েকটি প্রশ্নোত্তর। এ বিষয়ে প্রাভদা সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করে, 'In his remarkable works on Linguistics, Comrade Stalin provided a classical example of the creative application of the dialectical method in the sphere of the science of language.' —এ কথা আজও স্মরণযোগ্য।

স্তালিনের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত —ভাষা কোনো বিশেষ সময়ের বনিয়াদ বা উপরিতল নয়। 'বুর্জোয়া ভাষা', 'কৃষকের ভাষা', 'শ্রমিকের ভাষা' সাধারণত ব্যবহৃত হয় আঞ্চলিক বা শ্রেণীগত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য অথবা শব্দগত (semantics) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। তার দ্বারা বৈজ্ঞানিক অর্থে স্বতন্ত্র ভাষা বোঝায় না। রুশ অভিজাতরা কথা বলতেন ফরাসী ভাষায়, তাই বলে কি ফরাসী 'অভিজাতদের ভাষা' ? ফরাসী শ্রমিক কোন ভাষায় কথা বলেন ? সমাজের নানা শ্রেণীর শত সহস্র বৎসরের উদ্যমে ও ব্যবহারে ভাষার বিকাশ। ভাষা হচ্ছে আদান-প্রদানের মাধ্যমে, সড়ক বা সেতুর মতো। নিজের স্বার্থে ভিন্ন শ্রেণী ভিন্নভাবে ভাষা ব্যবহার করেন। 'A language, therefore, lives incomparably longer than any foundation or any superstructure.' 'ইংলণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা'—

এঙ্গেলসের এই প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি যোগে দেখানো হল, শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীদৃষ্টির মতো শ্রেণী-ভাষাই মার্কসবাদ-সম্মত। ('The workers speak other dialects, ...a different religion and other politics than those of the bourgeoisie'.) লেনিন যেহেতু দুই সংস্কৃতির (বুর্জোয়া ও সমাজতন্ত্রী) কথা বলেছেন, সুতরাং ভাষারও শ্রেণীচরিত্র নিরূপণ না-কি তাঁর লক্ষ্য ছিল।

স্তালিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন লেনিনের মন্তব্য, 'Language is the most important means of human intercourse. Unity of language and its unimpeded development are one of the most important conditions. ...for a free and broad grouping of the population in all its seperate classes.'

সুতরাং 'ভাষা'-র শ্রেণীচরিত্র স্বীকৃতি মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুতিরই নিদর্শন। স্বয়ং স্তালিনের মন্তব্যও উদ্ধৃত করা হয়েছিল। এ কথা ঠিক, বিশ্বের সর্বত্র সর্বহারা শ্রেণীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে মেহনতী বিশ্ব এক বা কতিপয় মাত্র ভাষাতেই ভাবের আদান-প্রদান করবে। কিন্তু স্তালিন বলেননি, ভাষাবিজ্ঞানীদের নিরীক্ষাগারে এস্‌পারেন্টোর মতো তা তৈরি করা যাবে। এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সত্ত্বেও এন. ওয়াই. মারের প্রভাব কার্যকর ছিল। তাই অধ্যাপক ডি. ব্লাগোই আবার স্তালিনের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, সোভিয়েত লিটারেচার)।

সব শেষে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন প্রমুখের উদ্ধৃতি যেন কেতাবী সম্পদ রূপেই আমাদের নতুন সিদ্ধান্ত নেবার স্পর্ধা না জোগায়। সমগ্র মার্কসবাদের তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে। 'Marxism is the science of the laws governing the development of nature and society. ...Marxism as a science can not stand still, it develops and improves.' (২৮শে জুলাই, ১৯৫৩, স্তালিন)। ১৯১৯ সালের ১৪ই মার্চ লেনিন বলেছিলেন, 'পুঁজিবাদ যে সংস্কৃতি রেখে গেছে তার সবটাই আমরা গ্রহণ করব এবং তা দিয়েই সমাজতন্ত্র গড়ব। আমরা অবশ্যই তাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, শিল্পকলা গ্রহণ করব।' এই লেনিনবাদী বিশ্বাস থেকেই স্তালিন বলেন, ভাষার সমগ্র উত্তরাধিকারই জনগণের জন্য।

কে. ঝেলিনিস্কির 'সোভিয়েত সাহিত্য : সমস্যা ও জনগণ' (১৯৫৩) বইতে দুটি অধ্যায় রেখেছেন (১৩শ পরিচ্ছেদ): 'তিরিশের দশক, আধুনিক নায়ক, নিকোলাই অস্ত্রোভস্কি' এবং (১৪শ পরিচ্ছেদ) 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সোভিয়েত সাহিত্য'। 'আধুনিক নন্দনতত্ত্বের সমস্যা' নামে আর একটি প্রবন্ধ সঙ্কলনও (১৯৫৯) রাশিয়া প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি তত্ত্বমূলক এবং

তথ্যনির্ভর। প্রাক-বিপ্লব যুগ থেকে আরম্ভ করে সমাজতন্ত্রের নানা পর্যায়, বাস্তবতা বোধের বিবর্তন, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী সাহিত্য-সংস্কৃতির তুলনা প্রভৃতি আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কোনো বইতেই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্তালিনের ভূমিকা উল্লিখিত হয়নি। পার্টি-রাষ্ট্র বিশ্ব ফ্যাসিবাদের সঙ্গে লড়াইয়ে যে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করল, সে জন্য সর্বোপরি প্রশংসনীয় জনগণের অমিত সংঘশক্তি, সমাজতন্ত্রী চেতনা; কিন্তু সেই পার্টি-নেতৃত্বের যিনি কর্ণধার তিনি কি সেই যৌথ একনায়কতন্ত্রের বাইরে? যে মর্যাদা সেনাপতিবর্গ, কারিগর, লালফৌজ, সাহিত্যিকবর্গ পাবেন, সব কিছুর পরিচালক সে-মর্যাদার নিশ্চয়ই প্রধান কারণ। মনে পড়ছে, ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত Heroic Leningrad বইটির কথা। কেবল দলিলপত্র যোগে সেখানে লেনিনগ্রাদ বে-দখল এবং পুনরায় দখলের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি স্তরে কেমনভাবে স্তালিন ছিলেন শীর্ষ-পুরুষ তার ডকুমেণ্টারি প্রমাণ আছে। এখন সেই লেনিনগ্রাদ মুক্তি-সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের আত্মকথা প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং এই বইটিরও নতুন মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এর মধ্যে আছে আলেকজান্দার ফাদায়েভ, নিকোলাই চুকোভস্কি, নিকোলাই তিখোনভের মতো লেখকের রচনা। লিওনিদ লিওনভ 'সাহিত্য ও সময়' (১৯৫৪) বইতে এবং এরেনবুর্গ 'নভিমির' (১৯৫৪) পত্রে স্তালিন-আমলের 'পজিটিভ হিরো'-কে খুব আক্রমণ করেছেন। কিন্তু স্বীকার করতে হয়েছে সমাজতন্ত্রের নতুন নায়ক চরিত্র 'In all their potential variety, in all their richness of character, fate and action' বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। স্তালিনের 'personality cult'-এর ফলেই না-কি নায়ক-কল্পনায় এই 'no-conflict theory'-র উদ্ভব। বিশেষত তিরিশের দশকের সাহিত্যে মার্কসবাদের বিকৃত প্রয়োগ দেখা দেয়। আবার উক্ত প্রবন্ধেই আছে, 'One can hardly call any decades in the history of Soviet Literature 'the period of the cult of Personality as some critics do, if one takes a Marxist-Leninist view of the question.' মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিতে যদি 'ব্যক্তিত্বসর্বস্বতা'-র যুগ বলে চিহ্নিতকরণের কিছু না থাকে, তাহলে অভিযোগই তো ভিত্তিহীন।

পাঠকদের মনে আছে Personality cult-এর বিরুদ্ধে প্রথম জেহাদ ঘোষণা করে যিনি পশ্চিমী দুনিয়ার অশেষ প্রশংসা পেয়েছেন, সেই ক্রুশ্চভ সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে একটা ফতোয়া দিয়েছিলেন। তার মূল কথা—সমাজতন্ত্রী শিল্পসংস্কৃতি হবে monolithic। অত্যন্ত স্থূলভাবে, নেহাৎ আক্ষরিক অর্থে তিনি Principle of Commitment প্র[illegible]। উদ্দেশ্যমূলকতাই যেন সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার লক্ষ্য। গাধার লেজ দিয়ে এখনকার [illegible]রা ছবি আঁকছেন—শিল্পপ্রদর্শনী দেখে তাঁর এই বক্তব্য যেমন অসৌজন্যমূলক, তেমনই ঔদ্ধত্যপূর্ণ। অন্যপক্ষে, ভাষা

বিষয়ক প্রবন্ধ ও প্রশ্নোত্তর এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সময়োচিত স্তালিনের মতামতগুলি কত যুক্তিপূর্ণ; নৈর্ব্যক্তিক, নম্র এবং মার্কসবাদের তত্ত্ব-ভিত্তিক!

লেনিন-স্তালিনের আমলে সমাজতান্ত্রিক শিবির ছিল এক ও অখণ্ড; এখন বিভক্ত। সেজন্য শিল্পসংস্কৃতি চিন্তায় মার্কসবাদ-বিচ্যুতি সম্পর্কে সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের আরও অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মার্কসবাদ ও সংস্কৃতি

'কালচার' অর্থে 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতি' দুটি শব্দই বাংলায় প্রচলিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি'-র পরিবর্তে 'সংস্কৃতি' শব্দকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ কৃষ্টির সঙ্গে কৃষির যোগ ঘনিষ্ঠ ; আর 'কালচার' 'মনের চাষ' হলেও মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে চায়। সংস্কৃতি অর্থ সম্যক কৃতি —আমাদের শিল্প, সাহিত্য, ধ্যানধারণা, কর্ম-নীতি, আচার-ব্যবহার —এক কথায় আমাদের সমগ্র জীবনচর্যাই সংস্কৃতি। এর পরিধি বহুদূর বিস্তৃত ; কর্মের ও মানসপ্রবাহের যে-কোনো সৃষ্টিই সংস্কৃতির অন্তর্গত। (দ্রঃ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় —'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য')

ভিন্ন দেশে ও কালে সংস্কৃতির রূপ বিচিত্র হলেও মানবসভ্যতা বিবর্তনের কয়েকটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে। মানুষের কর্মপদ্ধতি এবং উৎপাদন-ব্যবস্থা আদিম সাম্যবাদের কাল থেকে আধুনিক কালে অনেক পরিবর্তিত, রূপান্তরিত হয়েছে। তাই ধর্মচিন্তা, শিল্পচিন্তা, ভালো-মন্দের বোধেও ঘটেছে অনেক পরিবর্তন। প্রত্যেক সমাজ-প্রতিবেশের সঙ্গে তার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক রূপের সম্বন্ধটি নিগূঢ়। 'উৎপাদন সম্পর্ক সমূহের সামগ্রিক যোগফলই হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো— আসল বনিয়াদ ; এই বনিয়াদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সমাজচেতনার বিশেষ রূপগুলি আকার নেয়। সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক জীবন-প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বৈষয়িক জীবনের উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা। মানুষের চেতনা তাদের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং তাদের সামাজিক অস্তিত্বই তাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।' (মার্কস)

মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে চৈতন্যলোকের এই সম্বন্ধ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশ শতকের শেষার্ধে, মার্কস-এঙ্গেলসের রচনাবলীতে। পরবর্তীকালে বিশ্বের বহু বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞান ও মানবীয় বিদ্যায় মার্কস-এঙ্গেলসের দর্শনসূত্র প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের রচনাবলীও মার্কসীয় জীবন-বীক্ষার ভাষ্যমূলক —লেনিন-স্তালিনের প্রাসঙ্গিক রচনা ও ভাষণগুলি এ বিষয়ে দিকনির্ণয়ী।

কিন্তু এই জীবনবীক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে বহুদিনের প্রত্যয়সিদ্ধ ধ্যান-ধারণাগুলির মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। হেগেলের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বে যে

ইতিহাস-সত্য উদ্‌ঘাটিত হল তারই সম্যক প্রকাশ মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে। এতদিনের দার্শনিক চিন্তা শুধু জীবন ও জগতের ব্যাখ্যা দিয়েছে, মার্কস-এঙ্গেলস প্রথম পৃথিবীকে পরিবর্তনের প্রশ্ন তোলেন। (The philosopheres have only interpreted the world in various ways ; but the point, however, is to change it.) তাই মাত্র চার দশকের মধ্যে যেমন এই নতুন জীবনবীক্ষা পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশে নতুন সমাজব্যবস্থা পত্তন করেছে, তেমনি পশ্চিমী ধনতন্ত্রের দেশগুলিতে এই জীবনাদর্শের বৈরীও অল্প নেই। কুবেরতন্ত্রের দেশ আমেরিকায় এর প্রধান কেন্দ্র। বহু পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশালয়ের প্রধান কাজই হল মার্কসবাদের অপভাষ্য-প্রচার। 'প্রব্লেমস অফ কমিউনিজম', 'আমেরিকান রিভ্যু' প্রমুখ পত্রিকা এ দেশেও খুব প্রচলিত। 'The Soviet Regime' গ্রন্থটি মার্কসবাদ-বিরোধী প্রচারাভিযানের একটি নিদর্শন—সেজন্যেই অল্পমূল্যে বিতরিত। রেমণ্ড উইলিয়ামসের 'Society and Culture' ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীর রচনা, তাই সংস্কৃতি চিন্তায় মার্কসবাদের ছিদ্রান্বেষণে লেখকের মার্কিনী প্রগল্‌ভতা নেই। তিনি ১৭৮০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখেছেন। যেহেতু বিশ শতকের ইংলণ্ডীয় বুদ্ধিজীবী মহলে তথা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রভাব অনতিক্রমনীয়, তাই উইলিয়ামস 'বিশ শতকের মতবাদ' শীর্ষক তৃতীয় খণ্ডে 'মার্কসবাদ ও সংস্কৃতি' নামে একটি পরিচ্ছেদ সংযোজিত করেছেন। উইলিয়ামস তেমন খ্যাতনামা পণ্ডিত নন ; তবু তাঁর গ্রন্থভুক্ত 'মার্কসবাদ ও সংস্কৃতি' অধ্যায়ের আলোচনা হওয়া উচিত। কারণ তাঁর লক্ষ্যস্থল যে ইংরেজ মার্কসবাদী লেখকদের রচনাবলী, বাঙালী মার্কসবাদী লেখকেরা কমবেশি তাঁদের পন্থানুসারী এবং অভিযোগগুলিও একেবারে অসার নয়।

আলোচনার সুবিধার্থে উইলিয়ামসের নিবন্ধের সার-সঙ্কলন করি—

রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের মতামত যত সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত হয়েছে, সংস্কৃতি সম্পর্কে তেমন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের অভাব। কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য, চিঠিপত্র বা পুস্তক সমালোচনা থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে মার্কসীয় মতের একটি রূপরেখা অনুমান করা যায়। মার্কসীয় সংস্কৃতিচিন্তার প্রধান কথা বনিয়াদ ও উপরিতলের সম্পর্ক। কিন্তু সেখানেও যাথার্থ্য অব্যাখ্যাত। মার্কস বলেন, 'সামাজিক অস্তিত্বই মানুষের চৈতন্যকে শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে।' এঙ্গেলসের উক্তি, 'অর্থনৈতিক কারণ উপরিতলের (সংস্কৃতির) একমাত্র নিয়ন্তা নয়।' মার্কসীয় মতের ব্যাখ্যানে কলম ধরেও প্লেখানভ না-কি বুঝেছিলেন, বনিয়াদ ও উপরিতল ব্যাখ্যান দুর্বল। উইলিয়ামসের গ্রন্থে ইংরেজ মার্কসবাদী লেখকদের আলোচনা আছে। 'The mind in chains' (সিসিল ডে লুইস) প্রবন্ধসঙ্কলন একদা বাঙালী প্রগতিশীল লেখকদের যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেখানে আর. ই. ওয়ার্নারের উক্তি, 'Capitalism has no further use for culture. On the one hand,

the material stagnation of capitalism brings it about the fewer and fewer scholars, scientists and technicians are required for the process of production. On the other hand, being no longer able to represent itself as progressive force, capitalism can no longer invite the support of the general ideal of culture and progress.'

ধনতন্ত্র সম্পর্কে এই ভবিষ্যদ্বাণী যথার্থ নয়। তারপর ওয়ার্নারের একটি উদ্ধৃতি, 'The progress of culture is dependent on the progress of the material condition for culture ; and in particular, the social organisation of any period of history limits the cultural possibilities of that period…' ইত্যাদি। ম্যাথ্যু আরনল্ডের সংস্কৃতিচিন্তার সঙ্গে এই মন্তব্যের নৈকট্য লক্ষণীয়। ওয়ার্নার ছাড়া এ্যালিক ওয়েস্ট (Crisis and Criticism), র‍্যালফ ফক্স, কডওয়েল-প্রসঙ্গ নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। উইলিয়ামসের কয়েকটি সিদ্ধান্ত: (১) সাংস্কৃতিক পর্যালোচনায় মার্কসের চেয়ে অর্থনৈতিক শক্তির ওপর এঙ্গেলস অনেক কম জোর দিয়েছেন। (২) লেনিনের শিল্পচিন্তা মার্কস-এঙ্গেলস থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। (৩) রোমান্টিক চিন্তাধারা দ্বারা ইংরেজ মার্কসবাদী সমালোচকরা গভীরভাবে প্রভাবিত। এমন কি উইলিয়ামস মনে করেন, মার্কসীয় পরিভাষায় রোমান্টিক আদর্শই গৃহীত হচ্ছে। 'It certainly seems relevant to ask English marxists who have interested themselves in the arts, whether this is not Romanticism absorbing Marx, rather than Marx transforming Romanticism.'

মরিস কর্নফোর্থ, জর্জ টমসন, জে. ডি. বার্নাল প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ ইংলণ্ডের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত, সুতরাং মতাদর্শে অবশ্যই মার্কসবাদী। কিন্তু সংস্কৃতি-চিন্তায় সর্বদা এঁদের ঐকমত্য ঘটেনি। 'মডার্ণ কোয়াটার্লি' পত্রিকায় 'The Candwell Discussion' (শরৎ ১৯৫১) তার দৃষ্টান্ত। জীবনবীক্ষা এক, অথচ শিল্পবীক্ষা ভিন্ন, কেমন করে হয়? এতেই স্বতঃপ্রমাণিত যে, সংস্কৃতিচিন্তা হিসেবে মার্কসবাদ একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মর্যাদা দাবি করতে পারে না। সাহিত্য বা সংস্কৃতির পূর্বে 'ধনতন্ত্রী', 'ক্ষয়িষ্ণু', 'বুর্জোয়া' বিশেষণ দ্রুত সমীকরণ আকাঙ্ক্ষার ফল। গত তিনশো বছরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তা-কল্পনা কি মাত্র 'বুর্জোয়া' নামেই অভিহিত হবে? সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি প্রকৃত পক্ষে কি কল্পলোকেরই সামগ্রী নয়?

উপসংহারে উইলিয়ামস 'সংস্কৃতি' প্রসঙ্গে লেনিনের মতামত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ধারণা, 'Lenin is inconsistent with Marx.' মার্কসীয় সিদ্ধান্ত 'Existence determines consciousness' এবং লেনিনের উক্তি—

'Every artist ...has a right to create freely according to his ideals, independent of anything' —মোটেই সমার্থক নয়। তারপর, 'অবশ্য আমরা কমিউনিস্টরা নিশ্চয় হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে যে-কোনোদিকেই গণ্ডগোল বেড়ে যেতে দেব না। আমরা অবশ্যই এই পরিস্থিতিকে একটি পরিকল্পনা-নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে যথাসাধ্য বুদ্ধি অনুযায়ী পরিচালনা করব' (লেনিন) —এই মন্তব্যের ভিত্তি দুর্বল। ইদানীংকার সাম্যবাদী বুদ্ধিজীবীরা লেনিনের নায়কত্বে আস্থাবান। কিন্তু লেনিনও কোনো সুসমঞ্জস সাংস্কৃতিক মত প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। উইলিয়ামসের মনে তিনটি প্রশ্ন জেগেছে—

১॥ যদি লেনিন পাকাপাকিভাবে প্রকৃতই এই ধারণা পোষণ করে থাকেন যে, শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা সৃষ্টি করতে পারে না, তাহলে 'শ্রেণী' ও 'ভাবধারা', 'অস্তিত্ব' ও 'চৈতন্যের' মধ্যে মার্কসের সম্বন্ধ-ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

২॥ যদি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা অন্যনিরপেক্ষভাবে 'সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা' সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে 'অস্তিত্ব' ও 'চৈতন্যের' সম্বন্ধ আবার নতুন সংজ্ঞাসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

৩॥ যদি শ্রমিকশ্রেণী প্রকৃতই এমন অসহায় হয় যে, অন্যনিরপেক্ষভাবে তারা 'শ্রমিকসংস্থাশ্রয়ী চৈতন্য' (trade union consciousness) অতিক্রম করতে অপারগ, (যে-চৈতন্য সমাজতন্ত্রের দিকে অস্ত্যর্থক অগ্রগতি নয়, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া মাত্র) তাহলে তাদের বিশেষ 'অবস্থাগ্রস্ত জনতা' মাত্র বলা যেতে পারে ; তারা শক্তির কর্ম, শক্তির কর্তা নয়। তাহলে তো প্রায় যে-কোনো সিদ্ধান্তই যৌক্তিক হতে পারে।

উইলিয়ামস নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ভূমিকা নিতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেননি। তিনি নিজেও যে চলমান ইতিহাসপ্রবাহের অঙ্গ, তাই বিশেষ শ্রেণীচেতনার মধ্যেই তিনি সামগ্রিক জীবনচর্যার ('culture as a whole') অখণ্ডতা খুঁজেছেন! এ কথা বলা বাহুল্য যে, অর্থনৈতিক চিন্তার মতো মার্কস-এঙ্গেলসের সাহিত্য-সংস্কৃতিচিন্তা সুনিবদ্ধ এবং পারম্পর্যক্রমে গ্রথিত নয়। কারণ ইতিহাসের এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে তাঁদের কাছে সমাজভিত্তি পরিবর্তন করা যত জরুরী ছিল, নতুন সাহিত্যচিন্তা বা শিল্পদর্শন ততটা নয়। আগে 'বনিয়াদ', পরে 'উপরিতল'। সমাজতন্ত্রের দার্শনিকরা তাই বিধিবদ্ধভাবে নতুন বনিয়াদ গঠনের কথা ব্যক্ত করেছেন ; উপরিতল তার স্বভাবধর্মেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে নতুন বনিয়াদের ওপর শোভমান হবে। অর্থাৎ বিধিবদ্ধ শিল্পদর্শন তার পরের কথা।

উইলিয়ামসের নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে, যখন দেখি তাঁর চোখে মার্কস এঙ্গেলসের মধ্যে বিরোধই প্রধান। এমন কি 'Engels though habitually less cautious' ইত্যাদি কথায় চমকপ্রদ সংশোধনী প্রস্তাবও আছে। মতাদর্শের ক্ষেত্রে

মার্কসবাদের পরম শত্রুরাও এই দুই মনীষীর মধ্যে বৈপরীত্যকেই প্রাধান্য দেননি। উইলিয়ামস এই ছিদ্রান্বেষণে মৌলিকতা দাবি করতে পারেন। বিশেষত, 'According to the materialistic conception of history, the determining element in history is ultimately the production and reproduction in real life. More than this neither Marx nor I have ever asserted. If therefore somebody twists this into the statement that the economic element is the only determining one, he transforms it into a meaningless, abstract and absurd phrase' —মন্তব্যের সঙ্গে 'সামাজিক অস্তিত্বই চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে,' (১ম পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) বা 'বনিয়াদের পরিবর্তনে সুবিপুল উপরিতলও কম-বেশি দ্রুত রূপান্তরিত হয়' মন্তব্যের মধ্যে বিরোধ-আবিষ্কার বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। 'সংস্কৃতিচিন্তায়' লেনিন মার্কসীয় সিদ্ধান্তের বিপরীত মেরুচারী, এমন অভিমত ইতঃপূর্বেও শোনা গেছে। 'মার্কসীয় যুক্তিবিজ্ঞান', 'মার্কসীয় দর্শন' প্রণেতা প্রয়াত সরোজ আচার্যও মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর উদ্ধৃত লেনিনের উক্তি—'Literature must become party literature. ...Literature must become an integral part, of an organised, planned, united social democratic work.' তারপরে লেনিনের মন্তব্য : 'There is no denying the fact that in this field there must be the widest freedom for individual bents, free wings for thought and imagination, content and form.' লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, 'সোভিয়েত ব্যবস্থায় একবার সাহিত্যশাসন ব্যবস্থা চালু হলে সহজে তা লোপ পাওয়ার নয়। এখনও তাই দেখা যাচ্ছে।' 'সাহিত্যরুচি' বইয়ের অন্তর্গত 'সমালোচনার সূত্র' প্রবন্ধেও মার্কসবাদী সাহিত্যবীক্ষার সমালোচনা আছে।

'পার্টি অরগানাইজেশন ও পার্টি-সাহিত্য' নামেই প্রমাণিত হয়, বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক কর্মী ও রাজনীতি-বিশ্বাসী সাহিত্যিকদের প্রতি লেনিন পার্টির তাৎক্ষণিক কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। সামাজিক জীব হিসেবে সাহিত্যিকের অবশ্যই কিছু সামাজিক দায় থাকে। সর্বহারা শ্রেণীর পার্টির ঘরে-বাইরে যখন লড়াই চলছে; মতাদর্শের ক্ষেত্রেও তখন সংগ্রাম অপরিহার্য। সেই সংগ্রামকে প্রাণিত করে তুলবে কবিতা, নাটক, গান, গল্প ইত্যাদি। এটাই স্বাভাবিক। সাহিত্যের এই সংজ্ঞাকেই লেনিন পার্টি-সাহিত্য নামে সীমিত করতে চাইবেন। তাঁকে এমন আহাম্মক পরম লেনিনবৈরীও বলবেন না। প্রোলেটকাল্টে তাঁর অনাস্থা, নব্য বলশেভিকদের পুশকিনের চেয়ে মায়াকভস্কিতে আগ্রহ দেখে তাঁর উষ্মা নিশ্চয়ই উইলিয়ামসের অবিদিত নয়। মানুষের সৃষ্টি যে সৌন্দর্যসম্মত (দ্রষ্টব্য, পৃঃ. ১৫, শিল্পসাহিত্য প্রসঙ্গে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন) এবং সাহিত্য-শিল্পকলা যে উদ্দেশ্য-

সাধনের উপায় মাত্র নয়, (দ্রঃ. পৃঃ. ৫৩) মার্কস-এঙ্গেলসের এ-জাতীয় উক্তি লেনিন কখনও অস্বীকার করেননি।

তিরিশের দশকে বাংলাদেশের ফ্যাসি-বিরোধী লেখকেরা ইংরেজ মার্কসবাদী লেখকদের অনুসারী ছিলেন। এ্যালিক ওয়েস্ট, জেরোম কে. জেরোম, জন লুইস বা কর্নফোর্থ, জর্জ টমসন প্রভৃতির সংস্কৃতি-ব্যাখ্যা ও সাহিত্য-আলোচনার ধারাই এদেশে গৃহীত হল। তৎকালীন 'পরিচয়'-পত্রের আলোচনায় এবং সংস্কৃতি-সংবাদে তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। ইংরেজ বুদ্ধিজীবীদের পরে আমাদের এতই ভরসা যে, ফাদায়েভ, করলেঙ্কো, স্মিরনভ —সকলেই বাঙালী মার্কসবাদী সমালোচকদের অঙ্কুশে যথাযথ আক্রান্ত হলেও কডওয়েল-বিতর্ক নিয়ে কোনো আলোচনা কোনো আলোড়ন হল না। স্মিরনভের শেক্সপীয়র সার্ভে 'পরিচয়'-এ সমালোচিত হয়। নীরেন্দ্রনাথ রায় 'শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে' সবিনয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির যথেচ্ছ সরলীকরণ দ্বারা স্মিরনভের রচনা ভারাক্রান্ত। না শেক্সপীয়র, না মার্কসবাদ কোনোটি সম্পর্কেই স্মিরনভ উপযুক্ত কৌতূহল ও অভিনিবেশের পরিচয় দিতে পারেননি। পরে অবশ্য স্মিরনভ তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন।

'মডার্ন কোয়ার্টার্লি' এদেশের মার্কসবাদী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল, অথচ ঐ পত্রের 'বিতর্ক' বিষয়ে বাঙালী বুদ্ধিজীবীমণ্ডলী নীরব (সে-বিতর্কের ঢেউ পৌছাল হাঙ্গেরিতেও, লুকাস লিখেছিলেন 'বেসিস অ্যাণ্ড আইডিয়োলজি') রইলেন। কারণ কডওয়েলের কাছে আমাদের অত্যধিক ঋণ। কডওয়েল বলেছেন, 'If anyone wishes to remain entirely in the province of aesthetics, then he should remain either a creator or an apprecia-tor of art-works. Only in this limited field is aesthetics 'pure'.

'But as soon as one passes from the enjoyment or creation of art-works to the criticism of art, then it is plain that one passes outside art, that one begins to look at it from 'outside'. But what is outside art ? Art is the product of society, as the pearl is the product of the Oyster and to stand outside art is to stand inside society.' (ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি ; ভূমিকা, পৃ. ১০)। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের উক্তি এখানে উদ্ধারযোগ্য : 'তাহার (মার্কসবাদ) মতে, সাহিত্য সৃষ্টি করিবার সময় বা কেবলমাত্র সাহিত্যের রসসম্ভোগ করিবার সময়, কেহ সমাজতাত্ত্বিক না হইয়া নিছক সাহিত্যিক থাকিতে পারেন। কিন্তু যখনই উপভোগের সীমা পারাইয়া বিচারের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে হয়, তখনই প্রয়োজন হয় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির। কোনো কিছুকে বিচার করিতে গেলে তাহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সাহিত্য সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার ফল, মুক্তা যেমন শুক্তির।' (সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদ পৃ. ৪, সাহিত্যবীক্ষা)

আদর্শগত আত্মীয়তা থেকেই দুই লেখকের এ-হেন মতৈক্য ঘটেছে। কিন্তু 'সাহিত্য' সম্পর্কে সত্যই কি মার্কসবাদের এই রকম নির্দেশনা ? তাহলে প্রশ্ন হতে পারে—

(ক) মার্কসবাদের কোনো নন্দনতত্ত্ব আছে কি ? নান্দনিক মূল্যের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে যখন মার্কসবাদের বিশ্লেষণের জগতে এসে দাঁড়াতে হয়, তখন বোঝা যাচ্ছে—

(খ) রচনার সৌন্দর্য বা সাহিত্যিক মূল্য মার্কসবাদ-নিরপেক্ষ।

(গ) যেহেতু লেখক মূলত স্রষ্টা (creator), মার্কসবাদের জ্ঞান তাঁর শিল্প-জিজ্ঞাসায় অপরিহার্য নয়। (তিনি মার্কস উদ্ধৃত করবেন, 'দরকার হলে তাঁরা তাঁদের বেঁচে-থাকা বিপন্ন করেও লেখাকে বজায় রাখেন।')

(ঘ) সহৃদয় পাঠক বলতে রস-সম্ভোগকারী (appreciator) পাঠকই বুঝি। তাঁদের নিয়েই তো পাঠকমণ্ডলী। 'সমালোচক' আর ক'জন ? সহৃদয় পাঠকদের জন্যই তো নন্দনতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব। কিন্তু কডওয়েল বা নীরেন্দ্রনাথ রায়ের ব্যাখ্যানুযায়ী মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্ব তাঁদের জানার দরকার নেই।

(ঙ) কারণ রসলোক এবং সমাজচৈতন্য ভিন্ন ; রস-গ্রহণের পর যদি পাঠকের প্রশ্ন জাগে অতঃ কিম্, এর থেকে সমাজ কি পেল, তখনই মার্কসবাদ অপরিহার্য, তার আগে নয়।

আমার মনে হয়, উল্লিখিত বিশ্লেষণ মার্কস-এঙ্গেলসের ঈপ্সিত শিল্প-চিন্তার অনুসারী নয়। কেন নয়, সংশয় কোথায়, সে প্রসঙ্গ এ প্রবন্ধে আলোচ্য নয়। এইটুকু বলেই বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করি যে, মার্কসবাদ ও সংস্কৃতির সম্পর্ক মার্কসবাদী মনীষীদের পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সুনির্ণীত না হলে লেখকের সৃজনীসত্তা এবং সামাজিকসত্তার অদ্বৈতসিদ্ধি ঘটবে না। ফলে মার্কসবাদী দলের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্য দেখিয়েও তাঁদের সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য আসবে। সেজন্য মার্কসবাদী লেখকদের সমাজ-নিরপেক্ষ 'province of aesthetics' চিন্তাই যথেষ্ট, বুর্জোয়া বা প্রতিক্রিয়াশীলদের শিল্প-জেহাদ দরকার হবে না।

আলোচনার সারমর্মটি সূচনায় চুম্বকে জানিয়ে রাখা ভালো ; কেন না একটি বিষয়ের সুসম্বদ্ধ বিশ্লেষণের যে প্রতিশ্রুতি নিবন্ধের প্রধান আনুগত্য এখানে তার কিছুটা অভাব আছে। সমস্যার গুরুত্ব, প্রথম আলোচনার সংশয় এবং তথ্যগত দৈন্যের বিবেচনায় আশা করি এই রীতিলঙ্ঘনটুকু অমার্জনীয় হবে না।

আমার আলোচ্য প্রথমে জর্জ টমসন প্রমুখের একটি সূত্র —ধনবাদী সমাজেই ট্রাজেডির উদ্ভব। 'এস্কাইলাস অ্যাণ্ড এথেন্স' গ্রন্থে দেখানো হয়েছে, এথেন্স প্রাচীন গ্রীসের মধ্যে প্রচুর বিত্তশালী ছিল এবং এক ধরনের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। এক ধরনের বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের পূর্বে ট্রাজেডি সম্ভব নয় ; কেন না ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাতই ট্রাজেডিতে প্রধান। সুতরাং প্রাক-ধনবাদী সমাজব্যবস্থায় যখন ব্যক্তিসত্তা সমাজ বন্ধনীর সঙ্গে একীভূত, বিজড়িত, তখন ট্রাজেডি অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে ট্রাজেডি নেই কেন। আলঙ্কারিকের নিষেধাজ্ঞা হয়ত গৌণ কারণ ; কিন্তু ট্রাজেডির অনস্তিত্ব কোনো গভীর সমাজসত্য প্রমাণ করে কি ?

তৃতীয়ত, শ্রেণীদ্বন্দ্বই যদি ট্রাজেডির নায়কের চরিত্রগত দ্বন্দ্বের কারণ, তবে শ্রেণীহীন সমাজে ট্রাজেডির ভবিষ্যৎ কি হবে। নতুন ট্রাজেডি কি রচিত হবে না ?

কোনো বিশেষ শিল্পকল্পেরই বিকাশ অন্য-নিরপেক্ষ নয় ; সমকালীন সমাজে যা জড়, তার উপরিভাগেই বহু শাখাপ্রশাখাসমন্বিত এবং পল্লবপুষ্পে শোভিত হয়ে মানুষের মানস-সৃষ্টির মহা মহীরুহ নিত্যবর্ধমান। একই অভীপ্সার ব্যঞ্জনা যুগের কাব্যে, নাটকে, গীতিকবিতায়, ভাস্কর্যে প্রকাশ পেয়েছে —এমন কি সঙ্গীত ও চিত্রলেখার মতো বিশুদ্ধ চারুকলার ক্ষেত্রেও। গ্যয়টে প্রধানত ফাউস্ট-রচয়িতা, বায়রণ বিদ্রোহের কবি এবং ভিক্টর হুগো ঔপন্যাসিক। কিন্তু এই তিনজন সাহিত্য-রথীই বিশিষ্ট যুগোচিত সীমার দর্পণে সমানভাবে মানুষের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার অসীম আর্তির প্রতিবিম্ব ফেলেছেন। তিনজনেরই বক্তব্য অন্যভাষায় প্রস্তাবনার আকারে 'আকর' গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে রুশোর 'সোশ্যাল কন্‌ট্রাক্ট'-এ ; 'New Heloise' বা 'Julie' উপন্যাসেও রুশো মানবতার এই বাণীই প্রচার করতে চেয়েছেন।

কিন্তু আমাদের আলোচ্য 'ট্রাজেডি'। সুতরাং গৌরচন্দ্রিকার দীর্ঘতা নিরর্থক। ট্রাজেডির শুভ জন্মলগ্নের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই বিশেষ শিল্পকল্পের স্বরূপ, মৌল প্রেরণার উৎস এবং এর বিবর্তনের ইতিবৃত্তটি অনুধাবন করা সহজসাধ্য হবে। প্রাক-ট্রাজেডি পর্বেও এর আদি জন্মভূমি গ্রীসদেশে সমৃদ্ধিশালী সভ্যতা ছিল, হোমরের কাব্যে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু সংক্ষেপে এই সভ্যতার স্বরূপ কি ? 'For our present purpose it will suffice to note that civilization as we know it down to our own day presupposes a leisured class' (দ্রঃ. George Thompson, 'Marxism and Poetry')।

প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক কলহ, শৌর্য-বীর্য ও ধনবত্তার আত্মপ্রসাদ এই অবসরবিলাসী শ্রেণীরই স্বধর্ম ; ইলিয়াড-ওডিসি মহাকাব্য দুটিতে ট্রয়ের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সুবিপুল আখ্যায়িকার জটিল বিন্যাসে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার সমৃদ্ধি ও সীমাবদ্ধতা উভয়ই প্রকাশিত। 'Homeridai' বা মহাকাব্যে গায়কের দল এক ধরনের 'প্রাথমিক ধনসঞ্চয়যুগের' বৈশিষ্ট্য সূচিত করে। ট্রাজেডি রচিত হয় এর পরবর্তী পর্বে, তখন নগর-রাষ্ট্রগুলি প্রায় সবই এথেন্সের সমৃদ্ধির কাছে মাথা নত করেছে। এথেন্স-অধ্যায়ই গ্রীকসভ্যতার 'স্বর্ণযুগ'। বলা যেতে পারে, এক ধরনের ধনতন্ত্রই এথেন্সীয় গণতন্ত্রের আসল স্বরূপ। মুদ্রা-অর্থনীতির (Money economy) লুব্ধ রাহুগ্রাসে মহাকাব্যীয় যুগের মানবিক মূল্য, সহজ জীবনবোধ তখন খণ্ডিত, বিকৃত, উচ্চশ্রেণী ও নিম্নবর্গের মধ্যে আদান-প্রদানের যোগসূত্রটুকু পর্যন্ত সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়েছে (ওডিসিতে দেখেছি, শূকরপালকও ওডেসিয়ুসের ঘনিষ্ঠ সহচর)। এথেন্সের ঐশ্বর্য যখন সমৃদ্ধির চরম চূড়ায়, তখন জমির প্রভু ও দাস-কৃষাণের ভিতরে এই সম্বন্ধ আর অত সরল রইল না, অনেক মধ্যস্বত্ব বা ব্যবহারের জটিল জালে তার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে গেল —আর তখনই ট্রাজেডি অভিধেয় শিল্পকল্পের উদ্ভব। কেন না —'The persistent transmutation of intentions into their opposites is the dominating motive of tragedy' (প্রাগুক্ত)।

ব্যক্তিসত্তার দুর্মদ বিজয়ঘোষণা এবং পরিণামে তার পরাজয় ও পতন ট্রাজেডির বিষাদ-রসের মৌল আধার। কাঞ্চন কৌলীন্যের আন্তর গ্লানিই এই পতনের নিহিত কারণ। তাই সোফোক্লিসে পাই—

'A man ill-formed by nature and ill-spoken,
Money shall make him fair to eye and ear,
Wealth, health and happiness are all the gift of money,
And money alone can hide iniquity'.

এপিক ও ট্রাজেডি-যুগের বৈষম্যটুকু সংক্ষেপে হল, এপিকে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের একসূত্রী জীবনছন্দের সম্মিলিত ধ্বনি, সেখানে নানা সমবিষম উপকরণের সমাহার ;

শিথিলবিন্যাসের আশ্রয়ে জীবন-অভিজ্ঞতার সামগ্রিক চেহারাটাই এপিকে উপস্থিত। কিন্তু ট্রাজেডিতে সামগ্রিক রূপ-উদ্ঘাটনের অবকাশ নেই, 'To make a tragedy the artist must isolate a single element out of totality of human experience and use that exclusively as his material' —Aristotle।

সুতরাং যদিচ উচ্চতর শিল্পসৃষ্টি বলতেই আমরা সাধারণত 'ট্রাজেডি' বুঝে থাকি, তবু সত্যের খাতিরেই এ কথা স্মর্তব্য যে, 'ট্রাজেডি' খণ্ডিত জীবনের প্রতিচ্ছবি। অবশ্য ব্যক্তি-শিল্পীর সচেতন প্রয়াসে রূপকল্পগত সৌষম্যের সংহতির অনেক সংস্কার হয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ওডিসিতে আছে, Circe-র পরামর্শমতো সঙ্গিসহ অকুতোভয় ওডিসিয়ুস অত্যন্ত সতর্কভাবে সমুদ্রপথে চলেছেন —সাইরেন, স্কিলা এবং থ্রিনাশিয়ার আশঙ্কায় উদ্‌গ্রীব। মোম দিয়ে কান বন্ধ করে আর জাহাজসুদ্ধ সকলকে দৃঢ়ভাবে মাস্তলের সঙ্গে বেঁধে তো সাইরেনের মোহিনীসঙ্গীতের মোহ থেকে কোনোক্রমে মুক্ত হলেন, কিন্তু স্কিলা-র হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলল না। সাপের মতো দীর্ঘ কুৎসিত গলা বাড়িয়ে সে যথারীতি ছ'জন সঙ্গীকে আত্মসাৎ করলে। তারপর একটি দ্বীপে নোঙর করে ধীরেসুস্থে আহারাদি সেরে নিয়ে ওডেসিয়ুস সপরিকর মৃত সহকর্মীদের শোকে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন। ক্ষুধা সত্য, শোকও সত্য, জীবনে উভয়েরই স্বীকৃতি আছে —তাই কাব্যেও তার প্রতিফলন। কিন্তু ট্রাজেডি-তে জীবনের এই সর্বাঙ্গীন প্রতিরূপ দেখানো হয় না —একটি বিশেষ মানবিক গুণ বা স্খলনের উপলক্ষ্যে প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামশক্তির পরাকাষ্ঠা এবং পরাজয়ের মধ্যেও তার প্রাণৈশ্বর্যের অভিব্যঞ্জনাই ট্রাজেডি-র শিল্পকলার ভিত্তি।

এথেন্সের স্বর্ণযুগের সঙ্গে তুলনা চলতে পারে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের। মার্লো, শেক্সপীয়র, বেন জনসন, বেকন প্রভৃতি সুবর্ণযুগের যোগ্য প্রতিনিধি। কিন্তু সার্বিক বিচারে এলিজাবেথীয় যুগের সম্পূর্ণাঙ্গ ছবি শেক্সপীয়রের নাটকে যেমন ধরা পড়েছে, এমন আর কোথাও নয়। অত্যুজ্জ্বল দীপশিখার আলোকে যেমন তাঁর মহৎ নায়কচরিত্রের সমুন্নতি সাধারণ মানুষের মানদণ্ড অতিক্রম করে উঠেছে (ম্যাকবেথের উচ্চাশা, ওথেলোর শৌর্য ও প্রেম, রোমিওর নিঃসন্দিগ্ধ প্রেম), তেমনি সেই প্রদীপের নীচেকার অন্ধকার পরিধি সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট সচেতন। তাই ইয়াগোর অসূয়া ওথেলোতে অনুস্যূত, এবং ম্যাকবেথের বিবেকবোধ বিলুপ্ত, সীজার ও ব্রুটাসের দ্বন্দ্বে ঐ সমাজেরই শক্তিদ্বন্দ্ব প্রকাশিত।

গ্রীক ও শেক্সপীরিয় ট্রাজেডির সাধর্ম্য ও বৈপরীত্য প্রসঙ্গেই উভয় সমাজ প্রেক্ষিতের পার্থক্য পরিস্ফুট হবে। মুদ্রা-অর্থনীতির প্রচলনে দৈনন্দিন ব্যবহারে যে আমূল পরিবর্তন এল তারই প্রথম শিল্প-সংবেদনা গ্রীক ট্রাজেডি-তে ; ভালো পরিবর্তিত হল মন্দে, মন্দ নির্বাধ গৌরবে সমাজের সর্বোচ্চে ঠাঁই পেল শুধু

ধন-কৌলীন্যে, সুতরাং সেকালের মানুষের ভাবরাজ্যে একটা প্রবল বিক্ষোভ জাগা খুব স্বাভাবিক। কার্যকারণসূত্রে আবিষ্কার করে ইতিহাসের দিগ্‌দর্শনী জানা সেকালের পক্ষে অসম্ভব, অস্বাভাবিক। সমগ্র মানবিক বোধের পরিবর্তনে মুদ্রা-মাহাত্ম্যে অভিভূত হওয়া ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না, এবং পরিস্থিতির হাতে এই অসহায় আত্মসমর্পণের বাস্তব-সত্যই গ্রীক নিয়তি-ধারণায় রূপায়িত।

শেক্সপীয়রের ট্রাজেডিতে দৈব বা নিয়তি সহায়তা করেছে বটে, কিন্তু ট্রাজেডির বীজ প্রোথিত নায়কের চরিত্রেই —এমন কি তাঁর মহত্ত্বের সঙ্গেই হয়ত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। শেক্সপীয়রের কাছে যুগবৈশিষ্ট্যের কার্যকারণ সম্বন্ধ গ্রীক কবিকুলের মতো একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। তাই কোনো শক্তিকে অজ্ঞেয় বলেও তিনি মনে করেননি। 'Character is Destiny'-র অর্থ সমাজসত্য বা সমাজ-নিহিত দ্বন্দ্বই মানবভাগ্যের নিয়ন্তা (destiny)। ব্যক্তিপ্রতিভার সোচ্চার বিঘোষণা এবং অমোঘ সীমাবদ্ধতার বিপরীতে বিধৃত শিল্পসত্যকে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের শেক্সপীয়র অনেক বড় প্রেক্ষাপটে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রধান ট্রাজেডির নায়কচরিত্রগুলি যেমন অন্তঃসংগ্রামে ধীরে ধীরে ক্ষয় বরণ করেছে, তেমনি সেই ক্ষয়ের জ্বালা, শক্তির অপরিসীম মাধুর্যে-কারুণ্যে মহামহিম রূপ নিয়েছে। এই বৈপরীত্য অবশ্যম্ভাবী, অপরিহার্য, তাই গ্রীক ট্রাজেডির আত্যন্তিক হতাশা বা 'Grimness'-এর ছায়া শেক্সপীয়রকে আক্রান্ত করেনি। গ্রীক-ট্রাজেডিকে যদি বলা যায় নৈরাশ্যপরিণামী (Pessimistic), তাহলে শেক্সপীয়র-ট্রাজেডিকে বলব প্রত্যাশাবাদী (Expectationistic)।

ধনৈশ্বর্য বা আর্থিক সমৃদ্ধির তথাকথিত 'স্বর্ণযুগ'-এর সূত্র ধরে ভারতবর্ষের নাট্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষে কালিদাসের কালকে নানা কারণে 'সুবর্ণযুগ' বলা অসমীচীন নয়। গুপ্ত সাম্রাজ্য ভারতবর্ষেরও বাইরে তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল; ব্যবসা-বাণিজ্যে বহির্ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ অগ্রসর হয়েছিল অনেকদূর। নেপাল-সমতট প্রভৃতি তৎকালীন তথাকথিত গণতন্ত্রগুলিও বশ্যতা মেনেছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের। জৈন-বৌদ্ধ ইত্যাদি লোকায়ত ধর্মমতের প্রাবল্যে এতদিন আর্য-সভ্যতা (তখন 'হিন্দুসভ্যতা') যেন ঠিকমতো সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠা পায়নি। গুপ্তযুগে এই আর্যায়ন দ্রাবিড়ভূমি দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত ব্যাপ্ত হল। তাই বৈদিক আদর্শ অনুযায়ী এই প্রথম অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা (দু'বার) যুদ্ধজয়োৎসব পালনের নজীর পাই। গুপ্তযুগের অজন্তা ইলোরার শিল্প, জ্যোতির্বিদ্যা, সঙ্গীত, সাহিত্য ইত্যাদি চারু ও কারুকলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে সত্যই তুলনারহিত। অশোক-উত্তর এবং আকবর-পূর্ব যুগে এত বিস্তৃত রাজ্যসীমায় এমন শান্তি-শৃঙ্খলা-ঐক্য মিলিত সমাজ-জীবনের দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। রামায়ণ-মহাভারত এই সময়েই গায়কদলের শ্রুতি ও স্মৃতি থেকে লিখিত আকার পেল। (Epic-এর যুগ শেষ হয়েছিল বলেই তার

সাহিত্যায়ন আবশ্যক; কালিদাসের কাব্য 'স্বর্ণযুগের কাব্য', বহিরঙ্গ-সম্বন্ধে শুধু সেগুলি মহাকাব্যের ঠাটে বাঁধা —'সাহিত্যিক মহাকাব্য')।

গুপ্তযুগের এই আর্থিক সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই শ্রেণী-সম্মিলনের ফল নয়। ইতিহাসের সার্বভৌম সাক্ষ্য প্রমাণ করেছে, প্রাক-সামাজবাদী সমাজে যখনই সমৃদ্ধি আসুক, তখনই তা নিশ্চয়ই আসবে অসম বণ্টন প্রথার প্রশস্ত সরণি ধরে, সেই ফাটলেই ধরবে চিড়, উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের ব্যবধান আরও দূরতর হবে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে, অবসরভোগী অভিজাত সম্প্রদায় শ্রমজীবীর উদ্বৃত্ত ধনোৎপাদন আত্মসাৎ করেই নবরত্নের কণ্ঠে সম্বর্ধনা-মাল্য অর্পণ করেছিলেন। আনন্দ-ঐশ্বর্যের সাত মহলা প্রাসাদের প্রকোষ্ঠে যে অনেক অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল তারও প্রমাণ পাই কালিদাস, চারুদত্ত, শূদ্রকের নাটকে। প্রবঞ্চনা, অসূয়া, শঠতা, ক্রূরতা তখনও ছিল, এঁদের সানন্দ ও সঙ্গীতময় কমেডি-তে ইতস্তত তার দৃষ্টান্ত বর্তমান। 'রঘুবংশম্' গুপ্ত সাম্রাজ্যেরই অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি ও পতনের মহাকাব্য। এর শেষ রাজা অগ্নিবর্ণ গুপ্ত-রাজ্যের সূর্যাস্তকালের প্রতীক। আবার, 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অগ্নিমিত্র আসলে অগ্নিবর্ণ-ই, মিলনান্ত হলেও ঈর্ষামূলক প্রেমের ছবি এতে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেনি। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'-র ট্রাজেডি-উপাদান তো সর্বজনস্বীকৃত, শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' প্রভৃতি (কালিদাস-পূর্ব ভাসের 'ঊরুভঙ্গ' ট্রাজেডি-র কাছাকাছি নাট্যসৃষ্টি) নাটকেও যথেষ্ট ট্রাজেডি সম্ভাবনা নিহিত। অথচ একটি নাটকেও ট্রাজেডি-পরিণাম বজায় রাখা হয়নি। শুধু কি আলঙ্কারিক-গোষ্ঠীর নিষেধাজ্ঞা আর বেদান্তপন্থী জীবনদর্শনের প্রভাবেই নাট্যকার ট্রাজেডি রচনায় বিরত হলেন? মহান্ শিল্পী কি সমাজের পারবশ্য স্বীকার করে? ভারতীয় সাহিত্যে সৎপ্রতিভার দুঃসাহস চিরকাল দৈন্যে অবনত ছিল, এ কথা মানতেও দ্বিধা হয়। কালিদাসের কালে প্রভাবশীল আলঙ্কারিক কেই বা ছিলেন! যে বেদান্ত ইহলোক-উদাসীন এবং অমর্ত্যলোকের সাধনায় মর্ত্যজীবনে প্রস্তুতি গড়ার শিক্ষা দেয়, তার প্রতিবাদে তো লোকায়ত বার্হস্পত্য দর্শনের নানা ধারা-প্রধারা একদিন প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু সেই দর্শনের পরোক্ষ ফল 'কমেডি'-র বিরুদ্ধতার কোনো নজীর মেলে না। মনে হয়, ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডি-র অনুপস্থিতির সুগভীর কারণটি ভারত সাম্রাজ্যের গঠনপ্রকৃতি ও সমাজের শ্রেণী-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যেই নিহিত। গুপ্তযুগের সমৃদ্ধি ঐশ্বর্যশালী ভূ-কেন্দ্রিক আভিজাত্যেরই রকমফের মাত্র, কিংবা বলা যায় পরাকাষ্ঠা; কিন্তু মুদ্রা শীলমোহরের প্রচলনে আধিক্য ঘটলেও আর্থিক লেনদেনের কাঠামো অপরিবর্তিতই ছিল, সেই গ্রামীণ বিনিময় প্রথাই তখনও অটুট। সুতরাং যে মুদ্রা-অর্থনীতি সমাজ-ব্যবহারের ভারসাম্য আমূল বদলে দেয় তার যথার্থ অভিপ্রকাশই এখানে উহ্য। অতএব ট্রাজেডির মূল উৎস যে, 'transformation of the action into its opposites' (Aristotle) —তার কোনো বনিয়াদ গুপ্তযুগের ভারতবর্ষে ছিল না।

সেইজন্যেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'The structure of the economical elements of society remains untouched by the storm-clouds of political sky' (দ্রঃ. Karl Marx, 'The Capital')। কালিদাসের কালের ঐশ্বর্য বিচিত্ররূপী প্রাচ্য সামন্ততন্ত্রেরই (oriental feudalism) এক অভিনব স্তর ; কোনো রকম ধনতন্ত্রেরই আবহাওয়া সেখানে ঐতিহাসিক ভিত্তিসঞ্জাত হতে পারে না। তাই কালিদাসের কাব্যে মহৎ কাব্যের শিল্পৈষণার বহুতর প্রমাণ পাই, অথচ তা মহাকাব্যযুগের শিথিলসংলগ্ন কাহিনীবিন্যাসের ঢ়ঙ বর্জন করতে পারেনি।

ইংরেজ আগমনে কলোনীয় পরিবেশের সীমাবদ্ধ অবস্থার মধ্যেই ধনতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হল কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে কাঁচামাল সস্তাদরে কিনে ইংলণ্ডে চালান দেবার জন্য এবং তাদের পণ্যসম্ভার এ দেশের বাজারে বয়ে আনবার জন্য রেলপথ তৈরি হল। তবু তার পরোক্ষ ফল হল ধনতন্ত্রের সূচনা। তাই ব্রিটিশ-পূর্ব ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডি রচিত হতে পারে না।

আমার তৃতীয় আলোচ্য, বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্বই যদি ট্রাজেডি-রচনার ভিত্তি হয়, তবে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার অবসানে কি ট্রাজেডির আবেদন থাকবে না ? শ্রেণীহীন সমাজে তাহলে ট্রাজেডি-রচনা কি সম্ভব নয় ? কোনো প্রশ্নেরই জবাব পুরোপুরি আমার জানা নেই। যে কোনো সিদ্ধান্তই এখানে বিতর্কসাপেক্ষ। বিষয়টি সম্বন্ধে শুধু জিজ্ঞাসা জাগাতে পারলেও আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে।

কডওয়েল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন : 'Elizabethan poetry in all its grandeur and insurgence is the voice of this princely will, the absolute bourgeois will whose very virtue consists in breaking all conventions and realising itself.' (ইলিউশন অ্যাণ্ড রিয়ালিটি,. পৃ. ৬২-৬৩)

'Simply to be the thing I am
shall make me live.'

—এই হল শেক্সপীয়রের সব ট্রাজেডির নায়কগোষ্ঠীর অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা। যখন বুর্জোয়া দ্বন্দ্ব থাকবে না, তখন নিশ্চয়ই ইয়াগোর মতো অমূলক অসূয়ার প্রতীক বিজয়ী হবে না, ম্যাকবেথের উচ্চাশাও যোগ্যতা অনুযায়ী আত্মপ্রকাশের সুযোগ পাবে, শেক্সপীরীয় যুগের মতো উৎপথগামী হয়ে আত্মহত্যা ঘটাবে না এবং হ্যামলেটের অন্তর্দ্বিধার মূলও হয়ত উৎপাটিত হবে।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পরে রাশিয়ায় শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং শ্রেণী-দ্বন্দ্বের অবসানে ট্রাজেডি-র ভবিষ্যৎ কি হবে সে-সম্বন্ধে সোভিয়েত সাহিত্যিক সমাজের ধারণা আমাদের আলোচনায় সহায়তা করবে। কোনো সুধী সমালোচকের মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য : 'Here (সোভিয়েত সমাজ) there is no conflict between fathers and sons

(হ্যামলেটে খুল্লতাত) between individual and society' (ওথেলো) —দ্রঃ. Eric Heartly।

সোভিয়েত আমলে রচিত বিখ্যাত দুটি ট্রাজেডি যথাক্রমে ভিশ্‌নিয়েভস্কি-র 'Optimistic Tragedy' এবং লেওনভের 'Invasion' —ট্রাজেডির গতানুগতিক পন্থা সম্পূর্ণ পরিহার করে চলেছে। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি-কে যদি বলা যায় প্রত্যাশাবাদী, তবে সোভিয়েত ট্রাজেডি-কে বলতে হয় আশাবাদী (optimistic)। প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অভিযান, শান্তির শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদি এই নতুন ট্রাজেডির মৌল প্রেরণা। অবশ্য প্রাগুক্ত সমালোচক স্পষ্টই বলেছেন, 'But the future of Soviet Society offers the increasing elimination of tragedy'। ওদেশের যে অল্প কিছু নাটক ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে তা যেন সমালোচকের বক্তব্যকেই প্রমাণ করে। এমন কি যে-কয়টি ট্রাজেডি-উপন্যাস সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছে সে-কয়টির অন্যতম 'Happiness'-এ ট্রাজেডির একটা নতুনতর সম্ভাবনা দেখি। কিন্তু সে-সম্ভাবনাকেও শেষ পর্যন্ত অবিচলিত রাখা হয়নি। সংক্ষেপে কাহিনী হল, নায়ক স্ত্রীপুত্রসহ বেশ শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করছিলেন, এমন সময় বাধলো যুদ্ধ। তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশান্তরী হলেন। যুদ্ধ থামল, তিনিও দেশে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রণয়িনী স্ত্রী স্বামীর প্রত্যাবর্তনের আশা নেই দেখে আবার পরিণীতা হয়েছেন। এখান থেকেই আসল গল্প শুরু ; নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্বই 'Happiness'-এর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ। কিন্তু উপসংহারে দেখা গেল, তাঁরা সব রকম দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠেছেন, যৌথখামারের উন্নয়নে উঠে পড়ে লেগেছেন। এত সহজেই কি মনের জটিল অস্থিরতা প্রশমিত হয়, অন্যপথগামী হয় ? ডাইভোর্স-প্রথা থাকলেও ? পরিস্থিতির অনিবার্যতা মেনে নিয়ে সামঞ্জস্য বিধান করে চলাই অবশ্য বুদ্ধিমানের কাজ এবং যথাবিহিতও বটে। কিন্তু এ তো অনিচ্ছাকৃত ত্যাগ, যা হারিয়েছে তার ওপর থেকে সব অধিকারের দাবি প্রত্যাহার করে হৃদয়ের বৃত্তিকেই অন্যপথে চালিত করা! এ কাহিনীর 'সুখ' বিনোদিনীর শেষজীবনের মতো, তার কুষ্ঠ-রোগীর সেবা আসলে নিজেকে ভুলে থাকার জন্যেই।

সমাজবাদী সোভিয়েতে সমাজজীবন আমাদের মতো ব্যক্তিজীবনের প্রতিকূল নয়। এ কথাও মানি যে, ওদেশে ব্যক্তিগত জীবনেরই একটা বড় অংশ হল সমাজ-জীবন। তবু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে অবশ্যই ব্যক্তিজীবনের গভীর অতলান্ত রহস্য অভিব্যক্ত হবে। বর্তমান সোভিয়েত সাহিত্যিকগণের অন্যতম পুরোধাও তাই আত্ম-সমালোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলেছেন, 'Can we say that in Socialist Society all the causes of imperfections and deformities in man's nature have been destroyed ?' এবং অন্যত্র, 'Are there not contradictions in plenty in the private lives of our readers ? ...Is it seldom that

there is a conflict between the magnificent public activity of an individual and his disarranged private life ? There are many themes seeking their authors' (দ্রঃ. Ilya Ehrenburg, 'The Writer and His Crat') —এটা যেন ট্রাজেডির সপক্ষেই স্বীকারোক্তি।

অবশ্য ট্রাজেডি না-থাকার সপক্ষেও বলা যেতে পারে যে, জীবন যেখানে বঞ্চনা, শঠতা ও বিদ্বেষবিষের মারী-সংক্রমণ জয় করে ভবিষ্যৎ সুখী পৃথিবীর প্রস্তুতি গড়ছে সেখানে জীবনের ছায়াচ্ছন্ন ছবি তো অতীতেরই রোমন্থন। এ কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন থাকে, অতীত-রোমন্থন কি মনোজগতের সত্য নয় ? তাছাড়া, সংগঠনাত্মক উন্নতির কি কোনো মাত্রাভেদ নেই, সর্বত্র এবং সব রকম লোকের জীবনযাত্রাই কি সেখানে সমতালে চলমান ? তা কখনোই হতে পারে না। এ ধরনের সরলীকরণ জীবন্ত মানুষের উন্নত চরিত্রকেই খর্ব করে দেখে। লেখক হয়ত তাঁর 'পজিটিভ হিরো'-র উত্তুঙ্গ প্রতিষ্ঠা দেখে বিস্ময়েই বিভোর হন, 'But what he did was to belittle them by depriving them of depth, complexity of feeling, fullness of emotional development'। তাছাড়া সোভিয়েত সমাজে জীবনের 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা' কি রাজপথের বাঁধা সড়কে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে ? শাদা-কালো ভালো-মন্দর দ্বন্দ্ব কি সেখানে একেবারেই অনুপস্থিত ? সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সমাজপরিবেশে বসবাস করে, কিছু বই পড়ে আর উপস্থিত বুদ্ধির ভরসায় কোনো নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এখানে হঠকারিতারই নামান্তর হবে। বিশেষত যেহেতু মার্কসবাদ-প্রত্যয়ী মৌলিক গবেষক আমাদের দেশে খুবই কম ; অধিকাংশই পরগত গবেষণার ওপরে মার্কসীয় নাম-সংজ্ঞা যোগ করে দায়িত্ব লঘু করেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে সোভিয়েত লেখকের বক্তব্যই অনেকটা আলোকপাত করবে : 'The negative types are more real, more tangible than positive types, whom I endowed with every merit and virtue. Other modern authors have suffered similar failures' —সে 'নেগেটিভ টাইপ' অবশ্যই লেডী ম্যাকবেথ বা ইয়াগোর পথে চলবে না, তাদের রূপ হবে ভিন্ন ; কিন্তু আসল কথা এই যে, তাদের তিরোভাব ঘটবে না। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত একটি সোভিয়েত ছোটগল্পের বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পল কুসবর্গের লেখা 'মরচে-ধরা জলপাত্র'। অগস্ট হাব্‌ভেসকি নামে মৃত এক শ্রমিক-বন্ধুর স্মৃতিচারণা। সিগ্রি আরভেতের চেতনাপ্রবাহে কাহিনীটি ধরা পড়েছে। একজন স্তাখানোভাইট, যৌবন থেকেই যে শ্রমিকশ্রেণীর জন্য লড়েছে, কোনো পদগৌরব চায়নি, পায়নি। এখনকার কমরেডরা তাকে চেনে না। ক্যানসারে অগাস্ট মারা যায়। তখন পেনসনও ছিল অল্প। তার বোন এ্যানেৎও তরুণ সমাজতন্ত্রী দলে ছিল, কন্‌সেনট্রেশন শিবিরে ছিল, এখন বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, শীর্ণ, বিষণ্ণ। তাকেই বা কে মনে রাখে! বিপ্লবের সময় ভয়ে কুঁকড়ে ছিল, তারা

পরে কারখানার ফোরম্যান, ম্যানেজার হয়েছে। কোনো পানবিলাসীর এই সুরাপাত্র বীর দেশপ্রেমিকের কবরের পাশে ফুলেরও জলপাত্র হতে পারে না। গল্পটি এস্তোনিয়া লেখকসংঘের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে সম্মানিত।

উপসংহারে সাধারণভাবে ট্রাজেডির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেই নিবন্ধ শেষ করা হবে। বিশ্বসাহিত্যের আসরে আজও ট্রাজেডি-র একক আদর্শ হয়ে আছেন শেক্সপীয়র। তাঁর নাটকের আলোচনা, অধ্যয়ন ও অভিনয়ের মধ্যেই তিনি সর্বদা বেঁচে রয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শানুরূপ ট্রাজেডি কি আর রচিত হয়েছে? ইবসেন অন্তর্জগতের গণ্ডীতে এত বেশী তন্ময় যে, বাহিরের দিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ মেলেনি। গলস্‌ওয়ার্দির ট্রাজেডি প্রধানত 'আইডিয়া'-র ট্রাজেডি। অবশ্য তার আড়ালে আছে ব্যক্তি ও বিপ্রতীপ সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব। নায়কহীন ট্র্যাজেডি আসলে নায়ক-সাধারণের ট্র্যাজেডি, অসামান্য নায়কের সন্ধান শেষ হয়েছে। শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি-র স্বরূপধর্ম বা রূপকল্প কিছুই এঁরা মানেননি। বার্ণাড শ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী আদর্শের শিল্পী। শেক্সপীয়রের মতো বড় শিল্পীপ্রতিভার অভাবেই ট্রাজেডির এত রূপান্তর ঘটেছে—এমন মনে করলে অন্যায় হবে। আসলে অতিকায় ম্যামথযূথের মতো ক্ল্যাসিকাল ট্রাজেডি-র যুগও শেষ হয়েছে। এই ঘটনা সাহিত্য-শিল্পের সচলতার ধর্মকেই প্রমাণিত করে। অনুরূপত অনিবার্য-ভাবেই একদিন ট্রাজেডি-তে অচল হয়ে পড়েছিল গ্রীক আদর্শ, তাই শেক্সপীরিয় আদর্শের উদ্ভব হয়েছিল। তবে আশঙ্কারও কোনো কারণ নেই; কেন না পূর্ব-সূরীদের ট্রাজেডি-সাহিত্যও অনাদৃত হবে না—কোন বিবর্তনের গতিপথে সাহিত্য রূপ বদলেছে তার অতুলনীয় চলচ্চিত্র হিসেবে শেক্সপীয়র চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সোভিয়েতে শেক্সপীয়রের সর্বাধিক সমাদর আমার বক্তব্যের অনুকূলেই রায় দেয়। হয়ত বা আরও কিছুর ইঙ্গিত দেয়—কিন্তু সে জিজ্ঞাসা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

তবু, বর্তমানকালে কি য়ুরোপে কি সোভিয়েতে জীবনের শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ ট্রাজেডি—এ ধারণা আর মানা হচ্ছে না।

স্টেইনার 'ডেথ অফ ট্র্যাজেডি' গ্রন্থে সাহিত্যকর্ম রূপে ট্র্যাজেডি-র মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য আলোচনা করেও অসামান্য নায়কচরিত্রের ক্রমলুপ্তির কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। বিজ্ঞানের শিক্ষা আমাদের চোখের মোহের কাজল ঘুচিয়ে দিচ্ছে। নিয়তিবাদ শেষ পর্যন্ত দৈব ছেড়ে প্রকৃতির শক্তি রূপেই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। বিশ্বাসের জগৎ বদলালে তার সাহিত্যরূপেরও পরিবর্তন হতে বাধ্য। শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটলেও ট্র্যাজেডি-রচনার প্রেরণা নিঃশেষ হয়ে যায় না। মানুষের জ্ঞান এবং চেতনা যতই অনধিগম্যের রাজ্যে বাহুবিস্তার করছে ততই তার আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে।

এ যেন সেই প্রমিথিয়ুস, আগুনে হাত পুড়লেও সে আগুন ত্যাগ করতে পারে না। সকল মহৎ শিল্পীরই জীবনজিজ্ঞাসা তথা শিল্পজিজ্ঞাসা টেনিসন-উক্ত—

Whose margin fades for ever and for ever.

জীবনের দিগন্তরেখা যেন ক্রমশ বেড়ে চলেছে—সমগ্র সত্তা দিয়েও মানুষ পুরোপুরি তার নাগাল পাচ্ছে না। হয়ত নতুন ট্রাজেডি এই দিকেই অগ্রসর হবে, আর চেরনিসেভস্কীর মন্তব্য-নিহিত অভিযোগ ('Tragedy is the terrible in human life') খণ্ডনে হয়ত সম্পূর্ণ অভিনব আদর্শ দেখা দেবে।

শেক্সপীয়রের ট্রাজেডি-চিন্তা ও বাংলা সাহিত্য

শেক্সপীয়র এমন একটি নাম এবং সেই নামের ভাবাষঙ্গে এত খ্যাতি অখ্যাতির স্মৃতি জড়িত যে নতুন করে শেক্সপীয়র-প্রসঙ্গ আলোচনা প্রায় দুর্মর স্পর্ধা। শোনা যায়, শেক্সপীয়র নামের বানান না-কি ছত্রিশ রকমে করা চলে; তাঁর প্রায় প্রত্যেক নাটক, প্রত্যেক চরিত্র নিয়ে তারও শতগুণ বেশি আলোচনা আছে।

ইংরেজী ভাষাভাষীদের পরেই বোধহয় ভারতবর্ষ শেক্সপীয়রকে মর্যাদা দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো দেশই তাঁকে আপনজন বলে বরণ করতে দ্বিধা করেনি; তাই শেক্সপীয়র ইংরেজদের 'ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুশন' হয়েও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। প্রায় দুশো বছর আগে ইংরেজী শিক্ষা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী সারস্বত সমাজ শেক্সপীয়রকে অনুবাদ-অনুকরণ-অনুসরণ দ্বারা আত্মসাৎ করতে প্রয়াসী হয়। চৌরঙ্গী, সাঁমুচি, ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার প্রভৃতি মঞ্চে রীতিমতো শেক্সপীয়র যুগের পোশাকে শেক্সপীয়র নাটকের অভিনয় হয়েছিল। তখন উন্নাসিক বিদেশী দর্শক অল্প ছিল না, তৎসত্ত্বেও বিদেশী পত্রিকার সমালোচনা স্তম্ভে ঐ সব নাট্যাভিনয় যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। অনূদিত ও অভিনীত নাট্যাবলীর মধ্যে ট্র্যাজেডিই প্রধান। যোগেন্দ্রচন্দ্রের কীর্তিবিলাস থেকে গিরিশ-চন্দ্রের ম্যাকবেথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জুলিয়াস সীজার পর্যন্ত ট্র্যাজেডিই বাঙালী নাট্যরসিকদের আকৃষ্ট করেছিল। প্রমথনাথ বসুর 'অমরসিংহ'ও হ্যামলেটের ভাবানুবাদ।

অবশ্য 'কমেডি'ও অনূদিত হয়ে পাঠকসমাজে আদৃত হয়েছিল। বেণীমাধব ঘোষ 'ভ্রমকৌতুক' নামে 'Comedy of Errors' অনুবাদ করেন। বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' সেকালের বাঙালী পাঠকদের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হয়েছিল। ল্যাম্বস টেলস ফ্রম শেক্সপীয়র অবলম্বনে অজস্র 'মর্মানুরূপ কতিপয় আখ্যায়িকা' প্রকাশও স্মরণীয়। নিছক পাঠ্যপুস্তক রচনার আগ্রহেই হয়ত এ সব অনুবাদ, মর্মানুবাদ হয়। কিন্তু এইসব বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত প্রয়াসের পেছনে ছিল লেখকদের শেক্সপীরিয় সাহিত্যাস্বাদের অভিভব। মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী পদাবলী, নাট-গীতের পর টমাস কিড, জন লাইলি অথবা মিস্ট্রি-মিরাকল প্লে-র সঙ্গে পরিচিত

হলে বাঙালী সুধী ব্যক্তি খুব বেশি বিচলিত হতেন না। একদিকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের ট্র্যাজেডি-বিরোধী অনুশাসন, অন্যদিকে কিডের জিঘাংসা-ক্রুর হত্যা-ভয়াল স্প্যানিশ ট্র্যাজেডী-র প্রতি স্বাভাবিক অনীহা; বেন জনসনের নাটকেও সেই ভয়াবহ হত্যা-ষড়যন্ত্রের নারকীয় পরিবেশ। এবং তদুপরি তাঁর নাটকীয় গঠনের একান্ত কঠিন ক্ল্যাসিক্যাল সংযমে অথবা মিস্ট্রি-মিরাকল প্লে-র খ্রীষ্টীয় পৌরাণিক কাহিনীতে এমন কিছু কিছু উপাদা·' ছিল, যা আমাদের উনিশ শতকের শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায় এবং বৃহত্তর জনসাধারণে্র রুচির অনুমোদন পেত না।

এ কথাও হয়ত সত্য যে স্প্যানিশ ট্র্যাজেডির মঞ্চসাফল্যে মুগ্ধ গ্লোব রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের অনুরোধে শেক্সপীয়র হ্যামলেট লেখেন —কিড-রচিত হ্যামলেটই হয়ত তাঁর নাটকের প্রেরণাস্থল, তবু শেক্সপীয়র একক, পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঐতিহাসিক সংযোগ মাত্র। মানবজীবনের যে অনন্ত সম্ভাবনা, পাপপুণ্য, ভালোমন্দ, দেবতা শয়তানের সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম —বিধাতার মতো নিঃস্পৃহ অথচ বিধাতার মতোই লীলাময়ের দৃষ্টি নিয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি নাট্যশাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, পরস্ব গ্রহণ করেছেন এবং অপরাধীর মস্তকে সশ্রদ্ধ সহানুভূতির মুকুট পরিয়েছেন। পাপ তাঁর কাছে নিছক পাপ নয়, প্রবৃত্তি এবং বহু প্রতিভাশালী মানুষও মুহূর্ত বিশেষে প্রবৃত্তির দাস; চক্রান্তের শক্তি প্রেমের শক্তির চেয়ে প্রবল, কিন্তু অতিশয়িত প্রবলতা —তা সে যে-কোনো কারণেই হোক না কেন, পতনের অবশ্যম্ভাবী কারণ। অতিশয়িত সরলতা, অতি সততা বা বিচারহীন বিশ্বাস প্রবণতাও প্রকৃতপক্ষে চিত্তের ভারসাম্যহীনতা এবং পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর জীবন-পথে যে একবার ভারসাম্য হারিয়েছে তার আত্মিক সঙ্কট অনিবার্য।

শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-চিন্তা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। তবু কয়েকটি ব্যাপারে প্রায় সকলেই একমত। গ্রীক ট্র্যাজেডি-র একান্ত দৈবপরতন্ত্র জীবনদর্শন রেনেসাঁস-যুগের শিল্পীর মনমতো হবার কথা নয়। যখন মানুষ বুদ্ধিবলে দুর্গম প্রকৃতির রাজ্যে অধিকারবাহু বিস্তার করেছে, দেশে দেশে নতুন উপনিবেশ গড়েছে, লুঠতরাজের ঐশ্বর্যে দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়েছে, তখন এ কথা অসত্য বলেই প্রমাণিত যে, নিয়তির অবাধ স্বেচ্ছাচারে মানবভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। বরং মানুষের প্রবল ইচ্ছাশক্তি যে দৈবের প্রতিস্পর্ধী হতে জানে সে দিকেই শেক্সপীয়রের দৃষ্টি পড়েছিল।

তাই দৈব সংঘটন, অপরের সহযোগিতা বা আকস্মিক উপাদানকে বদলে চরিত্রের পুরুষাকারেই তিনি মহতী বিনষ্টির উৎস প্রত্যক্ষ করেছেন। 'Character is Destiny' —সূত্রটি বহু ব্যবহারে পর্যুদসিত, কিন্তু পূর্ববর্তী ঐতিহ্য অনুমোদন পায়নি যে, শিল্পীমানসে এবং যাঁর স্বোপলব্ধ জীবনদর্শন ট্র্যাজিক-দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু দেখেছে মানবসত্তার গভীরে, তাঁর বিস্ময়কর মৌলিকতা আজও তুলনা-রহিত। শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির স্বরূপ কয়েকটি লক্ষণে নির্ণীত হতে পারে।

(১) কোনো অসাধারণ ব্যক্তির চরিত্রনিহিত ভ্রান্তিজনিত পতনের কাহিনী ; (২) বহু বেদনা ও দুঃখের অভিঘাত —তারই চরমতা মৃত্যুতে ; (৩) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত কারণের সহযোগ ; (৪) পরিণামী ফলশ্রুতি করুণা ও ভয় ; (৫) নিয়তিচিন্তার রূপান্তর —অজ্ঞেয় কারণে মহতী বিনষ্টি ; (৬) জগৎ ব্যাপার দুর্জ্ঞেয়, রহস্যাচ্ছন্ন। প্রথম চারটি লক্ষণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ লক্ষণ বিচারেই শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-চিন্তার বৈশিষ্ট্য জানা যেতে পারে। তিনি খ্রীষ্টীয় বা পুরনো কোনো ধর্মীয় ধারণার সুনির্দিষ্ট ছকে মানবচরিত্রের ভালোমন্দ মূল্যায়ন করেননি। প্রেতাত্মা বা evil spirit নাটকের চরিত্রশালায় স্থান পেলেও তারা কেউ শেষ পর্যন্ত মানবচরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেনি, অনেক সময় অন্তর্নিহিত দুরাকাঙ্ক্ষার প্রতীকী প্রতিফলন রূপে তারা নাটকে উপস্থিত হয়েছে। ম্যাকবেথের মতো শক্তিমান, ওথেলোর মতো উদারহৃদয় সন্দেহ-মুক্ত, লীয়রের মতো রাজারও জীবন-পরিণাম যখন প্রচণ্ড মর্মদাহকর হয়, তখন জীবনের ভয়াবহ রূপ ট্র্যাজেডি প্রকাশ করে। আবার বহুগুণমণ্ডিত কোনো বিশেষ কারণে অতিশয়তাপুষ্ট মানুষের অন্তঃসংগ্রামে অবক্ষয়িত জীবনের পরিণাম দেখে আমাদের চিত্তে স্বতঃই করুণা সঞ্চার হয়।

ওথেলোর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল যে, ডেসডিমোনা একদিন তারই হাতে নিহত হবে। ম্যাকবেথ কখনও ভাবেনি, এক ডানকানের হত্যার পর দুরাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আরও মৃত্যুর মালা সে গাঁথবে, তার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রেরণাদাত্রী গৃহিণীই হবে অসহায়, বিকৃতমস্তিষ্ক। প্রত্যেকটি বিষাদান্ত নাটকের প্রধান চরিত্রে দেখি, 'What they achieve is not what they intended ; it is terribly unlike it.' হ্যামলেটের প্রতিশোধস্পৃহা স্থূল বাস্তব সত্য, কিন্তু হ্যামলেট জানত না, সে-প্রতিশোধের মূর্তিরূপ রক্তস্নাত। ওথেলো ইয়াগোর প্ররোচনায় অলীক বৃত্তান্তকেই সত্য মনে করে ন্যায়বিচারের তাড়নায় অপাপবিদ্ধ প্রেমকেই হত্যা করেছে। করিওলেনাস নিজেকে লৌহকঠিন মনে করেন, কার্যত দেখা যায়, তাপের কাছে তুষারের মতো তিনি বিগলিত। ম্যাকবেথের বহুকাঙ্ক্ষিত রাজমুকুট হস্তগত হল, কিন্তু তার জন্যেই যত ভয়ঙ্কর দুঃসহ অন্যায় ও পাপাচরণ। অথচ আমাদের মতো তাঁরাও জগৎব্যাপার বিশ্লেষণ ও আত্মবিচারণায় যথেষ্ট সমর্থ, কেউ কেউ প্রখর মেধা ও দুর্জয় সাহসের অধিকারী। তবু 'Everywhere, in this Tragic world, man's thought, translated into act, is transformed into the opposite of itself.'

পঞ্চাঙ্ক নাটকের গঠন বিন্যাসেও শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-শিল্পের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রায় প্রত্যেক ট্রাজেডিতেই তিনটি বিভাজন আছে : (ক) দ্বন্দ্বের উৎসগত পরিবেশের বর্ণনা —মুখসন্ধি, (খ) দ্বন্দ্বের জটিলতা, কাহিনীর বহুমুখী বিকাশ ও বৃদ্ধি দ্বিতীয় বিভাজনের অন্তর্গত ; ২য়, ৩য়, ৪র্থ অঙ্ক ব্যাপী এর সীমা।

(গ) তৃতীয় বিভাজনে সমগ্র নাটকের চরম একমুখী পরিণাম, উপসংহৃতি (catastrophy)। অধ্যাপক ব্র্যাড্‌লে 'Construction in Shakespeare's Tragedies' অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য প্রথম ট্র্যাজেডি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী। কীর্তিবিলাস বা বিধবাবিবাহ নাটক ঐতিহাসিক সূত্রে পূর্ববর্তী রচনা হলেও ট্র্যাজেডি সংবেদনায় কৃষ্ণকুমারী নিঃসন্দেহে প্রথম বাংলা ট্র্যাজেডি। কৃষ্ণকুমারীর গঠনে শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি-র সুচিন্তিত প্রয়োগ হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। ধনদাস বিলাসবতী-মদনিকা উপাখ্যান বরং কমেডি-র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সংস্কৃত নাটকের প্রণয় কাহিনী, বিশেষত শ্রীহর্ষের রত্নাবলীর প্রভাবও পড়েছে। ভৈরবী চরিত্রটিও বাহুল্য, কেবল বৃদ্ধ রাণা ভীমসিংহের অন্তঃপুরের প্রতি গভীর শুভেচ্ছা বহন করেই তাঁর ভূমিকা সমাপ্ত। একদিকে তাঁর পারমার্থিক কল্যাণ-প্রেরণায় তীর্থযাত্রা, অন্যদিকে একান্ত লৌকিক প্রসঙ্গ, কৃষ্ণকুমারীর বিবাহচিন্তা —দুয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই।

কিন্তু বৃদ্ধ রাণার পিতৃস্নেহে ও রাজ্যরক্ষার সঙ্কট, জয়সিংহ-মানসিংহ বিরোধ সেই বিক্ষোভবহ্নিতে মারাঠার ইন্ধন দান —এই ট্র্যাজেডি-র সহযোগী কারণ। বৃদ্ধ রাণা যেন কিং লীয়ারের ছায়ানুসরণে রচিত। পঞ্চম অঙ্কে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুর পর ভীমসিংহের হাহাকার কর্ডেলিয়ার মৃত্যুতে লীয়রের বিলাপের অনুরূপ। কিন্তু যে ট্র্যাজিক পরিস্থিতি নায়কেরই চারিত্রধর্মের সঙ্গে যুক্ত, কৃষ্ণকুমারী নাটকে তার একান্ত অসদ্ভাব। বরং ভীমসিংহের অসহায় বিমূঢ়তা গ্রীক ট্র্যাজেডি-র অদৃষ্টবাদের কথাই স্মরণ করায়।

ভীমসিংহ বা কৃষ্ণা কোনো চরিত্রেই করুণ রসের অতিরিক্ত মহতী ব্যঞ্জনা নেই। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রে মধুসূদন বলেছেন: 'The queen is a very necessary character ; so also the তপস্বিনী।' কিন্তু এই দুটি চরিত্রেরই অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা নাটকে পরিস্ফুট হয়নি। অবশ্য বিলাসবতীর ঈর্ষাদগ্ধ প্রেমের সঙ্গে কৃষ্ণার একান্ত সারল্যের বৈপরীত্যের দ্বারা নাট্যোৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করায় অভিপ্রায়টিকে (I think we may bring her [বিলাসবতী] in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innosence of our Heroine) —নিঃসন্দেহে পরিণত ট্র্যাজেডি-চিন্তার পরিচায়ক বলা যায়। কৃষ্ণকুমারীর ত্রুটি সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনের মধ্যে মধুসূদনের দুর্বলতা বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়: 'Ease can only be obtained by practice ; and I am as yet a mere novice.' আর একটি পত্রাংশ উৎকলন করি: 'Never strive to be comic in a tragedy ; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scencs, so as to

have an agreeable varity. This I believe to be Shakespeare's plan.' শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিতে ক্ল্যাসিক ট্র্যাজেডি-র মতো অবিমিশ্র বেদনাবিষাদ প্রাধান্য পায়নি। নাটক যেহেতু জীবনেরই মঞ্চরূপ, তাই অবিমিশ্র সুখ বা দুঃখকে তিনি খণ্ডিত সত্যরূপে দেখেছেন। প্রকৃত জীবনসত্য হর্ষ ও বিষাদের আলোছায়া সম্পাতে বিচিত্র, তাই কৌতুকানন্দে উচ্ছল কমেডি-র পাশাপাশি তিনি লিখেছেন বিষাদাচ্ছন্ন কমেডি (Dark Comedy)। ট্র্যাজেডি-র কোনো কোনো মুহূর্তকে করে তুলেছেন সহজ আনন্দে সঞ্জীবিত। উদ্ধৃত মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, মধুসূদনের শিল্পীমানসেই প্রথম শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-চিন্তার স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে ধরা পড়ে; যদিও কৃষ্ণকুমারীতে সেই ট্র্যাজেডি-চিন্তা বাস্তব রূপারোপে সার্থক হয়নি। এই সূত্রেই আলোচ্য মেঘনাদবধের ট্র্যাজেডি। কাব্যের পাত্রে ট্র্যাজিক রসের আস্বাদন নাটক থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন হতে বাধ্য। তবু রাবণ-মেঘনাদের চরিত্র, রাবণের প্রাক্তন ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব, নিয়তির তাড়না, দেবযন্ত্রের প্রতিকূলতা —সব মিলে প্রায় ত্রুটিহীন পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি। কৃষ্ণকুমারী ও মেঘনাদ বধ একসঙ্গে রচিত হয়; বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও অদ্যাপি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক-মহাকাব্য মেঘনাদ বধ-এ গ্রীক ট্র্যাজেডি-র ছায়াপাত সত্ত্বেও শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি-র কাঠামোও সহজেই অনুধাবন করা যায়।

নয় সর্গে নিবদ্ধ মহাকাব্যে পঞ্চাঙ্ক পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি নাটকের প্রকৃতিটিও চিনতে দেরি হয় না। যেহেতু মিল্টনের মহাকাব্যের একটি আদর্শ (Pattern) তাঁর সামনে ছিল এবং নাটকের ক্ষেত্রে কোনো বিদেশী পূর্বসূরীকেই দেশজক্ষেত্রে প্রয়োগ কবা চলে না, বাংলায় কোনো ট্র্যাজেডি-র আদর্শ তখনও পর্যন্ত স্থাপিত হয়নি, তাই মহাকাব্যের ট্র্যাজেডিতে মধুসূদন নাটকের তুলনায় সফলকাম। কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ে মঞ্চাধ্যক্ষরা ইতস্তত করলেও মেঘনাদ বধের একাধিক নাট্যরূপ, অনুকৃতি, অনুসৃতি অভিনীত হয়ে অচিরেই কাব্যটির অন্তর্নিহিত ট্র্যাজিক নাট্যসম্ভাবনাকে প্রমাণিত করেছিল।

মধুসূদন বীজ বপন করেছিলেন মাত্র, উক্ত দুটি রচনার পর তিনি আর ট্র্যাজেডি লেখেননি। বাংলা নাটকে পরবর্তী উল্লেখ্য স্রষ্টা দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র। দীনবন্ধুর ট্র্যাজিক জীবনবোধ ছিল না। বহুখ্যাত নীলদপণ উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি হলেও ট্র্যাজেডিতে রূপায়িত বিশেষ জীবনপ্রত্যয় (যেমন ভবিষ্যৎ অজ্ঞাত, জীবন রহস্য দুরবগাহ, মন্দের প্রভাব ইত্যাদি অজ্ঞাতসারে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে, তারই পরিণাম মহতী বিনষ্টি এবং সঙ্কটমুহূর্তের অগ্নিপরীক্ষায় আত্মসম্বিতের জাগরণ প্রভৃতি) দীনবন্ধুর শিল্প-অন্বেষার বিষয় ছিল না। বরং ডিকেন্সীয় হিউমার-বোধ, ভাব-প্রবণতা, গভীর সহানুভূতি, সংস্কারচেতনা দীনবন্ধুর নাট্যরচনাকে খাঁটি ট্র্যাজিক জীবনবোধে উদ্দীপিত করতে পারেনি। তাই তাঁর নাটকে কোনো ভিলেন বা খলচরিত্র নেই। নীলদর্পণ নাটকে সার্থক ট্র্যাজেডি-র বহু উপাদান বর্তমান; এবং

উনিশ শতকের বিদগ্ধ সমাজে শেক্সপীয়রের জনপ্রিয়তা থেকে দীনবন্ধুর শেক্সপীয়র পরিচিতি অনুমান করে নেওয়া চলে। তবু নীলদর্পণ ট্র্যাজেডি হিসেবে ব্যর্থতার কারণ দীনবন্ধু প্রতিভায় নৈপুণ্যের অভাব নয়, প্রতিভার স্বরূপগত ভিন্নতা। নবীনমাধবের পরোপচীকির্ষা, 'স্বরপুর বৃকোদর'-খ্যাতি তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্যোতক এখানে শেক্সপীরিয় ট্র্যাজেডি-র নায়কলক্ষণ স্বীকৃত হলেও নাটকের পরিণামী সংবেদনায় দেখি, নায়কচরিত্রে ট্র্যাজিক ফলশ্রুতি ব্যক্ত হতে পারেনি। আহত অসহায় নবীনমাধবের হয়ত পথেই মৃত্যু হত, যদি দুঃসাহসী রায়ত তোরাপ সেখানে উপস্থিত না থাকত। তোরাপের জন্যই সে নিজের গৃহাশ্রয়ে পারিবারিক মর্যাদার মধ্যে মৃত্যুবরণের সুযোগ পেল। সুতরাং যে ট্র্যাজিক ক্যাটাসট্রফি ট্র্যাজেডি-নায়কের মৃত্যুকে মহিমামণ্ডিত করে তোলে, সেই মুহূর্ত নবীনমাধবের জীবনে আসেনি। বিন্দুমাধব যতই বলুক, 'ওহো! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবন নাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর।'—শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-নায়কের শোচনীয় মানসিক পতনমুহূর্তের মতো পরিস্থিতি দীনবন্ধু কখনোই সৃষ্টি করতে পারেননি—আমাদের মন যখন স্বতঃই বলে উঠবে, 'Now cracks a noble heart!' অন্যপক্ষে গোপীনাথ, পদী ময়রানী বা রোগ সাহেব কেউই শেক্সপীরীয় অর্থে খলচরিত্র নয়।

সধবার একাদশীতে বরং 'ডার্ক কমেডি'-র দূরগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। নিমচাঁদের প্রগল্‌ভ ভাষণে, যথেষ্ট শেক্সপীয়র-আবৃত্তির মধ্যে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা আছে। সে মদ্যপ, অধোগামী হলেও আত্মসচেতন। উনিশ শতকের প্রহসনধারায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকৃতি রূপেই সধবার একাদশী বিচার্য, সমাজ-সমালোচনা মূলক হিউমার এবং স্যাটায়ারই নাটকটির মুখ্য আকর্ষণ। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সধবার একাদশীর মূল্য। তবু নিমচাঁদের চরিত্রেই ট্র্যাজিক জীবনবোধ অনেকখানি অনুস্যূত, নবীনমাধবের নয়। দীনবন্ধুর অন্য নাটকগুলি সামাজিক নক্সা, প্রহসন জাতীয়।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে শেক্সপীয়রের তুলনা আমাদের মজ্জাগত কুসংস্কার। শেক্সপীয়র ও গিরিশচন্দ্র হঠাৎ নাট্যকার রূপে আবির্ভূত হন, তার পূর্বে তাঁরা উভয়েই মঞ্চের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, দু'জনেই অপরের রচনা পরিমার্জনা করে নাট্যকার খ্যাতি অর্জন করেন। উভয়েই মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন—এ রূপ কয়েকটি স্থূল ঘটনাগত সাদৃশ্য দেখানো সহজ। কিন্তু হেমচন্দ্র বাংলার মিল্টন এ উক্তি যতখানি অসার, গিরিশচন্দ্রকে বাংলার শেক্সপীয়র বলা তার চেয়ে অনেক বড় ভ্রান্তিবিলাস। অথচ গিরিশচন্দ্রের নাট্যকৃতি প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের নামোচ্চারণ প্রায় দুর্মর কিংবদন্তীতে দাঁড়িয়ে গেছে। দু'জনের সাহিত্যিক স্বভাবই ছিল ভিন্ন শ্রেণীর। একজন ভাগ্যান্বেষণের জন্য স্বগ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছেন, খ্যাতি-অখ্যাতি-সন্দেহ মিশ্রিত সংসর্গে বাস করেছেন, পিউরিটান শাসনের নিন্দিত

অভিনেতৃগোষ্ঠী (লর্ড চেম্বারলেনের দল) থেকে রাজমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন ; জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সায়রে যিনি পেয়েছেন অনেক, দেখেছেন তারও বেশি ; তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন জীবনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যে বিমুগ্ধ। সেই রহস্যবোধ মানবচরিত্রের অবচেতন দুরাকাঙ্ক্ষা, প্রতিহিংসা ইত্যাদির রূপায়ণ শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি-কে মানবরহস্যের যে গভীরতম প্রদেশে অবাধ প্রবেশাধিকার দিয়েছে, তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। একমাত্র গ্যেটেই শেক্সপীয়রের সার্থক তুলনাস্থল।

অন্যপক্ষে, গিরিশচন্দ্র যৌবনে ভালো-মন্দ সংসর্গে কাটিয়ে পানাসক্তির অনুতাপ বশে রামকৃষ্ণের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন, মন্দের সমস্যা শেক্সপীয়রের মতো তাঁরও চিত্তকে বিচলিত করেছিল, পাপকে ঘৃণা কর, পাপীকে নয় —ব্যক্তিগত জীবনে এই ছিল তাঁর নীতি। তাঁর সংস্পর্শে মঞ্চসংশ্লিষ্ট অনেক অভিনেত্রী কলুষিত জীবনযাত্রা ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু মানবজীবনের সকল রহস্য, সব সমস্যা তিনি ভক্তিরস সমুদ্রে বিলীন করে দিয়েছেন। কৃষ্ণে কর্মফল অর্পণ করেই সর্বদ্বন্দ্বের সমাধান ; নাটকীয় ঘাত প্রতিঘাতের পরম্পরাক্রমে গিরিশনাট্যে উপসংহৃতি সন্ধি কদাচিৎ সংঘটিত হয়।

(১) কৃপাময় ঈশ্বরের করুণায় বিশ্বাস ;
(২) মানবচরিত্রের পুরুষকার দৈবের প্রতিস্পর্ধী নয়, নিমিত্ত মাত্র ;
(৩) ঐহিক জীবনের সমস্যায় অনাগ্রহ ;

—এইসব প্রবণতা গিরিশের শিল্পীমানসকে ট্র্যাজেডি-র অনুকূল হতে দেয়নি।

বলিদান, শাস্তি কি শান্তি, হারানিধি, গৃহলক্ষ্মী ও প্রফুল্ল গিরিশের উল্লেখ্য বিষাদান্ত নাটক। পাঁচটি নাটকই মঞ্চের তাগিদে রচিত, পাঁচটি নাটকেরই নিন্দা প্রশংসা বিষয়ে তাঁর কোনো মোহ ছিল না। লৌকিক আসক্তির চক্রে আবর্তিত মানুষকে নায়কের পদে অভিষিক্ত করে তার অন্তর্দ্বন্দ্বকে (বলা বাহুল্য, সে দ্বন্দ্বও লৌকিক) সহানুভূতির সঙ্গে তিনি যে চিত্রিত করেননি তা নয়। কিন্তু কখনও ট্র্যাজেডিয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঈর্ষা আকাঙ্ক্ষা হিংসায় জর্জরিত মানুষের পক্ষ গ্রহণ করেননি। নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত জন্মমৃত্যু জয়পরাজয়ের বিধানেই ছিল গিরিশচন্দ্রের প্রশ্নহীন আনুগত্য। তাই বলিদান ও শাস্তি কি শান্তি-র ট্র্যাজেডি ব্যর্থ। নায়ক চরিত্রের নাট্য রূপায়ণে কোনো বিশিষ্ট জীবনদর্শন অনুস্যূত হয়নি। প্রফুল্ল অপেক্ষাকৃত সার্থক। একটি পরিবারের উত্থান ও পতনের কাহিনী 'প্রফুল্ল' নাটকের উপজীব্য। যোগেশ পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান ও কেন্দ্রীয় চরিত্র। দারিদ্র্য থেকে সে-ই পরিবারে সচ্ছলতা এনেছে, রমেশকে আইন পাশ করিয়েছে, মা'র তীর্থযাত্রার আয়োজন করেছে। সুরেশ ব্যবহারিক বিচারে অপচয়িত যুবক, কিন্তু দাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পুরাতন ভৃত্য পীতাম্বর নাটকে শুভবুদ্ধির প্রতীক। প্রফুল্ল এবং পাগলা মদনও শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন। রমেশ এ নাটকের ভিলেন ; জগমণি প্রভৃতি তারই সহায়ক।

বহুশ্রান্ত জীবনে যখন যোগেশ বিশ্রামের জন্য উন্মুখ, যখন সৌভাগ্যসূর্যের কিরণ সম্পাত প্রত্যাশিত, তখনই আকস্মিক প্রলয়সঙ্কেতের মতো এল ব্যাঙ্ক ফেলের দুঃসংবাদ। যে মদ্যপান ছিল কর্মের শ্রান্তিহর, তাই পরিণত হল আত্মবিস্মৃতির আসবে।

প্রথম অঙ্কেই যোগেশের শোচনীয় পরিণাম সুনির্ধারিত হয়ে গেছে। পতনের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম, মর্যাদার আসন পুনরুদ্ধারের-প্রয়াস, ট্র্যাজেডি-নায়কের বৈশিষ্ট্য। 'A feeling of colossal waste' বা মহতী বিনষ্টির বোধই বেদনান্ত ট্র্যাজেডি-র অন্যতম ফলশ্রুতি। কিন্তু প্রফুল্ল নাটকের উপসংহারে সে বেদনা সঞ্চারিত হয় না। প্রফুল্ল ও পীতাম্বরের সহযোগিতায় রমেশের চক্রান্ত-জাল ছিন্ন করে পারিবারিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা যোগেশের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। স্রোতের মুখে খড়ের মতো যোগেশ সমগ্র পরিবারকে চরম সর্বনাশের অতলে তলিয়ে যেতে দিয়েছে। অথচ কখনও মনে হয় না শোচনীয় বিনষ্টির এমন সর্বাত্মক বহ্যুৎসব অপ্রতিরোধ্য ছিল। 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—হতাশের আক্ষেপোক্তি মাত্র। প্রসঙ্গত স্মরণীয় —হৃতগৌরব ওথেলোর রক্তাক্ত হৃদয়ের প্রকাশ—

…I pray you, in your letters,
When you shall these unlucky deeds relate,
Speak of me as I am ; nothing extenueate,
Nor set down aught in malice. Then must you speak
Of one that lov'd not wisely, but too well ;
Of one not easily jealous, but, being wrought,
Perplexed in the extreme ;…

প্রফুল্ল নাটকের পঞ্চমাঙ্কে খুন-জখমের অবতারণা ঘটনাধারার অনিবার্য পরিণাম নয় ; যোগেশের ট্র্যাজেডিতেও কোনো নতুন তাৎপর্য যোগ করেনি। যোগেশের মতোই আমরাও ঘোষ পরিবারের পতনে অসহায় দ্রষ্টা মাত্র। সুতরাং কোনো ট্র্যাজিক ইম্‌প্রেশন বা আত্মদর্শন প্রফুল্ল-র ফলশ্রুতি হয়। শোকসঞ্জাত করুণ রস নয়, গভীর দুঃখজনিত ভূমাবোধই ট্র্যাজেডি-র প্রকৃত রসাস্বাদ। সে-দিকে গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল সর্বদুঃখহর ঐশী কৃপাবাদ প্রচারের দিকে। তাই পৌরাণিক নাটকেই তাঁর মানসিক প্রবণতা স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তি লাভ করেছে। জনার তীব্র প্রতিহিংসা, বিল্বমঙ্গলের কামোন্মাদ পরমপ্রাপ্তির আনন্দে লৌকিক চাওয়া-পাওয়ার জগৎ অতিক্রম করেছে। ট্র্যাজি-কমেডিতেই পৌরাণিক নাটকের সার্থক পরিণতি। সুতরাং এখানেও শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির ছায়ানুসন্ধান করা অনুচিত। কয়েকটি দৃশ্য, কোনো কোনো উক্তি বা কোনো চরিত্রের প্রভাব বিচ্ছিন্ন উদাহরণ মাত্র। গিরিশের নাটকে এ রকম প্রভাবের ঘটনা প্রচুর। প্রেতচ্ছায়া

দর্শন, অতিপ্রাকৃতের সহযোগ —নিঃসন্দেহে শেক্সপীরীয় নাট্যরীতির অনুসৃতি; কিন্তু শেক্সপীয়র-ট্র্যাজেডি-র জীবনদর্শন গিরিশচন্দ্রের শিল্পীপ্রকৃতির অনুকূল ছিল না।

গৃহলক্ষ্মী নাটকের বিষয়বিন্যাসে ও গঠনে 'প্রফুল্ল'-র নাট্যরীতিই অনুসৃত হয়েছে। আবার উভয়েরই মূলে আছে গীতাভিনয়-প্রণেতা মনোমোহনের 'প্রণয়-পরীক্ষা'-র প্রভাব। প্রফুল্ল নাটকের ভিলেন নায়কের ভাই রমেশ, গৃহলক্ষ্মীতে ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রফুল্লর বিকল্পচরিত্র বিরজা। পারিবারিক পরিবেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে ষড়যন্ত্র, স্বার্থবোধ, মামলা, উইল-জাল, অকৃতজ্ঞতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গিরিশচন্দ্র দেখিয়েছেন, সুখ সহজলভ্য নয়। কিন্তু এর বেশি কোনো জীবনরহস্য উন্মোচনে তাঁর লক্ষ্য ছিল না। ট্র্যাজেডি-র ছকে সেকালের সামাজিক নক্সা পরিবেষণেই গিরিশচন্দ্রের নৈপুণ্য। তিনি নিজে অভিনেতা ছিলেন বলেই সহানুভূতিগুণে চরিত্রানুগ সংলাপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তাই তাঁর সামাজিক নক্সা অনেক সময় প্রায় ট্র্যাজিক কারুণ্যকে স্পর্শ করেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় সমকালীন; সুতরাং একত্রে আলোচনায় অসুবিধে নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন, 'প্রথমে Shakespeare-এর অনুসরণে Blank verse-এ নাটক লিখিতে আরম্ভ করি।' কিন্তু 'তারাবাই'-এর অমিত্রাক্ষর নাট্যোপযোগী হয়নি। কারণ কবিতায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'অত্যধিক আসক্তি।' অমিত্রাক্ষর-সংলাপ 'অস্বাভাবিক ঠেকিবেই' মন্তব্যও সুবিবেচনার ফল নয়। ট্র্যাজেডিয়ান রূপে গিরিশচন্দ্র শেক্সপীরীয় অর্থে সফল না হলেও অমিত্রাক্ষরের নাটকীয় রূপদানে তাঁর বিচক্ষণতা বিস্ময়কর। উক্ত মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, বিলাতযাত্রার পূর্বে, বিলাত প্রবাসে এবং প্রত্যাগমনের পর শেক্সপীয়রের নাট্যাভিনয় দর্শন করেছেন বটে, কিন্তু ভিন্ন কোটির চরিত্রের মুখে অমিত্রছন্দের বিচিত্র নিরীক্ষায় শেক্সপীয়র যে-ছন্দটির অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন, তা দ্বিজেন্দ্রলালের অনুভবে ধরা পড়েনি। মধুসূদন গিরিশচন্দ্র অথবা জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের তুলনায় শেক্সপীরীয় আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য সফলভাবে বাংলানাটকে প্রবর্তনের কৃতিত্ব অবশ্যই দ্বিজেন্দ্রলাল দাবি করতে পারেন। আধুনিক মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা তাঁর চরিত্রায়নে শেক্সপীরীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ফোটাতে পেরেছে। নাটকের একমুখী লক্ষ্য সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তি, 'নাটকের গতি নদীর স্রোতের মতো; অন্যান্য উপনদী তাহার উপর আসিয়া পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে মাত্র। প্রেম নাটকের মুখ্য বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন রোমিও ও জুলিয়েট। লোভ মুখ্য বিষয় হইলে লোভের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; যেমন ম্যাকবেথ।' এখানে শেক্সপীরীয় নাটকের গঠনকেই তিনি আদর্শ নাট্যশৈলী রূপে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু 'কালিদাস ও ভবভূতি'-র আলোচনাক্রমে শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে তাঁর 'বিবেচনা' —'তিনি (শেক্সপীয়র) ধন ও

ক্ষমতায় গর্বিত ইংরাজ। পার্থিব ক্ষমতাই তাঁহার কাছে সর্বাধিক লোভনীয়। বলা বাহুল্য, শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডি পার্থিব ক্ষমতালোভের নাট্যরূপ নয়। To err is human—এই চিরন্তন সত্যকেই ট্র্যাজেডি বাস্তব জীবনরঙ্গভূমির দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে থেকে উৎক্ষিপ্ত করে দেখায়। এবং প্রায়শই সেই ভ্রান্তির বীজ চরিত্রের মহনীয়তার সঙ্গে যুক্ত। কোন রন্ধ্রপথে যে-পতনসম্ভাবনা চরিত্রে অবশ্যম্ভাবী প্রবণতা রূপে দেখা দেয়, তার কোনো সরল সহজ অনুসিদ্ধান্ত নেই। ম্যাকবেথ বা ব্রুটাসের চরিত্রে পার্থিব ক্ষমতালোভ যদি বা থাকে, হ্যামলেট অথবা ওথেলোতে কিসের লোভ, কিসের গর্ব ?

সুতরাং দেখা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল শেক্সপীয়র-অনুরাগী ; বিশেষত ট্র্যাজেডি-র অনুরাগী হলেও ট্র্যাজেডি-র গভীর গম্ভীর জীবনদর্শন তিনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি। অবশ্য চন্দ্রগুপ্ত, শাজাহান, নুরজাহান নাটকত্রয়ী বাংলাসাহিত্যে প্রসিদ্ধ ট্র্যাজিক গুণান্বিত রচনা। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'বাংলানাটকের ইতিহাসে নুরজাহান ও শাজাহান নাটক যথাক্রমে 'tragedy of character' ও 'tragedy of sufferings'-এর উচ্চতর আদর্শ হিসাবে বিরাজ করিবে।' কিন্তু নুরজাহান চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কোনো ইতিবাচক প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করেনি, শাজাহান চরিত্রে কিং লিয়রের উপস্থিতি সত্ত্বেও বলতে হয়, নাট্যকাহিনীর সূচনা থেকেই তিনি অশক্ত, অসহায়—অর্থাৎ ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের অনুপযুক্ত চরিত্র। তাঁর পরিণাম শোচনীয়—pathetic, কিন্তু tragic নয়। চাণক্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে, জীবনের হিসাব-নিকাশে ট্র্যাজেডি-র অনিবার্য বিষাদ-বিধুরতা আছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, কবিত্ব উচ্ছ্বাসের দ্বারা অতিমাত্রায় চালিত না হলে, চরিত্রগুলির অন্তঃসঙ্গতি রক্ষায় আর-একটু যত্ন নিলে তাঁর হাতেই বাংলা সাহিত্য উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি লাভ করতে পারত। গিরিশচন্দ্র-অনুসারী গীতাভিনয়-প্রণেতা রূপেই ক্ষীরোদপ্রসাদ, এমন কি পূর্বসূরী মনোমোহন, রাজকৃষ্ণ বাংলা নাটকের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত। আলিবাবা তাঁর শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি, কিন্তু ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স বা পরিপূর্ণ রোমান্স-রসে যাঁর শিল্পীসত্তা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে ভালোবাসে এবং উত্তরপর্বে যিনি ভক্তির অমৃত পান করেই পরিতৃপ্তি পেতে চান, তাঁর কাছে ট্র্যাজিক সংবিদ আশা করা যায় না। তাই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি-নাটকের সম্ভাবনা তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই আলমগীরে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তিনি একান্ত চতুর, আত্মনির্ভরশীল, কপট-ক্রূর, কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠ, চরিত্রবান, পরিশ্রমী, মিতাচারী। সারা জীবনের ষড়যন্ত্র, বঞ্চনা গুপ্তহত্যার স্মৃতি তাঁর চিত্তলোকে সজীব। অপরে তাঁকে দোষারোপ করার সাহস পায় না। কিন্তু সম্রাট তো চোখ বুঁজলেই উচ্চাশার উজ্জ্বল কীর্তিপ্রদীপের নীচে সঞ্চিত কালিমা দেখতে পান, অনিদ্রারোগ তারই ফল (লেডি ম্যাকবেথের নিদ্রাভ্রমণ স্মরণীয়)। কিন্তু এখানে স্বগতোক্তিই চরিত্রবিকাশের উপায় ; আলমগীর একাধারে খল ও

নায়ক। ক্ষীরোদপ্রসাদ এইভাবেই চরিত্রটি চিত্রিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু উপস্থাপনার দোষে সেটি পরিস্ফুট হয়নি। উদিপুরীর মাধ্যমেই আলমগীর প্রকাশিত ; চরিত্রটি স্বয়ং বিকাশিত নয়।

রবীন্দ্র-নাটকের ট্র্যাজেডি কবির বিশেষ প্রত্যয়ের সূত্রে আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথ বহু প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রের নাম ও রচনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি-র তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের অনুসরণীয় হতে পারেনি। তবু রাজা ও রানী এবং বিসর্জন নাটকে পঞ্চাঙ্ক শেক্সপীয়র-ট্র্যাজেডি-র গঠনশৈলী অনেকাংশে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য এখানেও কবির স্বকীয় জীবন-উপলব্ধি —'দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত' লক্ষ্য করা যায়। দেবদত্ত ঠিক শেক্সপীয়রের 'ফুল' নয় (দ্বিজেন্দ্রলালের দিলদার সেই শ্রেণীর) ; প্রতিমা বিসর্জন দিয়েও 'বিসর্জন' নাটকের সমাপ্তি ঘটেনি। শেক্সপীরীয় অর্থে পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যেই রঘুপতির পিতৃহৃদয়ের হাহাকারেই ট্র্যাজেডি পূর্ণ বলয়িত। কিন্তু 'Sense of colossal waste'-কে রবীন্দ্রনাথ চরম সত্য রূপে স্বীকার করেননি। তাই বিসর্জনের পর প্রতিষ্ঠা, জয়সিংহকে হারিয়ে রঘুপতির বিপুল বিশ্বকে লাভ।

পূর্ববর্তী নাট্যকারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্য এই যে, তাঁরা ট্র্যাজেডি-রচনায় শেক্সপীয়রকেই আদর্শ করেছেন। কিন্তু নিছক নেতিবাচন যে ট্র্যাজেডির মূল বক্তব্য (negative hero) নয়, জীবনের বিশাল প্রতিশ্রুতি এবং তার অমিত পারম্পর্যে যে শোচনীয় পরিণাম-সম্ভাবনা ট্র্যাজেডি-র প্রকৃত রসাস্বাদ ; পতনশীল চরিত্রের মধ্যে আপনাকে প্রতিফলিত দেখেই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে —এই বোধটি অঙ্গীকার করতে পারেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীরীয় পথে চলেননি, তার কারণ তাঁর স্বকীয় ট্র্যাজেডি-র আদর্শ ছিল।

উনিশ শতকে বাঙালীর সাহিত্যচর্চায় শেক্সপীয়র প্রায় মধ্যমণি ; কিন্তু ট্র্যাজেডি-র দার্শনিক জীবনপ্রত্যয়ের চেয়ে মৃত্যু-হত্যাজনিত বহিরঙ্গ করুণ রসের ব্যাপারই তৎকালে বেশি আকর্ষণীয় হয়েছিল। তাই পৌরাণিক-ঐতিহাসিক-সামাজিক নাটকে যত্রতত্র শেক্সপীয়রের নাটকের ঘটনা বা চমৎকার-উৎপাদনের প্রক্রিয়ার অনুসৃতি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথে ট্র্যাজেডি-র মতো জীবনরহস্যের গভীরে অবগাহনের প্রয়াস লক্ষিত হয় না। পূর্ণচন্দ্র বসুর 'সাহিত্যে খুন' জাতীয় প্রবন্ধে অভিব্যক্ত মতামত মোটামুটি উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের মতের প্রতিধ্বনি মনে করা যায় না। কারণ 'শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কার মুক্ত দৃষ্টিতেই শেক্সপীয়রকে গ্রহণ করেছেন। এলিজাবেথীয় রেনেসাঁসের ভাবাধারে যে পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি-র ঈর্ষ্যা-ক্রোধ-উচ্চাশা-প্রেম সমুত্থ জীবনরস উচ্ছলিত হবার সম্ভাবনা ছিল, তার যথোচিত অনুবর্তনের হয়ত উপযোগী ছিল না উনিশ শতকের সমাজ পরিবেশ। বিদেশীর রাষ্ট্রিক শাসনে শাসিত অথচ বহুদিনের সামন্তচেতনার নিদ্রা থেকে হঠাৎ জাগরিত হল বাংলার সমাজ। কিন্তু শেক্সপীরীয় ট্র্যাজিক সংবেদনা

যে সে-যুগে অসম্ভব ছিল না, তার প্রমাণ বঙ্কিমের উপন্যাস। খাঁটি ট্র্যাজেডিয়ানের দৃষ্টি বঙ্কিমের ছিল।

'এ জীবন লইয়া আমি কি করিব?' এই জিজ্ঞাসার তাড়নাতেই বঙ্কিম লেখনী ধরেছিলেন। নতুবা ডেপুটি হাকিমের জীবন সুখেই কাটতে পারত। বঙ্কিম উপন্যাসের বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেই যুগের সমাজ বাস্তবতার আত্মীকরণে তাঁর আগ্রহই সবচেয়ে শিল্পোত্তীর্ণ। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষাসংস্কার, স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন, স্বাধীন প্রেম বনাম সামাজিক দাম্পত্যসংস্কারের দ্বন্দ্ব, সবশেষে নিজেরই জর্জরিত আত্মার দ্বন্দ্ব যথার্থ ট্র্যাজিক উপাদানে গঠিত। তাই বঙ্কিম-উপন্যাসের মঞ্চরূপেই ট্র্যাজেডি-র রস সঞ্চারিত হয়েছিল। কলোনীয় রেনেসাঁসের খণ্ডিত জাগরণের প্রকৃত ট্র্যাজেডি তবু মহাকাব্যে বা উপন্যাসে ধরা পড়েছিল। গোরা-র ট্র্যাজেডি উপনিবেশ-ভারতবর্ষের জাগরণের যন্ত্রণা, ক্ষোভ, উচ্ছ্বাস, অভিমান, সীমাবদ্ধতা সব কিছু নিয়েই উপস্থিত। সেখানে শেক্সপীয়রের ছক নেই, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জোয়ালে বাঁধা মুক্তিকামী ব্যক্তিমানুষের আত্মার ক্রন্দন আছে, পরিপার্শ্বের সঙ্গে, নিজের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম আছে। সমাজবাস্তবতাকে আত্মীকরণের সেই নিষ্ঠা বা যুগসত্যকে উপলব্ধির জন্য সেই গভীর বেদনা ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলালে ছিল না। ট্র্যাজেডি-র মৃত্যু-পরিণামী নাট্যরূপ সহজেই দর্শকদের অশ্রুসজলতা এবং প্রযোজককে অর্থসফলতা দেবে —এই ভরসাতেই তাঁরা নিছক ট্র্যাজেডি-নাট্যের কিছু বহিরঙ্গলক্ষণ অনুকরণ করেছিলেন মাত্র।

গর্কির সাহিত্য-ঐতিহ্য প্রসঙ্গে

ম্যাক্সিম গর্কি বাংলা সাহিত্যে একটি বহুশ্রুত নাম। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে তাঁর খ্যাতির আসন সর্বদেশের সর্বকালের পাঠক-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তবু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সারিতে গর্কির একটি তাৎপর্যচিহ্নিত স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পরেও সেই মহৎ তাৎপর্যই আমাদের অনুধাবনীয়। বঞ্চিত মানবতার মুক্তির আন্দোলনে গর্কির সাহিত্যিক ঐতিহ্য বিশেষ স্মরণীয়। খনিমজুর, গ্রামের শিক্ষক, বেকারী-মজুর, চাষী, আলকাতরা-মজুর, জুতোর দোকানের বয়, রাস্তার ভবঘুরে, রাজনীতিক কর্মী —এই সব সাধারণ, অত্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে স্পন্দিত যে হৃদয়, তার মধ্যেই আছে অসাধারণ জীবনের প্রতিশ্রুতি। সাহিত্যিক যে তটস্থের মতো জীবন পর্যবেক্ষণ করেন পছন্দমতো কয়েকটি মানুষকে তাঁর গল্প-উপন্যাস-নাটকের আকর্ষণীয় চরিত্র রূপেই গ্রহণ করবেন না, বাস্তব জীবনের কর্মধারা এবং শিল্পীর সাধনা যে অভিন্ন, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গর্কির সাহিত্যকর্ম।

একটি ফ্যান্টাসি জাতীয় রচনায় গর্কির পাঠক বলেছে: 'Perhaps you will say, life presents no patterns but those we present. Speak not thus, for it is a shame and a disgrace that one blessed with the power to write should acknowledge his impotence in the face of life and his inability to rise above it.' উক্ত পাঠক গর্কিরই অন্তরঙ্গ সত্তা। তাঁর মতে শিল্পী শুধু জীবন থেকেই চরিত্রের প্যাটার্ন গ্রহণ করেন না, সে তো স্থূল বাস্তববাদীর (ন্যাচারালিস্ট) কাজ। প্রকৃত কল্পনার অধিকারী শিল্পী জীবনোন্নয়নের জন্যই প্যাটার্ন সৃষ্টি করেন, তার অংশত বাস্তব অভিজ্ঞতা-প্রসূত, অংশত লেখকের দূরপ্রসারী কল্পনার ফল।

আর্থিক দারিদ্র্য ও বঞ্চনা-বিড়ম্বনার শৈশব যাকে জীবিকার তাগিদে নানা ছোটখাট কাজে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খাটতে বাধ্য করেছে, তিন বছরে বাবাকে এবং ন' বছরে মাকে হারিয়ে যে ভবঘুরে হয়ে ইউক্রেন বেসারেবিআ, ক্রিমিআ, ককেশীয় সাগরের উপকূল পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছে, তাঁর জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতার জগৎই তাঁর পাঠশালা এবং বিশ্ববিদ্যালয়। এই অভিজ্ঞতারই অংশ এ. এম. ক্যালুঝ্‌নি,

পি. এ. ঝালোমভ। তাদের জন্যই রেলওয়ের মেরামতী কারখানার মিস্ত্রী আলেক্সি পেশকভ লেখেন 'মকর চুদ্রা' (১৮৯২)। ঝালোমভ ছিলেন একজন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবী শ্রমিক। তারই আদর্শে সৃষ্ট সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার প্রথম নায়ক প্যাভেল ভ্লাসভ —'মা' উপন্যাসের নায়ক। মানিলোভ্নার মধ্যে হয়ত আছেন লেখকের স্নেহময়ী দিদিমা ; কিন্তু লেখকের স্বদেশধ্যান, ভবিষ্যতের রাশিয়া-স্বপ্ন সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে মাদার নিলোভ্না চরিত্রে। গোরা উপন্যাসে আনন্দময়ী যেমন রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধৃত ভারতবর্ষ, স্বাধিকারবোধে অস্থির, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে তৎপর ভারতবর্ষ। মাদার নিলোভ্না তেমনি গর্কির রাশিয়া। জার-শাসিত রাশিয়া, বিপ্লবী আন্দোলনে উত্তাল রাশিয়া।

দুই

ম্যাক্সিম গর্কি অক্লান্তকর্মী লেখক। সাহিত্য তাঁর কাছে কলাকুতূহল নয়, জীবনেরই প্রকাশ। তাই গর্কির জীবনকথা এবং গল্প-উপন্যাস-নাটক একসূত্রে বাঁধা। তাঁর পত্রাবলী এবং তিনখণ্ডে প্রকাশিত আত্মস্মৃতি যেমন ব্যক্তিজীবনের তথ্যবহ, তেমনি 'লাইফ অব ক্লিম স্যামগিন' 'মাদার' 'ফোমা গোর্দেয়েভ' আত্মজীবন-বৃত্তান্তেরই অংশ। সব উপন্যাসই শেষত উপন্যাসকারের আত্মকথা —এই সরলী-করণ অর্থে গর্কির উপন্যাস-গল্প-নাটক আত্মজীবনমূলক নয় ; গভীর ও তাৎপর্যময় অর্থেই সত্য। পৃথিবীতে এমন লেখকের সংখ্যা বিরল যিনি অভিজ্ঞতার বিবরণী লিখেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী হতে পেরেছেন। কারণ তাঁর অফুরন্ত অভিজ্ঞতার উৎস দীর্ঘ ৬৮ বছরের আয়ুষ্কালেও শুকিয়ে যায়নি।

'কেন লেখেন' ? এ প্রশ্নের জবাবে গর্কির উত্তর : দুটি কারণে তাঁর লেখনী অবিরাম চলে। প্রথম, অতি বড় দুঃখবিপর্যয়ের কৈশোরের দিনগুলিতে দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য আনন্দময় কল্পরাজ্য রচনা —যেমন 'সঙ অব দি ফ্যালকন' 'সঙ অব দি স্টর্মি পেট্রেল' 'দি হার্ট অব ডাঙ্কো' প্রভৃতি। দ্বিতীয়, মনে অভিজ্ঞতাগুলির ছবি এত স্পষ্ট যে তাদের না লিখে পারা যায় না। এই পর্যায়ের মধ্যে পড়ে 'টুয়েন্টিসিক্স মেন এ্যাণ্ড এ গার্ল' 'দি অর্লভস্ মিস্চিফ-মেকার' প্রভৃতি। সাহিত্য যে মূক বঞ্চিত মানবতার মুক্তিমন্ত্র ! তাই রাজনৈতিক মুক্তি, দাসপ্রথার অবলোপ ; জারের অর্থনৈতিক দাসত্বের মুক্তি এবং সাহিত্য-চিন্তা গর্কির জীবনে অপরিহার্য ঐক্যে গ্রথিত। জনৈক পাঠকের মত : সাহিত্যের কাজ হল, to help man to know itself and support his striving after truth, to discover the good in people and root out what his ignoble ; to kindle shame, wrath ! Courage in their hearts ; to help them acquire a strength dedicated to lofty purposes and sanctity, their lines with the holy spirit of beauty —এখানেই ঋষি তলস্তয়ের সঙ্গে তাঁর

পার্থক্য। তলস্তয়ের প্রত্যয়ভিত্তি খ্রীষ্টদর্শনের পাপবোধ, তাই আত্মশুদ্ধিতেই (Moral Purification) পাপের পর্যবসান। গর্কির জীবনপ্রত্যয়ের প্রথম কথা 'How proud the word rings-Man !' তলস্তয়ের মানুষ, দুটি মানুষের সমষ্টি। একটি ঈশ্বরের পুত্র, নিরবচ্ছিন্ন ভালো; অপরটি শয়তানের পুত্র, নিরঙ্কুশ মন্দ। যেমন জার-জমিদার, তেমনি মুজিক, সমাজতন্ত্রী —কারও পক্ষেই তলস্তয়ের নিঃসন্দিগ্ধ সহানুভূতি ছিল না। অন্যপক্ষে তলস্তয়ের একান্ত গুণগ্রাহী গর্কি বলশেভিক বিপ্লবীদের সংগ্রামে প্রত্যক্ষত সামিল হয়েছেন। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে যেমন কৃষক-শ্রমিক সংগ্রামের অগ্রগতি ঘটেছে, তাঁর রচনাতে পড়েছে তার স্বাক্ষর। উনিশ শতকের নয়ের দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকের গর্কি সাহিত্যের পার্থক্য দেশের আভ্যন্তর পরিবর্তনেরই পরিচায়ক। তলস্তয় শান্তি, মঙ্গল, শাশ্বত সত্যের সন্ধানী, অধ্যাত্মভাবুক; কিন্তু একটা অশান্ত অস্থৈর্য, মানসিক সংঘাত তাঁকে শেষদিন পর্যন্ত জর্জরিত করেছে। গর্কি কথার অর্থ, 'তিক্ততা', তিক্ততার স্বাদ নিয়েই আলেক্সি পেশকভের জীবনারম্ভ; তবু মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসায়, জনগণের সংগ্রামী চেতনায়, মানবসভ্যতার মহত্তর ভবিষ্যতে নিঃসংশয় গর্কি আশাবাদী শিল্পী।

এই আশাবাদও তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার। ভবঘুরে হিসেবে সর্বহারা, বংশপরিচয়হীন, সমাজের উঞ্ছপুষ্টদের মধ্যে যে হিংসা, নীচতা, বন্ধুতা, মহত্বের সমন্বয় দেখেছেন, সভ্যসমাজ ছিল তার চেয়ে কদর্য, অথচ ভবঘুরেদের সেই সরলতা বলিষ্ঠ জীবনোদ্যম ছিল না। এই অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার থেকেই তলস্তয়কে তিনি লিখতে পেরেছিলেন, 'কাউণ্ট লিও নিকোলায়েভিচ, আপনি প্রকৃতই বিশ্বের জীবিত সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠতার অধিকারে কোনোমতেই আপনি তাদের যা-তা বলতে পারেন না, যারা নির্লোভ হয়েই আন্তরিকভাবে মানুষকে ভালোবেসে তাদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাজ, তাদের আন্তরিকতা কোনো অংশেই আপনার কাজ ও আন্তরিকতার চেয়ে হেয় নয়।' পশ্চিমী বুর্জোয়াদের 'টাইমস' পত্রিকা যে সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রচারে তলস্তয়কে কাজে লাগাবে, সে বিষয়ে গর্কির দূরদৃষ্টিও অত্যন্ত স্বচ্ছ। সাহিত্যিকের কাজ শব্দের বেসাতি সাজানো নয়, প্রতিটি শব্দ এবং বাক্যসমষ্টি কোন শ্রেণীর প্রয়োজন সিদ্ধ করছে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া সচেতন সাহিত্যিকের অবশ্য কর্তব্য। তিনি বাস্তব জীবনে কাকে সমর্থন করেন, সে-প্রশ্ন অবান্তর। শিল্পের নিয়মেই শিল্পীর পক্ষপাত, শিল্পীর সহযোগ, সহিতত্ব ব্যঞ্জিত হয়ে উঠবে।

গর্কির সাহিত্য-ঐতিহ্য আমাদের একটি মূল্যবান শিক্ষা দেয়। বাস্তব জীবনের দুঃখকর অভিজ্ঞতা যেন জীবনের নামে দৃষ্টিকে অন্ধ না করে। লরেন্সও নীচুতলার মানুষের জীবন দেখেছেন, ডস্টয়েভস্কির রচনাতেও মানসিক যন্ত্রণার আলেখ্য আছে, তবু লরেন্স বা ডস্টয়েভস্কি সমগ্র সত্যের বোধ হারিয়েছিলেন। গর্কির গল্প-উপন্যাস

অনেকক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষধর্মী ; কিন্তু যা-দেখেছেন তার আবিলতা বা আংশিকতা তাঁর সমগ্র দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। এখানেই গর্কি সাহিত্যের মহৎ উত্তরাধিকার।

তিন

গর্কি সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হতে পারে। যিনি পৃথিবীকে ভালোবাসেন, মানুষের লাঞ্ছনা যাঁকে দৈহিক যন্ত্রণার মতোই অস্থির করে, তিনি প্রকৃতির অনুরাগী হবেন, এটাই স্বাভাবিক। মাথার ওপরে উন্মুক্ত নীলাকাশ, চারপাশের বিস্তীর্ণ সবুজ বা তুষারাচ্ছন্ন তৃণভূমি কে না ভালোবাসে। গর্কি-সাহিত্যে শুধু বর্ণময় বর্ণনা নয়, গল্প স্থাপনার ফ্রেম নয়, নিসর্গের একটি বিশেষ শক্তি আছে। কখনো নিসর্গ তাঁর সাহিত্যে বিড়ম্বিত মানুষেরই প্রতিচ্ছবি, কখনো প্রতিকূলতা জয়ের উৎসাহদাতা, কখনো নৈরাশ্যঅন্ধকার মোচনের অবশ্যম্ভাবিতা জানায়। অর্থাৎ প্রকৃতি মানবজীবনের পটভূমি এবং তদতিরিক্ত। প্রতীকী অর্থে গর্কির প্রকৃতি আশ্চর্যভাবে চিন্ময়। গর্কির এমন কোনো গল্প-উপন্যাস নেই, যাতে প্রকৃতি গল্পরসের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়নি। সাধারণত বাস্তবধর্মী কথাশিল্পী মানুষের জীবনালেখ্য অঙ্কনে প্রকৃতিকে পরিহার করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যমোহাঞ্জন পাছে রোমান্টিক রসাস্বাদ এনে দেয়। কিন্তু গর্কির সে শুচিবাতিক ছিল না। অনায়াসেই তাঁর বাস্তবধর্মী সাহিত্যে তথাকথিত রোমান্টিক নিসর্গ বর্ণনা মর্যাদা পেয়েছে।

প্রথম গল্পের (মকর চুদ্রা) আরম্ভ : 'A cold damp wind came out of the Sea, wafting over the Steppe the pensive melody of the waves breaking on the shore and the ruslte of dry brushes.' (বাতাসে একটি একটি করে হলুদপাতা ঝরে পড়ে, সেগুলি আগুন পোয়াবার কাজে লাগে। শরৎরাত্রির অন্ধকার চিরে আলোর রেখা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দেখা যায় বাঁ-দিকে তৃণভূমির আদিগন্ত বিস্তার, ডান দিকে অনন্ত সমুদ্র, সামনে একজন বুড়ো সহিস)। এখানে প্রকৃতি মূলত গল্পের ক্যান্‌ভ্যাস, কিন্তু নিঃসঙ্গ সহিস মকর চুদ্রা-কে যেন আনন্দ, আশা যুগিয়েছে প্রকৃতির সহযোগী আচরণ। আবার প্রতীকী ব্যঞ্জনার আশ্চর্য উদাহরণ ঝড়ের পাখীর গান। তখনও ১৯০৫-এর সংগ্রামে দেশ উত্তাল হয়ে ওঠেনি, ১৯১৭-র সর্বাঙ্গীন অভ্যুত্থান দূরতর। কিন্তু বিপ্লবী সাহিত্যিকের মুক্তিস্বপ্ন আকাশবিদারী ফ্যালকনের মধ্যে পেয়েছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও অজেয় মনোবলের ভাস্বর প্রতীক, ঝড়ের পাখীর মধ্যে সেই বিজয়ী আকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত।

'জলরাশি গর্জন করছে। আকাশে বাজের সংঘাত। সমুদ্রের ওপর দিয়ে তীব্রবিদ্যুতের কশা ঝড়োমেঘে আঘাত হানছে। বিদ্যুতের তীরগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে। সর্পিল ফেনিল জলোচ্ছ্বাস সমুদ্রের গভীরে বিলীন।

'ঝড় আসছে। ঝড় এসে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল বলে। ...তবু ঝড়ের

পাখী চলেছে ডানা মেলে …অপ্রতিহত গতিতে …বিদ্যুৎ, মেঘের গর্জন, সমুদ্রের উথাল-পাথালি সব তুচ্ছ করে। তার স্বর ভেসে আসছে ভবিষ্যদ্বাণীর মতো—

'ভেঙে পড়ুক ঝড় তার সম্পূর্ণ ভয়ঙ্করতা নিয়ে।' —এ যেন রূপকথার বর্ণনা অথচ রূপক কথা, বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সাফল্যের শুভ শঙ্খনাদ। গর্কিই সেই মুক্ত বিহঙ্গ, নির্বাধ, নির্ভয়।

'মা' উপন্যাসে বিপ্লবীদের কর্মকৌশল এবং চরিত্র-চিত্রই প্রধান। সেখানে প্রকৃতি-বর্ণনার স্থান সঙ্কুচিত। তবু গর্কির বৈশিষ্ট্য সেখানেও লক্ষণীয়। 'মাটির বুকে কারখানাটা ছড়িয়ে আছে তার কালো চিমনিগুলো উঁচিয়ে। যেন একটা বিরাট মাকড়সা। তারই গা-ঘেঁসে জলার ধারে ধারে শ্রমিকদের একতলা বাড়িগুলো কুঁজো হয়ে, গায়ে গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। …বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে দেখা যায় গীর্জা। কারখানার মতোই ওটার গাঢ় লাল রঙ। কিন্তু চিমনির মতো অতদূর উঠতে পারেনি ওর চুড়ো।' এই নিসর্গভাবুকতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় বিপুলকায় উপন্যাস-রাজি —'লাইফ অফ ক্লিম স্যামগিন'। সমালোচক লুনাচারস্কির মন্তব্য সত্য—মানুষের অন্তরের সূক্ষ্ম অনুভূতিকেই তিনি প্রকৃতির পটে সম্প্রসারিত করেছেন।

চার

গর্কি-সাহিত্যের বিপ্লবী উত্তরাধিকার সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। অনেকে বলেন, গর্কি না-কি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় সুখী ছিলেন না, তাঁর মৃত্যুও রহস্যজনক, হয়ত বা হত্যা। এ দেশে গর্কি জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে কেউ কেউ এই সব ধারণার প্রতিধ্বনি করেছেন। অর্থাৎ স্পষ্টতই স্তালিন-শাসিত রাশিয়ার সততা সম্পর্কে তাঁদের সংশয়। সে যাইহোক, ধারণা মাত্রেই মত নয়, মত মাত্রেই সত্য নয়। এ ধরনের মন্তব্য তথ্যনির্ভর নয়, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভ্রান্তির প্রতিধ্বনি। অল্প বয়স থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ছিল খারাপ, সর্দি-কাশি তাঁর প্রায় নিত্যসঙ্গী, যক্ষ্মার লক্ষণও অল্প বয়সেই ধরা পড়ে। তবু তিনি বিশ্বসাহিত্য সংস্থার সভাপতি, বিজ্ঞান-একাডেমির সদস্য ছিলেন, বহু পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা পরিচালনা করেছেন, গল্প-উপন্যাস-স্মৃতিকথা ও পত্র রচনায় অক্লান্তকর্মী ছিলেন, এই কর্মপ্রবাহই প্রমাণ করে লেনিনের মতোই স্তালিনের আমলে তিনি রাষ্ট্রের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। ১৯৩৩ সালে তিনি অসুস্থ। তবু সেটা সংবাদ হিসেবে বিজ্ঞাপিত হয়নি। কারণ অসুখ ছিল তাঁর পুরনো সঙ্গী। তখনও তিনি লিখছেন দস্তিগায়েভ নাটক, সম্পাদনা করছেন 'বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনবৃত্ত', 'কবিদের গ্রন্থাগার' প্রভৃতি। ১৯৩৪ সালে পুত্র-বিয়োগ। তখনও তিনি পূর্ণোদ্যমে কাজে লিপ্ত। প্রথম লেখক-সম্মেলনে যথারীতি সুচিন্তিত প্রতিবেদনও পেশ করেছেন। ১৯৩৬ সালেও প্রকাশিত হয়েছে ক্লিম স্যামগিনের নতুন খণ্ড। তারপর হঠাৎ আবার সেই অসুখের আক্রমণ এবং মৃত্যু।

চরিত্রসৃজন মহৎশিল্পীর অবশ্যকৃত্য। নতুন যুগ সৃষ্টি করে নতুন চরিত্র। কিন্তু সেই নির্মীয়মান চরিত্রবত্তা কেবল ভবিষ্যচেতনাসম্পন্ন সংবেদী সাহিত্যিকের কল্পনাতেই সমগ্র রূপে ধরা দেয়। গর্কির পাভেল ভ্লাসভ, লুদমিল্লা, ভেস্শ্চিকভ, স্যামগিন, আর্তামানভস্ নতুন রাশিয়ার সমাজবাস্তবের নতুন নরনারী। তলস্তয় এদের দেখেননি, দেখতে চাননি, পাস্তেরনাকও না। করলেঙ্কো, রেপিন, চেকভ যাঁদের আংশিক দেখেছেন, তাঁদেরই সম্পূর্ণভাবে দেখিয়েছেন ম্যাক্সিম গর্কি। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্যিক রূপায়ণ কেমন হবে, গর্কিই তার পথপ্রদর্শক।

উনিশ বছর বয়সে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেও বলা যায়, বিপ্লবের সোনালী আলো যদি না দেখা দিত, গর্কি তবু বিপ্লবেরই শিল্প রচনা করতেন। ১৮৮০-৮৫ সালের মধ্যেই তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুমণ্ডলীর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। এই কাজান-ছাত্ররা ছিলেন সাহিত্য-সঙ্গীত চর্চায় নিপুণ এবং বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে জেহাদ ও গভীর মানবপ্রীতিই ছিল গর্কির অপরাজেয় ধর্ম, যা ভেদ করে বিচ্ছিন্নবাদী চিন্তার অনুপ্রবেশ কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। এই কাজানপর্ব থেকেই বিপ্লবী গর্কির জীবনপথ সুচিহ্নিত হয়ে যায়।

গর্কির সব উপন্যাস বা গল্পগুচ্ছের মূল্যায়ন আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। পত্রাবলীর মধ্যেও গর্কির ব্যক্তিমানসের এবং শিল্পীমানসের বহু বিচিত্র দিক উন্মোচিত। গর্কি-ঐতিহ্যের সংগ্রামশীলতা, 'সত্য পরিপূর্ণতা এবং ন্যায়বিচারের জন্য অপরিতৃপ্ত, নিয়ত, প্রয়াস', ইতর কদর্য পরিবেশের মধ্যেই মানুষের আত্মার উজ্জ্বলতার সন্ধান —বিশ্বের মুক্তিকামী দেশ মাত্রেরই সাহিত্যকর্মীদের অনুসরণ-যোগ্য আদর্শ।

পাঁচ

বাংলা-হিন্দী-কন্নড-মালয়ালাম-তেলুগু প্রভৃতি ভারতীয় আধুনিক সাহিত্যে গর্কির প্রভাব অল্প নয়। সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় এ দেশে গর্কির 'মা' এবং ছোট গল্পগুলি। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবে যে-সব ভারতীয় বিপ্লবী যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা অনেকেই গর্কির সাহিত্যধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিত ছিলেন। ডাঃ. ভূপেন্দ্র-নাথ দত্তের সাক্ষ্যে জানা যায়, গর্কির রচনাতেই এ দেশের বিপ্লবীরা প্রথম বিপ্লবের উপযোগী নতুন সাহিত্য রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন।

কাজী নজরুল ইসলামের 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কৃত 'মা', 'মাদার' উপন্যাসের প্রথম অনুবাদ। তারপর বেরোয় বিমল সেনের সংক্ষেপিত অনুবাদ, পরে পুষ্পময়ী বসুর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। খগেন্দ্রনাথ মিত্র গর্কির ডায়েরি ও অনেকগুলি গল্প অনুবাদ করেন। ইংরেজিতে এলাহাবাদ থেকে বেরোয় 'নানা লেখা', সরোজ দত্ত তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। 'কেমন করে লিখতে শিখি' অনুবাদ করেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী। কল্লোল-কালিকলম পর্বের শৈলজানন্দ-

প্রেমেন প্রমুখ একদা গর্কির অনুরাগী ছিলেন। অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বুদ্ধদেব বসু গর্কি সম্বন্ধে কিছু তিরস্কৃত মন্তব্য মাত্র করেছেন। শরৎচন্দ্রের একটি পত্রে দেখি, তিনি বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের সাহিত্যে গর্কির মতো জীবনের গভীরে অবগাহনের দাবি তুলেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে সে দাবি সুস্পষ্ট কোনো শিল্পরূপ পায়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চরিত্রায়ণে, নীচুতলার মানুষের প্রতি গভীর সহ-মর্মিতায়, নিসর্গ চিত্রণে গর্কি-মনস্কতা লক্ষ্য করা যায়। নুট হামসুন, যোহান বোয়ারের সঙ্গে গর্কির পার্থক্য কল্লোলীয়রা বোঝেননি —মানিকের এই আক্ষেপও তাৎপর্যপূর্ণ। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে তাঁর সাহিত্য আংশিকতাদুষ্ট হলেও বাংলা সাহিত্যে আর কেউ জীবনসত্য অন্বেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সতত সজাগ নন। তাই তিনি নিয়ত নিরীক্ষার শিল্পী। শহরতলীর যশোদা, সোনার চেয়ে দামীর ভোলার মা, হারানের নাতজামাই, মেজাজের ভৈরব, শান্তিলতার সুখেন্দু গর্কি-ঐতিহ্যে সৃষ্ট নরনারী।

বাংলাদেশের বিপ্লবীরা জেলে বসে পড়েছেন বানার্ড শ-র ফেবিয়ান সোশ্যালিজম, রবীন্দ্রনাথের গোরা, ম্যাক্সিম গর্কির মা। সাম্যবাদী চিন্তাধারার ভিত্তি গড়েছে মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন-স্তালিন রচনাবলী, কিন্তু গর্কির সাহিত্য-ঐতিহ্য নতুন রচনার কর্মযজ্ঞে আহ্বান জানিয়েছে। হিন্দী সাহিত্যেও অনেকে প্রেমচন্দের সঙ্গে গর্কির সাধর্ম্য তুলনা করেন। শচীরাণী গুর্টু সম্পাদিত 'প্রেমচন্দ অউর গর্কি' সঙ্কলনে এ রূপ কিছু রচনা আছে। নজরুল ইসলামের 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসে গর্কি সুলভ বিপ্লবী চরিত্র, সাধারণ গ্রাম্য মানুষের আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে। ডঃ. রাধা-কমল মুখোপাধ্যায় 'বর্তমান বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে রুশসাহিত্যের বিপ্লবী বাস্তবতা প্রসঙ্গে গর্কি-সাহিত্যের আলোচনা করেন।

ছয়

এ কথা স্বীকার্য, আমাদের প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে আজও গর্কি-চর্চাকে যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বাংলা প্রগতি-সাহিত্যে বাস্তব ঘটনার ছবি আঁকা হচ্ছে—ধর্মঘট, লক-আউট, ট্রেড ইউনিয়নে বিশ্বাসঘাতকতা, সচেতন ও পশ্চাৎপদ শ্রমিক মনোভাবের দ্বন্দ্ব প্রভৃতির রূপায়ণও যথার্থ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা কিসের যেন অভাব অনুভব করা যাচ্ছে। সাহিত্যসৃষ্টির সাফল্য বিষয়ে কোনো ফরমূলা নেই। তবু মনে হয়, সৃষ্টিধর্মী, কল্পনা বা বিপ্লবী রোমান্টিকতার অভাব তার অনেকখানি কারণ। এ বিষয়ে গর্কি আমাদের দিশারী বন্ধু। তাঁর কথায়: 'Reality is always the realisation of an ideal, and when we negate and change reality, we do so because the ideal realised by us in it no longer satisfies us; we

have —in our imagination another, better one.' যে সুন্দর জগৎ সামাজিক কার্যকারণ শৃঙ্খলে নেই, অথচ অসম্ভব নয়, জীবনে তার অনুভব বা অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা চরম সৌন্দর্যবাদেরই কথা। অথচ এটাই গর্কি-আদর্শের বিপ্লবী রোমান্টিকতা। ইংরেজি সাহিত্যের মানবপন্থী ঐতিহ্য আমাদের সারস্বত জীবনে যতখানি প্রাধান্য পেয়েছে, গর্কির সংগ্রামী মানবতা ততটা নয়। এর জন্য হয়ত অংশত দায়ী ইংরেজি শিক্ষাক্রম, কিন্তু গর্কি ঐতিহ্যচর্চায় অমনোযোগও কম দায়ী নয়। গর্কির সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে মাত্র দুটি প্রবন্ধ বাংলায় পড়েছি; অধিকাংশই তাঁর ছোটগল্পের প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ মাত্র। বিপ্লবী কার্যক্রম, বিপ্লবী সংগঠন এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সাহিত্য পরস্পর যুক্ত। শেষোক্ত ভাবধারার প্রবক্তা ম্যাক্সিম গর্কি তাই আমাদেরও তরুণ গল্প-নাটক-উপন্যাসকারদের কাছে বিপ্লবের পুরোধা শিল্পী। গর্কি-চর্চা সুস্থ মনন ও যথার্থ বাস্তববাদী সাহিত্যসৃষ্টির প্রস্তুতিপর্ব রচনা করে।

রামমোহন রায় : কয়েকটি প্রসঙ্গ

রামমোহন রায়ের জীবন (১৭৭২-১৮৩৩) এত কর্মবহুল ও তাৎপর্যময় ঘটনাপূর্ণ যে, প্রায় দেড় শ' বছর পরেও তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং ভূমিকা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, হৃদয়হীন দেশাচার এবং সব রকম দাসত্বের বিরুদ্ধে যিনি জেহাদ ঘোষণা করেন, শোষণের শৃঙ্খল ছিন্ন করে মানবমুক্তির বাণী প্রচার করেন তাঁকে কায়েমী স্বার্থ কোনো দেশেই অবিরোধীভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। তাঁর নারী-মুক্তিচেতনার উত্তরাধিকার বিদ্যাসাগর প্রমুখের আন্দোলনে সার্থকতা পেয়েছে। ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ে রামমোহনের ঐতিহ্য যাঁরা ব্রাহ্মসমাজের মাথা বলে পরিচিত তাঁরাই ব্যর্থ করেছেন। ব্যতিক্রম অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতেই শাস্ত্রকে দেখেছেন ; অবতার, প্রত্যাদেশ আনুষ্ঠানিকতাকে মূল্য দেননি। সে জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আক্ষেপ করেছেন। পরবর্তীকালে ধর্মের পুনরুত্থান প্রবণতা প্রধান হওয়ায় রামমোহন-ঐতিহ্য থেকে উনিশ শতকের রেনেসাঁস ভ্রষ্ট হয়েছে।

১৩২৭ সালে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'একশ বৎসর আগে রামমোহন রায়কে তাঁর বিপক্ষ দলের কাছ থেকে যে-সকল যুক্তিতর্ক শুনতে হত, আজকের দিনে আমাদেরও সেইসব যুক্তিতর্ক শুনতে হবে।'

এখনও নতুন পরিচ্ছদে সেগুলির পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ—

(১) তাঁর জন্মবৎসর ১৭৭২ না ১৭৭৪ ? (২) তিনি বিদ্যাশিক্ষার জন্য দীর্ঘকাল পাটনা ও কাশীতে ছিলেন কি-না ? (৩) তিনি তিব্বত গিয়েছিলেন ? (৪) তিনি জন ডিগ্‌বীর অধীনেই মূলত কাজ করেছিলেন, না ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন ? (৫) নীলচাষ সমর্থন করে তিনি কি কৃষকস্বার্থ উপেক্ষা করেননি ? (৬) স্পেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার স্বাধীনতায় উল্লসিত হলেও ইংরেজ ভারত-উপনিবেশ ছেড়ে যাক, তিনি কখনও ভেবেছেন কি ? (৭) ইংরেজ বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের পক্ষ সমর্থন পরোক্ষত বিদেশী পুঁজিকে সমর্থন করা নয় কি ? (৮) ভারতীয়দের প্রশাসনে সর্বদা জমিদার শ্রেণীকেই জনসাধারণের প্রতিভূ-রূপে দেখার জন্য তিনি কি ইংরেজদের কাছে ওকালতি করেননি ?

এ ছাড়া ধর্মমত সম্বন্ধে বহু বিতর্ক আছে ; তার বিশদ আলোচনা এখানে

নিষ্প্রয়োজন। বাংলার (তথাকথিত?) নবজাগৃতিতে রামমোহন ব্যক্তিত্বের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন যথাস্থানে তার উল্লেখ করা হবে।

প্রথম চারটি প্রশ্ন জীবনবৃত্তান্তের তথ্যমূলক। তাঁর সেক্রেটারি আর্নট এবং তদনুসারে কলেট জন্ম সন ১৭৭২ ধরেছেন। ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি এবং তাঁর কাছ থেকে শুনে ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় কি বলেছেন, এ-প্রসঙ্গে তার যৌক্তিকতা সামান্য। অন্য পক্ষে আর্নট এবং অন্যান্য রামমোহন-ভক্ত ইউনিটারিয়ানদের উপস্থিতিতেই তাঁঃ সমাধিফলকে জন্ম সন ১৭৭২ লেখা হয়েছিল। রামমোহনের বন্ধু ও অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুরও তার প্রতিবাদ করেননি। কিশোরীচাঁদ মিত্রের Life of Dwarakanath Tagore (১৮৭০) বইও এ-সম্পর্কে নীরব।

পাটনা, তিব্বত ও কাশীবাস সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার বিশ্বাসের অভিমত পরস্পর-বিরোধী। বর্তমান প্রসঙ্গে এইসব তথ্য অপরিহার্য নয় বলেই কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো আমাদের পক্ষে আবশ্যিক নয়।

পাঁচ থেকে আট নম্বর পর্যন্ত প্রশ্নগুলির বিশদ পর্যালোচনা প্রয়োজন। এগুলির সঙ্গেই রামমোহন উত্তরাধিকারে মেহনতি মানুষের সংস্কৃতির প্রশ্নও জড়িত।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে, রামমোহন সমৃদ্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত সামন্ত পরিবারের সন্তান। যথারীতি ফিউডাল ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান রূপেই তার বাল্যশিক্ষা, উপনয়ন, একাধিক বিবাহ সংঘটিত হয়। পিতা রামকান্তের সম্পত্তির অংশ পেয়ে পৃথক বসবাস পর্যন্ত জীবনের ধারা ফিউডাল পদ্ধতিতেই চলেছে। তারপর স্বাধীন-ভাবে সম্পত্তি কেনাবেচা, বেনিয়ানের কাজ করা ইত্যাদিও নবোদিত সামন্তশ্রেণীর বৈষয়িক উচ্চাশা-পূরণেরই ইঙ্গিত দেয়। বস্তুতঃপক্ষে ১৮১৪ সালের শেষভাগে কলকাতাবাসের পর্ব থেকেই রামমোহনের জীবন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফিউডাল সমাজের মূল্যবোধের সঙ্গে তাঁর সংঘাত তীব্রতর, সর্বতোমুখী হয়েছে বলেই পক্ষ-প্রতিপক্ষ মিলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাস্বাতন্ত্র্যকে মূল্য দিয়েছে। কিন্তু ১৮১৪ থেকে ১৮৩৩ পর্যন্ত রামমোহনের যে বিচিত্র কর্মবহুল জীবন তার প্রস্তুতি পূর্বেই হয়েছিল। স্বগ্রামের প্রতিবেশী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার (হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী) তাঁকে হয়ত তন্ত্রশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞান দিয়েছেন, ফার্সী মুন্সী একেশ্বরবাদে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, কিন্তু এ সব তথ্য দিয়ে রামমোহনের বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় আগ্রহ, বেকনীয় যুক্তিবাদ, মায়াবাদ-বর্জিত বেদান্তব্যাখ্যা, সম্প্রদায় নিরপেক্ষ উপাসনা-পদ্ধতির যথার্থ ব্যাখ্যা হয় না।

পাটনায় থাকার সময় মুসলিম মোতাজেলা সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করে থাকবে। যা মানুষের যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য নয়, তা যতোই শাস্ত্রানুমোদিত এবং দেশের আইনসম্মত হোক, তিনি মানতে চাননি। তোহ্‌ফাৎ-উল মুয়াহিদ্দীনের একাংশে আছে: 'It may be seen that the truth of

a saying does not depend upon the multitude of sayers, and the nonreliability of a narration cannot result from the small number of its narrators.'

এখানেই প্রথম পৌত্তলিকতা-বিরোধী একেশ্বরবাদের পক্ষে রামমোহন কিছু বললেন। রচনাকাল ১৮০৩ বা ১৮০৪। পিতা রামকান্তের মৃত্যু হয় ১৮০৪ সালে এবং তখনও পিতার উইলের শর্ত হিসেবে তিনি রাধাকান্ত বিগ্রহের সেবাখরচ দিচ্ছেন। আবার জন ডিগ্‌বি-র দেওয়ান রূপে ইংরেজিতে বৈষয়িক, আইন সংক্রান্ত চিঠিপত্র লিখছেন, ইংরেজি সংবাদপত্র পড়ছেন, বিশ্বরাজনীতি বিষয়ে অবহিত হচ্ছেন, পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস এবং দর্শন পড়ছেন! ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে রামমোহনকে দেওয়ান পদে নিয়োগের জন্য ডিগ্‌বি ১৮১০ সালে যে চিঠি লেখেন তাতে দেখা যাচ্ছে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সদর দেওয়ানী আদালত রামমোহন সম্পর্কে তখনই ওয়াকিবহাল। ১৮০৯ সালে লেখা স্বয়ং রামমোহনের চিঠিতেও ঐ ধরনের রেফারেন্স আছে। সুতরাং মনে হয় ১৮০১ থেকে ১৮১০ সালের মধ্যে তিনি দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ইংরেজদের ফার্সী শিক্ষার সঙ্গে জড়িত হন এবং খ্রীস্টধর্ম বিষয়েও আগ্রহী হন। ডিগ্‌বি ইউনিটারিয়ান ধর্মে বিশ্বাসী বলেই একেশ্বরবাদের খ্রীস্টীয় ভিত্তি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে তাঁর সুবিধা হয় এবং সাধারণ খ্রীস্টানরা ক্রুদ্ধ হলেও তাঁর চাকরি যাবার ভয় ছিল না। রংপুরে থাকার সময় কোম্পানীর চাকরি গেলেও তিনি সেখানে থেকে যান। স্বাধীনভাবে এই সময়ে নানা বিষয়ে চর্চার আরও বেশী সুযোগ পান। কলকাতায় আত্মীয়সভা প্রতিষ্ঠার আগেই একটি সেমিনার জাতীয় আলোচনাসভা তিনি রংপুরেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে ধর্ম রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হত। ১৮০০ থেকে ১৮১৫ পর্যন্ত সময় রামমোহনের আন্তর প্রস্তুতির কাল।

রামমোহনের অর্থনৈতিক শ্রেণী ভিত্তি

এই সময়েই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ভঙ্গিও আমূল বদলে গেল। সমগ্র রায় পরিবার যখন অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ছন্নছাড়া, কেউ আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত, কেউ ঋণের দায়ে জেলে, তখন তিনি একের পর এক নতুন জমিদারি কিনছেন এবং প্রভাবশালী ইংরেজদের টাকা ধার দিচ্ছেন। ১৭৯৯ সালে চন্দ্রকোণা এবং জাহানাবাদ পরগণা থেকেই বছরে প্রায় বাইশ হাজার টাকার মতো সরকারকে দিয়েও পাঁচ ছ'হাজার আয় করেছেন। অর্থাৎ জগমোহন ও রামলোচন কালচক্রের গতি পরিবর্তন বুঝতে পারেননি। পুরনো গ্রামীণ সামন্তই থেকে গিয়েছিলেন! তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নিজেদের বাঁচাতে পারেননি। অন্যদিকে, কালচক্রের পরিবর্তন বুঝতে পেরেই রামমোহন একাধারে জমিদার বেনিয়ান, রাজপুরুষ সেরেস্তাদার দেওয়ান হয়েছিলেন। এইভাবেই তিনি নিজের অর্থনৈতিক ভিত্তি বদলেছিলেন।

সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সূত্র ছিন্ন হয়নি; আবার বণিকতন্ত্রের (মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া?) সঙ্গেও বন্ধন দৃঢ় ছিল।

কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার আমল এবং নীলকুঠির আমলকে পুঁজির প্রাথমিক সঞ্চয়ের কাল বলা যায়। রামমোহন দেশের এই অর্থনৈতিক কালান্তরের স্বরূপ প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। তার প্রমাণ রয়েছে অবাধ বাণিজ্য বিষয়ে তাঁর আলোচনায়। তাই তিনি সামন্তবাদী ঝোঁক কাটিয়ে উদীয়মান ধনতন্ত্রীযুগের 'স্বাধীন ব্যক্তি' হতে পেরেছিলেন। রামমোহনের শ্রেণীভিত্তি যতটা ফিউডাল, তার চেয়ে বেশী মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালিজমের সঙ্গে যুক্ত।

রামমোহনের সামন্তবাদী ঝোঁক?

নিজে নবোদিত বণিক-বুর্জোয়াশ্রেণীর অগ্রগণ্য হয়েও তিনি দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের পক্ষে ইংলণ্ডের রাজার কাছে বৃত্তি-বৃদ্ধির আবেদন করতে গেলেন কেন? তার চেয়ে বড় কথা, এ দেশের বিদ্বান ধনাঢ্য সমাজে এবং ইংরেজ সিভিলিয়ান সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা পাবার পর সেই হৃতশক্তি ক্ষয়িষ্ণু বাদশাহের দেওয়া খেতাব 'রাজা' ব্যবহারে তিনি অগৌরব বোধ করেননি কেন? কোম্পানী-কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'বাদশাহের দূত' রূপে অস্বীকার করায় তিনি সাধারণ ব্যক্তি ('a private individual') রূপেই ইংলণ্ডে যান। এই তুচ্ছ কথাটির তাৎপর্য অনেকেই মনে রাখেন না। কিন্তু সেখানে গিয়েই তিনি ঘোষণা করেন, 'His Majesty the Emperor of Delhi has likewise commissioned me.' ব্রিস্টলের সমাধিফলকেও 'রাজা' খেতাব স্বীকৃত।

মনে রাখা দরকার, রামমোহন কতকগুলি রাজনৈতিক দাবি নিয়েই পার্লামেণ্ট কমিটির কাছে হাজির হয়েছিলেন। কলেটও মেনেছেন, 'But about this time Rammohun's chief pre-occupation was political rather than social or ceremonial.' সেই দাবি যাতে স্বীকৃত হয়, সে-দিকেই মনোযোগ থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ভারতীয় প্রতিনিধির কথা শোনার সাংবিধানিক বাধ্যতা যখন পার্লামেণ্টের নেই, তখন প্রতিনিধিত্বকে গুরুত্বপূর্ণ করার জন্য 'রাজা' খেতাবের হয়ত দরকার ছিল। কিন্তু প্রকৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলি তিনি বিস্মৃত হননি। রিফর্ম বিল, কোম্পানী সনদ-সংশোধন, ভারতীয় প্রজাদের মত গ্রহণ, জুরিপ্রথা, প্রশাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, করনির্ধারণের নীতি প্রভৃতি বিষয়ে হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে তিনি যে বক্তব্য পেশ করেন তাতে কোথাও সামন্তবাদী প্রবণতা বা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তোষণনীতি ব্যক্ত হয়নি। বরং তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বলেছেন, এতে রায়তদের ওপর নির্যাতন বেড়েছে। কারণ সরকার জমিদারদের রাজস্ব বেঁধে দিয়েছেন, রায়তদের নয়। ফলে পতিত জমিকে আবাদী করে এবং নানাভাবে জমিদাররা

রায়তদের খাজনা বাড়াচ্ছেন। তারা আইনের আশ্রয় পায়নি। এভাবে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষিত প্রতিশ্রুতি (অসহায় রায়তদের রক্ষা করা যে আইনের প্রধান লক্ষ্য) সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। জমিদারের লাভের কড়ি যোগাতে রায়ত সর্বস্বান্ত। তাছাড়া, খাজনা বাকী পড়লে জমিদার আদালতে নালিশ করে ডিক্রী পায়, কিন্তু খাজনাবৃদ্ধি ন্যায়সঙ্গত কি-না, তা বিচারের এক্তিয়ার আদালতের নেই। এ ক্ষেত্রে রায়তদের সর্বনাশ সুনিশ্চিত। জমিদার এবং তার আমলারা সহজেই বিচারবিভাগকে প্রতারিত করত —এ কথাও রামমোহন বলেছেন।

তখন দেশে যাঁরা কলেক্টর তাঁরাই ম্যাজিস্ট্রেট। অর্থাৎ অভিযোক্তা ও বিচারক ছিলেন একই ব্যক্তি, তাই অভিযুক্ত ব্যক্তির সুবিচারের আশা থাকত না। তাঁর প্রস্তাব ছিল, 'the Collector should not by means be armed with Magisterial powers.' ইংরাজ কলেক্টরদের বেতনহার (মাসিক ১০০০/১৫০০) কমিয়ে, বিলাস পণ্যের ওপর কর বাড়িয়ে রায়তদের খাজনা হ্রাসের সুপারিশও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব কর্মসূচী এবং চিন্তাধারা প্রমাণ করে, চিন্তাধারায় ফিউডাল পিছুটান তাঁর ছিল না।

বণিকতন্ত্রী ধনবাদের সঙ্গে সম্পর্ক

পার্লামেন্টের সনদ অনুযায়ী ভারত ও সিংহলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার পেল। মাটি মিশিয়ে অহেতুক নুনের দাম বাড়াল, চিনিরও। ১৮১৩ সালে সনদের কিছু পরিবর্তন হলেও একচেটিয়া অধিকার ঠিকই রইল। রামমোহন নিজে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করতেন, টাকা কর্জ দিতেন এবং গ্রামে-শহরে অবাধ বাণিজ্যের (Free Trade) পত্তন কামনা করতেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি জেনেছিলেন, পুঁজির একচেটিয়া অবস্থায় রায়ত ও শ্রমিকরা অসহায়, আইনও বিপক্ষে। অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগিতার দরুণ অন্তত কৃষককর্মীরা উচ্চহারে মজুরি পাবে এবং কর্মসংস্থানও বাড়বে। ১৭৭৫ সালে কোম্পানীর পক্ষে মিঃ. ফ্রান্সিস ও শোর কোর্ট অব ডিরেক্টরদের অবাধ বাণিজ্যের বিপক্ষে যে বিবরণ পাঠান তাতেও পরোক্ষত একচেটিয়া বাণিজ্যের দোষত্রুটি স্বীকৃতি পেয়েছে। রায়তদের খুব কষ্ট হবে, তাঁতীরা বড় অসুবিধেয় পড়বে— তাঁদের এ যুক্তিগুলিও ভণ্ডামি। কারণ কোম্পানীর শাসনেই তাঁতীরা দরিদ্র হয়েছে, রায়তরা নির্যাতিত হয়েছে। অবাধ বাণিজ্যেও হবে। অর্থনৈতিক শোষণই অবাধ বাণিজ্যের ভিত্তি। তবু একচেটিয়া ব্যবস্থার চেয়ে এই স্তর উন্নততর। তাছাড়া এই স্তর ভারতীয় শিল্পে ধনবাদের অগ্রগতি ঘটাবে। রাম-মোহন সে জন্য মনোপলি বনাম ফ্রি ট্রেডের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে ফ্রি ট্রেডের পক্ষ গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকভাবে এই বণিকতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের বিকাশ প্রয়োজনীয় ছিল। রামমোহন সেই ইতিহাস-লিখন যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন।

কার্ল মার্কস ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই লক্ষ্য করেছিলেন, ভারতে ইংরেজশাসনের ভূমিকা ধ্বংসাত্মক এবং অগ্রগতির সূচক। কাঁচামাল লুণ্ঠনের জন্য পাতা রেললাইন ধরেই আসবে বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান সম্ভার। গ্রামাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা দূর হবে। বংশগত শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে ভাঙন ধরবে। যদিও বৃটিশ শাসনের শেষ না করতে পারলে ভারতের জনগণের মুক্তি নেই, তবু ভারতে ইংরেজশাসনের প্রগতিশীল ভূমিকা অবশ্য স্বীকার্য।

সিংহলের দৃষ্টান্ত ও রামমোহন

১৮০৬ সালে সিংহলের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষির উন্নতি সাধনের জন্য স্যর আলেকজাণ্ডার জনস্টনকে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে বলা হয়। ১৮১০ সালে তাঁর রিপোর্ট অনুযায়ী কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার রদ হল। স্বাধীন বাণিজ্যের আওতায় রায়তদের অর্থনৈতিক অবস্থা একটু উন্নত হল। সেই দৃষ্টান্তে রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ ব্যক্তিরা উৎসাহী হলেন। ১৮২৭ সালে য়ুরোপীয় বণিকেরা ইংরেজ সরকারের প্রশস্তি করে এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অবাধ প্রতিযোগিতার অধিকার চাইলেন। কিন্তু তা গ্রাহ্য হল না। কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং সরকার তখন সমার্থক। ১৮২৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সংবাদ কৌমুদীতে রামমোহন-সমর্থক দ্বারকানাথ 'একজন জমিদার' নাম দিয়ে লিখলেন, 'এ কথা সুবিদিত যে নীল চাষের জন্য বহুল পরিমাণ পতিত জমিতে আবাদ হয়েছে, নীলকরদের দেশব্যাপী অর্থ বিনিয়োগে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা স্বচ্ছল হতে পেরেছে। যে সব চাষী জমিদারের জবরদস্তিতে বিনামূল্যে বা অল্প পরিমাণ ধানের বিনিময়ে কাজ করতে বাধ্য হত, তারা এখন নীলকরদের কাছে স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও মাসিক চার টাকা বেতন পাচ্ছে।' (ঈষৎ পরিবর্তিত) এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ঠিক নয় তা দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিত মিত্রের 'History of Indigo Disturbances in Bengal' পড়লেই জানা যায়। নীলকর এবং চা-কর বণিকেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মতোই রায়ত শোষণের নানা বৈধ অবৈধ উপায় বার করেন। তাছাড়া রামমোহন যে প্রশাসন ও বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য চেয়েছিলেন, তার অভাবে নীলচাষ রহিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বেশীরভাগ নীলকরই ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। সুতরাং নীলের দাদন থেকে পুরুষানুক্রমে রায়তদের রেহাই ছিল না।

তবে এও লক্ষণীয় যে, ১৮৩৩ সালে অবাধ বাণিজ্যের নীতি সীমিতভাবে স্বীকৃত হলে এই অত্যাচার শোষণ বেড়ে যায়। রামমোহনের সময়ে অতটা নিদারুণ অবস্থা হতে পারেনি। মূল কথাটা দাঁড়াচ্ছে, রামমোহন অবাধ বাণিজ্যের পক্ষ নিয়ে এ দেশে পরোক্ষত শিল্প-বিপ্লবকেই কি আহ্বান করেননি? কিন্তু লুণ্ঠনবাজ বিদেশীরা এ দেশের যথার্থ শিল্পায়ন চায়নি।

১৮২৮-২৯ সালের মধ্যে ল্যাঙ্কাস্টার, লীডস্, লিভারপুল, গ্লাসগো, মানচার-

ল্যাণ্ড, ওয়েকফিল্ড প্রভৃতি অঞ্চলের বণিকেরা সকলেই নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পার্লামেণ্টের কাছে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার চেয়েছেন। ইংলণ্ডে বেন্থামপন্থী উদারনীতিকেরা অবাধ বাণিজ্য সমর্থন করেছেন। বণিকেরা পণ্যমূল্য বাড়িয়ে, কৃষকদের মজুরি বাড়িয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করেছেন এই মর্মে অনেক রিপোর্ট পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়। সে-সব থেকেই হয়ত রামমোহনের ধারণা হয়ে থাকবে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এ দেশে শিল্পায়ন করছে না, তখন অন্য বণিকদের চেষ্টায় সেই শিল্পসম্প্রসারণ সম্ভব হবে। ইংলণ্ডবাসের সময় য়ুরোপের উন্নত শিল্প-অর্থনীতি যে রামমোহনকে আকৃষ্ট করেছিল ১৮৩২ সালের ১৪ই জুলাইয়ে লেখা চিঠিতে তার প্রমাণ আছে।

গণতান্ত্রিক অধিকার ও রামমোহন

গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির মধ্যে গতিবিধির স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রধান। ১৮১৮ সালে সংবাদপত্র প্রকাশের সময় কোনো আইন ছিল না। কিন্তু রামমোহন আদি সংবাদকৌমুদী প্রকাশ করলে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সংবাদপত্রে স্থান পেতে লাগল। খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারেরও অসুবিধে হল ব্রাহ্মণসেবধি-কৌমুদীর আলোচনায়। যুদ্ধের অজুহাতে প্রেস-নিয়ন্ত্রণ বিল আনা হল। এ সম্বন্ধে বেলির সুপারিশ: (১০ই অক্টোবর, ১৮২২) 'ভারতে ব্রিটিশসাম্রাজ্য মূলত নির্ভর করে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর কর্তাদের সানন্দ আনুগত্য, দেশীয় সেনাদের বিশ্বস্ততা এবং সরকারের শক্তি ও চরিত্রের ওপরে। আমাদের কর্মকাণ্ড এবং উদ্দেশ্য দেশীয় লোকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে কি-না এ সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশীয় লোকদের ধারণার ওপরেও।' (অনূদিত)

এর পরের মন্তব্য: 'The liberty of the Press, however essential to the nature of a free state, is not in my judgement, consistent with the character of our institution in this country, or with the extraordinary nature of our dominion in India.'

অর্থাৎ যে-ধরনের অন্যায় অবিবেচনা ইংরেজ কোম্পানী বা বণিক পাদ্রীদের মধ্যে ছিল, তার সমালোচনা নিকট ভবিষ্যতে সংবাদপত্রে ছাপা হবে এবং জন-আন্দোলন হবে, সেটা নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ (consistent) নয়। বেলির দীর্ঘ রিপোর্টে নেটিভদের প্রতি যে অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্য আছে, তা যে কোনো স্বাধীনচেতা মানুষকে উত্তেজিত করবে। রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ নব্যকালের নায়করা স্বভাবতই মত-প্রকাশের স্বাধীনতা দাবি করলেন। সুপ্রীম কোর্টের কাছে লিখিত আবেদনে তাঁরা জানালেন: 'To secure this important object, the unrestrained liberty of Publication is the only effectual means that can be employed. And should it ever

be abused, the established law of the land is very properly armed with efficient powers.'

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাই যে 'Civil Rights and Privileges' রক্ষার একমাত্র উপায় এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিচারপতি ম্যাক্‌নাটেন এই আবেদনে কর্ণপাত করেননি। তাই রামমোহন 'মীরাৎ-উল-আখবার' পত্রে (১০. ৪. ১৮২৩) লেখেন—

> কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য সমাজে সর্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই, প্রথমতঃ প্রধান সেক্রেটারির সহিত যে সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া দুরূহ। এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন সেই কাজের জন্য নানা লোকে পরিপূর্ণ পুলিশ আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে—
>
> অক্রুকে বা-সদ্ খুনই জিগর দস্ত্ দিহদ
> বা-উমেদ-ইকরম-এ, খাজা, বা-দারবান মা-ফরোশ
>
> (অর্থাৎ, যে সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয় কোনো অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না) দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।'

ভারতবাসীর পক্ষে চতুর্থ জর্জকে লিখিত ৫৫টি অনুচ্ছেদ সংবলিত আবেদন পত্রটি ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল। দার্শনিক জেরোমি বেন্থাম হয়ত উচ্ছ্বাসভরেই বলেছেন, 'দ্বিতীয় এ্যারিওপ্যাজিটিকা'। কিন্তু অতিকথন বাদ দিলে, একটি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সরকারের কাছে যা যা আশা করা যায়, রামমোহন তার প্রায় সবগুলিই দাবি করেছেন। অবশ্য প্রথমেই জানানো হয়েছে, ব্রিটিশ প্রশাসন পূর্বতন সব সরকারের তুলনায় বেশি অধিকার, সুখ-সুবিধে দিয়েছে, এ জন্য ভারতবাসীরা সকলেই কৃতজ্ঞ। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবেই এইটুকু স্বীকৃতি আবেদনপত্র রচনার নিয়ম বলেই গণ্য করতে হবে। তাছাড়া তিনি যে ইংরেজের আগমনকে বলেছেন Divine Providence, তাকেই আমরা ঐতিহাসিকভাবে প্রগতিশীল বলব শুধু এই কারণে যে গ্রাম্য স্বৈরাচারে আবদ্ধ গ্রামসমাজবিশিষ্ট ভারতের বিচ্ছিন্নতাকে দূর করে বৃহত্তর মানব-সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করে তার ভবিষ্যৎ মুক্তির পথ উন্মোচন করেছিল। মার্কস বলেছিলেন, '...আমি একটি প্রবন্ধে ...ইংলণ্ড কর্তৃক দেশীয় শিল্পকে ধ্বংসকরণ

বৈপ্লবিক বলেছি। এ ছাড়া ভারতে ইংরাজেরা যা করছে—সোওয়াইনিশ (শূয়োরের বাচ্চার কাজ) এবং এখনও তাই চলছে।' (এঙ্গেলস্‌কে লিখিত মার্কসের পত্র, ১৪ই জুন, ১৮৫৩)

এই আবেদনপত্রেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটি প্রাধান্য পেয়েছে। স্পষ্টত তিনি কোম্পানী কর্তৃপক্ষ, সরকার ও বিচারপতি ম্যাকনাটেন সম্পর্কে পক্ষপাতের অভিযোগ এনেছেন। জনসাধারণের মতামত জানার জন্য যে কুড়িদিন সময় ছিল, তার কোনো সদ্ব্যবহারই তাঁরা করতে চাননি। তাঁর ব্যারিস্টার ফার্গুসন ও সহযোগী টারটেজের সওয়াল পরিশিষ্ট রূপে তিনি জুড়ে দেন। আবেদনের ৩০নং অনুচ্ছেদটি উল্লেখ্য: 'A Government Conscious of rectitude of intention cannot be afraid of public scrutiny by means of the Press.' কারণ তাঁদের পৃষ্ঠপোষক, সিভিল সার্ভেণ্ট অনেক আছেন, তাঁরাও তো এই মাধ্যমকে কাজে লাগাতে পারবেন। যদি সত্যি সমর্থনযোগ্য বক্তব্য থাকে তাহলে ভয়ের কিছু নেই।

৩১নং অনুচ্ছেদের বক্তব্য: ফ্রি প্রেস পৃথিবীর কোথাও বিপ্লব ঘটায়নি; বরং মানুষ সহজেই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নানা দোষত্রুটি সম্বন্ধে অভিযোগ আনতে পারে, তার মীমাংসা হতে পারে এবং বিপ্লব পর্যন্ত বিক্ষোভ আর পৌঁছায় না। যদি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকে, তাহলেই অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয় অথচ সেগুলি প্রকাশের বা মীমাংসার পথও বন্ধ, তখনই বিপ্লব ঘটে। যদি তখন সৈন্য দিয়ে দাবানো হয়, তাহলে বরং বৃহত্তর অভ্যুত্থানের জন্য জনগণ প্রস্তুত হতে থাকে।

৩৪নং অনুচ্ছেদের বক্তব্য আরও বলিষ্ঠ। তাই সম্পূর্ণ অনূদিত হল: 'যদি এই দেশের বিশেষ অবস্থার (বিদেশীর শাসনাধীন) জন্য এইরূপ সিদ্ধান্ত (ফ্রি প্রেসের অধিকার দেওয়া যাবে না) গৃহীত হয় এবং যেহেতু ভারত একটি উপনিবেশ বা দূরস্থিত অধীন দেশ, সুতরাং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার নিরাপদ নয়; সুতরাং বাংলা দেশের অধিবাসীরা যে-সব সুবিধে ভোগ করেছে তা আর ভোগ করতে পাবে না, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে তারা নির্যাতিত অধঃপতিত থাকবে, যতদিন ব্রিটিশ শাসন থাকবে, ততদিন তাদের অবস্থার উন্নতির কোনো আশা নেই।'

৩৭নং অনুচ্ছেদের মর্ম: যদি আপনার প্রজারা চিন্তা করে যে, ইংরেজ জাতি নিজের স্বার্থানুযায়ী নীতিই গ্রহণ করছে, ভারত তাদের কাছে একটা মূল্যবান সম্পত্তি ছাড়া কিছু নয়, এর দখল রাখা এবং নানাভাবে এর থেকে সুবিধে আদায় করার জন্যই যত নিয়ম-নীতি, তাহলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত, নইলে জানবেন কি করে—তাঁদের সিভিল সার্ভেণ্টরা সম্পত্তি ঠিক রাখছে কি-না? ভালো প্রভু হতে গেলে দাসদের প্রতিও উদাসীন থাকা যায় না।

আর বিস্তৃত উদ্ধৃতি দেব না। সমগ্র আবেদনপত্রই রাজনৈতিক অধিকারবোধে উজ্জ্বল। রোম, ফ্রান্স, আমেরিকা, মোগলযুগের আওরঙ্গজেব ও আকবরের

আমল ইত্যাদির প্রাসঙ্গিক উল্লেখে রামমোহনের অধিকার-সচেতন মানসগঠনের পরিচয় পাই। সে জন্যই প্রতি অনুচ্ছেদে ইংরেজের ন্যায়বিচার ও সুশাসনের প্রশংসা সত্ত্বেও রাজা চতুর্থ জর্জ এই আবেদন না-মঞ্জুর করেন।

শাসন-সংস্কার ও রামমোহন

পশ্চিমী গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং ন্যায়-বিচার রামমোহনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষ ভারতে সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করছিল না বলেই তিনি আন্দোলনে নেমেছিলেন। বিলেত যাবার আগে তিনি যে-সব গণতান্ত্রিক দাবি উত্থাপন করেন, বিলেতেও সেগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেন। সুতরাং বোঝা যায়, বিদেশের মাটিতে পা দেবার আগেই রামমোহন শাসন-সংস্কার বিষয়ে চিন্তা করেছেন। সংক্ষেপে পার্লামেন্টের কাছে তার প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি—

রায়ত প্রসঙ্গে ॥ [১৯ আগস্ট ১৮৩১] জমিদাররা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উপকৃত। 'কিন্তু কৃষি কর্মীদের এমনই করুণ অবস্থা যে তাদের কথা বলতে গেলেই আমি গভীর বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ি।' (১) খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা। (২) রায়তের খাজনা হ্রাসের জন্য দরকার হলে জমিদারের রাজস্ব হ্রাস। (৩) কালেক্টরদের বেতন হ্রাস —ইউরোপীয়ের বদলে ভারতীয় নিয়োগ। শেষ আবেদন, 'To devise some mode of alleviating the present miseries of the agricultural peasantry of India.' (৪) জমিতে রায়তের স্থায়ী স্বত্ব স্বীকার করতেই হবে।

বিচার বিভাগ প্রসঙ্গে ॥ [১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৩১] (১) আদালতের ভাষা ইংরাজী হওয়া উচিত। (২) সাহেব এ্যাসেসরদের বদলে civil আদালতে দেশীয় এ্যাসেসর নিয়োগ —যাতে জমিদারের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি কাজ করতে পারেন। (৩) জুরি প্রথা প্রবর্তন —'গ্র্যাণ্ড জুরি' বর্জন —দেশী বিদেশী ব্যক্তিদের সমান মর্যাদা —প্রয়োজনবোধে গ্রামে পঞ্চায়েৎ গঠন। (৪) রাজস্ব কমিশনারকে বিচারপতি করা অনুচিত। (৫) বিচারপতিকে ম্যাজিস্ট্রেট করাও অনুচিত। (৬) ভারতের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের পর্যায়করণ (Codification)। (৭) আইন প্রণয়নের পূর্বে দেশীয় ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ।

রিফর্ম বিল প্রসঙ্গে ॥ ইংলণ্ডের উদারনৈতিক পার্লামেন্ট সদস্যদের পক্ষে প্রথম রিফর্ম বিল আনেন লর্ড জন রাসেল ১লা মার্চ, ১৮৩১ ; দ্বিতীয় রিফর্ম বিল ওঠে ২২শে সেপ্টেম্বর, হাউস অব লর্ডসে পরিত্যক্ত হয় (৮ই অক্টোবর)। তৃতীয় রিফর্ম বিল মার্চ ১৮৩২ সালে গৃহীত হয়। রামমোহন য়ুরোপ পৌছান ১৮৩১-এ। অর্থাৎ রিফর্ম বিল নিয়ে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মহলে যখন প্রবল আলোড়ন —সেই সময়েই তাঁর পদার্পণ। দ্বিতীয় বিল পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনি এত মর্মাহত হন যে,

প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, ঐ বিল গৃহীত না হলে তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করবেন, ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগও রাখবেন না। 'On the success of which (রিফর্ম বিল) the welfare of England, nay of the world, depends. I have been impatiently waiting in London to know the result of the Bill.' (৩১ মার্চ, ১৮৩২) 'রিফর্ম বিলের পক্ষ-প্রতিপক্ষের লড়াই আসলে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, যথার্থের সঙ্গে অযথার্থের।' (২৭ এপ্রিল) এবং মিঃ. উইলিয়ম র‍্যাথবোনকে লেখা চিঠিতে (৩১ জুলাই, ১৮৩২) রিফর্ম বিলের দ্বারা ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে নতুন যুগের সূচনায় উল্লাস এবং ক্রমশ উদার রাজনীতির প্রাধান্য বিস্তারের আশা প্রকাশ। সতীদাহ নিরোধ আইনের জন্য তিনি উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ও পার্লামেণ্টের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আন্তর্জাতিকতা ও রামমোহন

চতুর্থ জর্জকে লেখা পঞ্চান্ন-দফা সংবলিত পত্রেই রামমোহনের আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার পরিচয় পাই। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে দাস-প্রথার অবসান, স্পেনের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ, প্রকৃত সুশাসকের কর্তব্য, বিভিন্ন সময়ে মানুষের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতির মধ্যে একটা ব্যাপক আন্তর্জাতিক চেতনার উন্মেষ লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্সের স্বাধীনতাকে অভিবাদন জানানো, স্পেনের স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সম্মানে কলকাতার বাড়ি আলোকিত করা, তারই স্বীকৃতি রূপে ১৮১২ সালের স্পেনীয় সংবিধান রামমোহনকে উৎসর্গ করা, ফরাসী দেশে প্রবেশের বাধানিষেধ সম্পর্কে ফরাসী সরকারের কাছে সবিনয় প্রতিবাদ প্রভৃতি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভিন্ন জাতি ও জাতীয়তার মধ্যে সুস্থ রাজনৈতিক সম্পর্কের জন্য একটা সম্মিলিত জাতিকংগ্রেসের প্রস্তাবও সেই সময়ের বিচারে প্রাগ্রসর রাজনৈতিক চেতনার পরিচায়ক।

২২শে ডিসেম্বর, ১৮৩১ সালে রামমোহন টি. হাইড. ভিলিয়ার্সকে লেখেন, 'All that I can say for myself is, that I am a traveller and that my heart is with the French people in their endeavours to support the cause of liberal principles.' ২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৩১ ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লিখিত চিঠি রামমোহনের আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণার একটি মহার্ঘ দলিল। এই চিঠির মর্ম: (১) গত বারো বছর ধরেই তিনি স্বাধীন সংবিধানের দেশ এবং শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানে উন্নত দেশ ফ্রান্সের পরিচয় পেতে উৎসুক। বহু বাধা পার হয়ে যখন তিনি ফরাসী দেশের উপকূলে উপস্থিত, তখনই জানতে পারলেন, ফরাসী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র না পেলে তাঁর ঈপ্সিত দেশে তিনি পা দিতে পারবেন না। (২) অপক্ষপাত সাধারণ বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক যে, পার্থক্য সত্ত্বেও সকলেই এক বৃহৎ মানব-পরিবারের

অন্তর্ভুক্ত। 'Hence, enlightened men in all countries feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manners by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.' (৩) বিভিন্ন জাতির বা রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ ঘটলে Congress of Nations গঠন করা উচিত; সব দেশের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত এই কংগ্রেসে বিরোধের আলোচনা ও নিষ্পত্তি হতে পারে।

রামমোহন যেমন মুচলেকা দিয়ে পত্রিকা বার করতে চাননি, তেমনি পাশপোর্ট প্রথাকেই তাঁর অপমানকর মুচলেকা-প্রথা মনে হয়েছে।

শিক্ষাচিন্তা ও রামমোহন

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এ দেশে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তুমুল মতভেদ দেখা দেয়। ইংলণ্ডের ভারতপ্রশাসকরা ঠিক করলেন, বছরে একলাথ চল্লিশ হাজার টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় হবে। কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ খোলা হল। আরও এ ধরনের প্রাচ্য বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপিত হবে শোনা গেল। বেশির ভাগ লোকেই এতে খুশী। কারণ বেশির ভাগ লোকই ছিলেন রক্ষণশীল এবং নবাবী আমলের পতনে বৃত্তিচ্যুত পণ্ডিত-লেখকেরা আবার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের চাকা পেছনের দিকে ঘোরাতে রামমোহন চাননি। তাই হাজার বছর ধরে প্রচলিত পুরনো সংস্কৃতবিদ্যার পরিবর্তে নতুন পৃথিবীর আলো —পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজচিন্তা রাজনীতি ইত্যাদি শিক্ষণের জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন। এ সম্পর্কে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর চিঠি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি গণিত, দর্শন, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং অন্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সুপারিশ করেছেন। তিনি আমাদের দেশের অবস্থাকে প্রাক-বেকন পর্বের য়ুরোপের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, সংস্কৃত পণ্ডিতদের বৃত্তি দিয়ে টোলে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা অব্যাহত রেখে কলেজ মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাই প্রবর্তন করা উচিত। প্রাচ্যবিদ্যার প্রধান শাখা বেদান্ত, যার আলোচ্য বিষয় —আত্মা কিরূপে ···বিলীন হয়? স্বর্গীয় পরম সত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? পরিদৃশ্যমান বস্তু সবই অসৎ, যেমন পিতা, ভ্রাতা ইত্যাদি। সুতরাং এই সম্পর্কবন্ধনগুলি থেকে মুক্ত হয়ে যত তাড়াতাড়ি অন্য জগতে পৌছানো যায় ততই মঙ্গল। যুবচিত্তের পক্ষে এই শিক্ষা মোটেই উপযোগী নয়। বেদের কয়েকটি অংশ আবৃত্তি করে ছাগবলি দিলেই কাজটা নিষ্পাপ হয়, মীমাংসার এই ধারণা থেকেও ছাত্রদের শিক্ষণীয় কিছু নেই। ন্যায়শাস্ত্রও এর থেকে উন্নত নয়। বিশ্বের তাবৎ বস্তুর শ্রেণীভাগ, আত্মার সঙ্গে দেহের, দেহের সঙ্গে আত্মার, চোখের সঙ্গে কানের কাল্পনিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

একটি অনুচ্ছেদ অংশত উদ্ধৃত হল : 'If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sangscrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British Legislature.'

বেকনের Advancement of Learning যে বস্তুবাদী ভাবধারার জনক, রামমোহন তারই অনুবর্তন চেয়েছেন। এতকাল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা এ্যারিস্ট-টলীয় ন্যায় অনুযায়ী আরোহ পদ্ধতি মেনে চলতেন। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের আলোকে বেকন শুরু করলেন অবরোহ পদ্ধতি —বিশেষ থেকে সামান্যে উত্তরণ। তার মধ্যবর্তী স্তরে নিরীক্ষা, অবিরোধী অভিজ্ঞতা ইত্যাদির দ্বারা অধীত বিদ্যাকে যাচাই করা। হাইপথিসিস হয়ে উঠল কার্যকারণসম্মত 'অনুমান'। রামমোহনও বেকনীয় পন্থায় যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রকে যাচাই করেছেন। যেমন : (১) 'পিতা-পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথাকরণ অতি অযোগ্য হয়'—রামমোহনের খণ্ডন —পশুরা সর্বদা স্ববর্গের ক্রিয়া অনুসরণ করে, মানুষ করে না! সে জন্যই বৈষ্ণবের বংশে শাক্ত, শাক্তের বংশে বৈষ্ণব হতে পারে। আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের পায়ে মোজা, গায়ে জামা ছিল, পরে তা ছিল না। যবনকে শাস্ত্র পাঠ করানো, যবনের দাসত্ব করাও স্ববর্গ অনুমোদিত নয়, অথচ তাঁরা করেছেন। (২) 'ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না। অতএব ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের কিরূপে হইতে পারে?' এর খণ্ডন —নারদ জনক সনৎকুমার শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী রূপে স্বীকৃত; এঁরা অগ্নিকে অগ্নি, জলকে জলই বলেছেন, রাজকর্ম গার্হস্থ্য কর্ম করেছেন, শিষ্যদের জ্ঞান বিতরণ করেছেন।

রামমোহন রায় আধুনিক শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে নিজে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা (১৮১৫-১৭) করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি রামমোহন-পন্থী যেমন শোরবোর্নের স্কুলের ছাত্র, তেমনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিরা অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলের ছাত্র ছিলেন। রামমোহন ডঃ. আলেকজাণ্ডার ডাফ-কে জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ ইনষ্টিটিউশনের জন্য বাড়ি ঠিক করে দেন। কিন্তু অধুনা বলা হচ্ছে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রসারে তাঁর উদ্যোগ ছিল খুবই সীমিত। হিন্দু কলেজের সঙ্গে তাঁর সংস্রবও না-কি সত্য নয়। হিন্দু কলেজের গঠনপর্বে রামমোহনের বিশেষ ভূমিকা স্বয়ং জন উড্রো ৫ই নভেম্বর, ১৮৬০ সালে উল্লেখ করেন বেথুন সোসাইটির অধিবেশনে [দ্রষ্টব্য : ১৮৬০-৬১ সালের সোসাইটি প্রসিডিংস, পৃ. ২১৭]। এ ছাড়া বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ইস্টের পত্রও (৮ই মে, ১৮১৬) দ্রষ্টব্য।

স্কুল বুক সোসাইটির (প্রতিষ্ঠা ১৮১৭) পক্ষ থেকে প্রথম ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ রচনার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করেন। ভাষার সামাজিক লক্ষণ দিয়ে গৌড়ীয় ব্যাকরণের আরম্ভ এবং বইয়ের মধ্যে বাংলা তদ্ভব পদ গঠনের বৈশিষ্ট্য বিশদ আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণের হাত থেকে বাংলা ব্যাকরণকে মুক্ত করবার এই প্রথম প্রয়াস।

তিনি টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের বৃত্তি দিয়ে প্রাচ্যবিদ্যার ধারাকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন; তারই পাশাপাশি বাংলাভাষা নিজস্ব ব্যাকরণ মেনে উন্নতির পথে চলবে এবং সরকারী উদ্যমে পরিচালিত শিক্ষাক্রমে দ্বিতীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান শেখানো হবে। কারণ তাতেও য়ুরোপের মতো অগ্রসর জাতির সমকক্ষ হওয়া সম্ভব।

ধর্ম-ভাবনা ও রামমোহন

রামমোহনের ধর্ম-ভাবনা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের অনুগামী ছিল না। আবার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ নামে যাকে প্রতিষ্ঠা দিলেন তার পরিকল্পনার সঙ্গেও রামমোহনের সংস্রব ছিল না। আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্ট ডীডে আছে—জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার অধিকার আছে; কারও কোনো ধর্মগ্রন্থ মানবার বাধ্যবাধকতা নেই। দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত আচার্যপ্রথা বা কেশবচন্দ্র সেনের প্রত্যাদেশবাদ রামমোহনের অনুমোদিত নয়। তিনি অবাধ আলোচনার জন্য একটি মিলনকেন্দ্র চেয়েছিলেন। রুশ গবেষক পায়েভস্কায়া রামমোহনকে হিন্দুধর্মসংস্কারক বলেছেন। অনেকের মতে, তাঁর কোনো ধর্মবিশ্বাসই ছিল না। এ সম্বন্ধে 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'-এর লেখক অক্ষয়কুমারের উক্তি: 'মানবকুলের হিতসাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা' এই মহার্ঘবোধক, পরম পবিত্র পারসিক বচনটি তিনি সতত আবৃত্তি করতেন। প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম মঙ্গলসাধনের বেন্থাম-দর্শনের সঙ্গে তাঁর ধর্মচিন্তার সাদৃশ্য গভীর। তাই বেন্থাম-পন্থী লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের বড় সহযোগী হয়েছিলেন এবং স্বদেশে ফিরে গিয়েও রামমোহনকে স্মরণ করেছেন।[১] হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টান ধর্মের একেশ্বরবাদকে

১॥ বেন্থাম রচনাবলীর দশম খণ্ডে ২৯২ পৃষ্ঠায় ডাণ্ডাসকে লেখা বেন্থামের চিঠি থেকে জানা যায়, বেন্থাম-শিষ্য গ্রোটের বাড়িতে বেন্থাম-পন্থীরা সমবেত হয়ে বেণ্টিঙ্ককে সম্বর্ধনা দেন—ভারতযাত্রার পূর্বাহ্ণে। সিল্ক বাকিংহাম ও বেন্থাম-পন্থী ছিলেন। বিলেতে পৌঁছানোমাত্র রামমোহনের নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন তাঁরাই করেছিলেন। এইসব ঘটনায় বোঝা যায়, রামমোহনের যুক্তিক্রমে বেণ্টিঙ্ক সমাজসংস্কারে সম্মত হন—এই ধারণাটিও ঠিক নয়। বেন্থাম-পন্থী প্রশাসকের অভিপ্রায় এবং রামমোহনের মনোভাবের মধ্যে নৈকট্য ছিল বলেই উভয়ের সংযোগ তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল।

ভিত্তি করে তিনি বিশ্বমানবমৈত্রীর উপযুক্ত যে ধর্মের কথা ভেবেছেন, আসলে তা তাঁর রাজনীতিবোধ। তবে উপাসনার মহৎ তাৎপর্য তিনি স্বীকার করতেন। এই জগৎ পরম করুণাময় মঙ্গলময়ের সৃষ্টি, তাঁর কাছে সকলেই সমান। অর্থাৎ ব্রহ্মার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে নানা জাতির উদ্ভবের ধারণায় তিনি অবিশ্বাসী। তাঁর ধর্মালোচনায় Revealation বা মহাপ্রকাশের কথা কোথাও নেই; বেদের অপৌরুষেয়তা মানা হয়নি। যেমন মুতাজিলা ও কাজরাইয়া সম্প্রদায়ের (খ্রীঃ. নবম শতক) ধর্মযাজকেরা বলতেন, ঈশ্বর স্রষ্টা, জগৎ সৃষ্টি, সুতরাং কোরাণও আপ্তবাক্য বা ধ্রুব সত্য নয়; জগতের মতোই পরিবর্তন সাপেক্ষ। তাঁরাও মহাপ্রকাশের অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী।

সাধারণভাবে দর্শনের গতি ধর্মের দিকে এবং ধর্মের পরিণতি রহস্যময় অজ্ঞতাবাদে। তাঁরা বিজ্ঞানকে 'অবিদ্যা' বলবেন। কিন্তু রামমোহনের ধর্মভাবনায় অজ্ঞেয় রহস্যতত্ত্ব নেই।

ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠ লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের উক্তি: 'ইয়ুরোপীয়েরা খৃস্টাব্দের ঊনবিংশ শতাব্দী বলিয়া মনের তেজে যে জ্ঞানোজ্জ্বলিত সময়ের মহিমা প্রকাশ করেন, এই সেই সময় নিষ্প্রয়োজন কেবল ভাষা শিক্ষা করাতে বাস্তবিক শিক্ষা মনে করা উপহাসের বিষয়। ...এই কারণেই রামমোহন রায় সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপনের পরিবর্তে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। ...যে সময়ে ভারতবর্ষ অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিলে হয় এবং যখন হিন্দু-সমাজে ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের নামোচ্চারণ মাত্রও ঘটিয়াছিল কিনা সন্দেহ, এই দেশে সেই অন্ধকারময় সময়ে বিজ্ঞান বিষয়ে ঐরূপ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ আশ্চর্যের বিষয়।' সে জন্যই ধর্মতত্ত্ব বা অধ্যাত্মতত্ত্ব তাঁর সম্বন্ধে প্রধান কথা কখনোই হতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজের আচার্যেরা বা ইউনিটারিয়ান পাদ্রীরা যাই বলুন।

কথাশেষ

পরিশেষে বলা যায়, সুস্থ বুদ্ধির চর্চাতেই রামমোহন মধ্যযুগীয় পরিমণ্ডলের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করেই তার সঙ্কীর্ণতা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই ভারতে প্রাচীন পণ্ডিত-মুন্সীদের শেষ ও নবযুগের প্রথম প্রতিনিধি। আমাদের তথাকথিত রেনেসাঁস রামমোহনের সুস্থচিন্তার অনুগামী হলে পুনরুত্থানবাদের পঙ্কে অমেয় সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটত না।

বৃটিশ শাসন ও রামমোহন রায়

রামমোহন রায়ের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যেমন একদিকে প্রশস্তি ও স্তুতিবাদ করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কোনো কোনো আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা হয়েছে যে, তিনি বৃটিশ-ভক্ত, জমিদারিতে আসক্ত এবং রায়তশত্রু নীলকরদের মিত্র ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর স্তুতিকারেরা এস্টাব্লিশমেণ্টের লোক। কেউ রাষ্ট্রের, কেউ ধর্মের, কেউ বা রাজনীতির দিক থেকে ওপরতলার প্রতিনিধি। তাঁরা প্রশংসার আবেগে কেউ বলেন, রামমোহনে যে রেনেসাঁসের আরম্ভ, রামকৃষ্ণে তার পরিণতি; কারও গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত—রবীন্দ্রনাথ ও জহরলাল নেহেরু রামমোহনের দুই যথার্থ উত্তরসাধক (এই গবেষক না-কি রামমোহন চর্চার জন্যই জনৈক সাহেব অধ্যাপকের সহযোগী হয়ে কয়েক বছর য়ুরোপে কাটিয়েছেন)। চাকরিতে উন্নতি এবং শাসক-গোষ্ঠীর কাছে বাহবা পাবার জন্যই যে তাঁরা এ সব বলেছেন, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আলোচকেরা ব্যক্তিগতভাবে পদোন্নতিকামী নন, কিন্তু উত্তরাধিকারকে তার যথার্থ ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে না দেখতে পারায় মারাত্মক বিভ্রান্ত। নতুবা জনসংঘের ডঃ. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং কৃষক বিপ্লবের দর্শনে বিশ্বাসী সুপ্রকাশ রায়ের সিদ্ধান্ত অভিন্ন হবে কেন? রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দেশে যে নবজাগরণ হল, রামমোহনেই তার সূচনা। অর্থাৎ বৃটিশের সংস্পর্শেই রামমোহন নামক যুক্তিবাদী স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। অবশ্য ব্যক্তি হিসেবে তিনি লোক সুবিধের নন; মা-র সঙ্গে, বৌদির সঙ্গে মামলা করেছেন, দাদা জেলে গেলেও নীরব থেকেছেন, ছেলেমানুষ ভাইপোকে মামলায় সর্বস্বান্ত করেছেন। শ্রীযুক্ত খুশবন্ত সিং আবার ফলাও করে এইসব লিখে রামমোহনকে (যমুনা নাগের 'Raja Rammohan Roy' গ্রন্থে এগুলির কিছু জবাব আছে) য়ুরোপীয় পাঠকদের কাছে হাজির করেছেন: সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, চতুর্থ জর্জকে লেখা চিঠিতে বৃটিশ শাসনের প্রতি যে ভক্তির ঘটা এবং বৃটিশ নাগরিকদের বেশি সংখ্যায় এ দেশে বসতিস্থাপনের পক্ষে ওকালতি, পার্লামেণ্টারী শাসনের প্রতি যে অন্ধ মোহ দেখা যায়, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি বণিক বুর্জোয়া। তেজারতি কারবার, আইন পরামর্শ দিয়ে রোজগার,

ব্যবসায়ে বিনিয়োগ, দেওয়ানের চাকরি, নতুন জমিদারি কেনা —সবই বৃটিশ শাসক-গোষ্ঠীর সহায়তায় হয়েছিল। কোম্পানীর পরিচালকবর্গের অসম্মতি সত্ত্বেও কোম্পানীর দেওয়ান পদের জন্য তাঁর আবেদনপত্র কি বৃটিশের নির্লজ্জ চাটুকারিতা নয় ?

ভারতের তথা বাঙলার ধনী জমিদারদের পরবর্তী রাজনৈতিক ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে এঁরা কেউ কেউ তার জন্য রামমোহনকে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ তাঁদের অভিমত পরবর্তীকালের কংগ্রেসের রায়ত-বিরোধী জমিদার-ঘেঁষা ইংরেজ তোষক রাজনীতি রামমোহন থেকেই শুরু হয়েছে। জনৈক 'মার্কসবাদী' অধ্যাপকও জ্বালাময়ী ভাষায় এই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

সুতরাং বৃটিশ সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাব যাচিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। মনে রাখতে হবে, এ দেশে ইংরেজ শাসনের ফল একই সঙ্গে ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক। অভাবাত্মক এই জন্য যে, ইংরেজরা এ দেশের চিরন্তন গ্রামীণ জীবন প্রবাহ, তার অর্থনীতি, কৃষিব্যবস্থা প্রভৃতি চুরমার করে দিয়েছে, অথচ পরিবর্তে নতুন সমাজব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গড়ে উঠতে দেয়নি। কার্ল মার্কসের কথায় : 'England has broken down the entire Frame work of Indian Society. Without any symptoms of reconstitution yet appearing. This loss of his old world, with no gain of a new one, imparts a particular kind of melancholy to the Present misery of the Hindu and Separates Hindustan ruled by Britain, from all its ancient tradition, and From the whole of its past history.' ইংরেজ আগন্তুকরাই প্রথম এ দেশে হাতে চালানো তাঁত নষ্ট করেছে, চরকা-কেন্দ্রিক অর্থনীতি ধ্বংস করেছে। য়ুরোপের বাজার থেকে ইংরেজরা ভারতের তুলো পণ্যকে বিতাড়িত করল ; শেষ পর্যন্ত তুলো-প্রসূতি ভারতকেই য়ুরোপ থেকে তুলো আমদানি করতে হল। ১৮১৮ থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে গ্রেট বৃটেন থেকে এ ধরনের আমদানি ১ থেকে ৫,২০০ বেড়েছে। ১৮২৪ সালে মিহি মিলের কাপড় বৃটেন থেকে ভারতে এসেছে বড়জোর ১,০০০,০০০ গজ ; কিন্তু ১৮৩৭ সালে ৬৪,০০০,০০০ গজ ছাড়িয়ে যায়। সেই সঙ্গে লক্ষণীয় যে, ঢাকার মসলিন উৎপাদক তাঁতীর সংখ্যা কমতে লাগল। ১,৫০,০০০ থেকে কমে ১৮৩৭ সালেই দাঁড়াল ২০,০০০ সংখ্যায়। কার্ল মার্কসের কথায় 'British steam and science uprooted, over the whole surface of Hindustan, the union between agriculture and manufacturing industry.' এ বিষয়ে ১৮১২ সালেই বৃটেনের হাউস অব কমন্সে বিশদ বিবরণী পেশ করা হয়েছিল। একজন লাটসাহেব জর্জ ক্যাম্বেলের 'Modern India : A sketch of the system of Civil Government' (1862) বইতেই এই বিবরণী স্বীকৃত হয়েছে (দ্রষ্টব্য : 'স্যর উইলিয়ম গ্রে ও স্যর জর্জ ক্যাম্বেল,' বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ ১২৮১)।

বৃটিশ শাসনের ভাবাত্মক দিকগুলি কি কি? কার্ল মার্কসের 'ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' নিবন্ধ অনুসরণে সেগুলি সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা যাক—

১॥ রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য —বৃটিশ অস্ত্রের আঘাতে এই ঐক্যের প্রতিষ্ঠা। এ ধরনের ঐক্য মোগল আমলে ছিল না। নির্মমভাবে শক্তির দ্বারা রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে যে ঐক্যের বোধ জাগছে, নবজাগরণের সেটাই প্রথম শর্ত।

২॥ সেই ঐক্যকে শক্তিশালী ও স্থায়ী রূপ দেবে টেলিগ্রাফ —দ্রুত বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেশের সর্বত্র একই চেতনা সঞ্চারের পক্ষে এটি আশু প্রয়োজনীয়।

৩॥ নিজের স্বার্থেই ইংরেজ মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, সাময়িকপত্র প্রকাশের পথ সহজ করে দিয়েছে। সমগ্র এশীয় সমাজেই ফ্রিপ্রেস বৃটিশের অভিনব দান —ভারতবর্ষের জাতীয় সংগঠনের পক্ষে যার মূল্য অপরিসীম।

৪॥ বাষ্পীয় যান প্রবর্তনে য়ুরোপের বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হল। ধনতান্ত্রিক শোষণের চাকা জনসাধারণের জীবনীশক্তিকেই পিষ্ট করে দিলে। তবু এই সংযোগের ফলে পণ্য আসা-যাওয়ার সুবিধে হল; বিশ্বের বিজ্ঞানের বৃহৎ জগৎও খুলে গেল।

৫॥ রেলপথ প্রতিষ্ঠার ফলে আধুনিক শিল্পের উদ্ভব হল। তার ফলে আবার পুরুষানুক্রমিক শ্রমের ধারা আমূল বদলে গেল। শ্রমবিভাগ ভিত্তিতেই প্রাচীন বর্ণভেদ, জাতিভেদ গড়ে উঠেছিল। এখন ঐতিহাসিক কারণেই সেগুলির অপরিহার্যতা লোপ পেল। সে-দিক থেকেও ভারতীয় সমাজে অগ্রগতির প্রধান বাধাগুলি অপসারিত হল।

৬॥ ভারতের ধনী স্বচ্ছল পরিবারের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে নতুন শ্রেণীর উত্থান— 'a fresh class is springing up, endowed with the requirements to Government and imbued with European science' এই নব্য শ্রেণী যেমন বৃটিশ শাসনের প্রতি বিশ্বস্ত, অনুগত; তেমনি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানেও অভিজ্ঞ —এই সূত্রেই নতুন চেতনার জাগরণ প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘাত এবং আনুগত্যের মধ্যেও বিরোধের মাত্রাভেদ দেখা দিতে লাগল।

এই সর্বাত্মক আলোড়নকেই কার্ল মার্কস বলেছেন, 'Only Social Revolution ever heard of in Asia.'

রামমোহন রায় বৃটিশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে দু'ভাবে দেখেছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল বৃটিশ শাসন পূর্বতন মোগল শাসনব্যবস্থা থেকে উন্নততর; মধ্য-যুগীয় কুসংস্কার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য য়ুরোপীয় জাতির মধ্যে অগ্রগণ্য বৃটিশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সহায়ক হবে। আইন ও শৃঙ্খলা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

তাতে নীচুতলার মানুষের প্রতি ওপরতলার মানুষের সামাজিক নিপীড়ন কমে যাবে। গণতান্ত্রিক আইনের আওতায় ব্যক্তির স্বাধিকারবোধের বিকাশ ঘটবে। গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানচর্চায় পরিশীলিত মনে আপনা থেকেই সামাজিক ও ধর্মীয় লোকাচারের শেকড় আলগা হয়ে আসবে। 'Social Revolution' বা সামাজিক কালান্তরকেই রামমোহন বড় করে দেখেছেন।

কিন্তু এ দেশে যাঁরা বৃটিশ শাসনের প্রতিভূ হয়ে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে কোনো দিনই তিনি অনুরাগী ভক্তের সম্পর্ক রক্ষা করেননি। যে-সব ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে রামমোহনের অন্তরঙ্গতা ছিল, তাঁরা অনেকেই ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সের উদারনীতিক সদস্যদের ভাবধারার অংশীদার এবং বেন্থাম-মিলের শিষ্য। বৃটিশ শাসনের ইতিহাসচর্চায় বেন্থাম-পন্থীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে বেন্টিঙ্ক পর্যন্ত গভর্নরদের সেই অধ্যাপক বন্ধু এক পর্যায়ে ফেলেছেন। কিন্তু হেস্টিংস কি বেন্টিঙ্কের মতো বলতে পারতেন: 'It would ill become me in my position to conceal the unpleasant fact that, during my Course, I have seen too much on this Conqueror's spirit of the pride of domination, of the abuse of power, and of the too general oppossion of the strong over the weak, to be able to pronounce that this wished for time is arrived.' এ রূপ মনোভাবের জন্যই মেটকাফ বা রীপনকে নির্দিষ্ট কালের পূর্বেই দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কোম্পানীর বৃটিশ শাসকদের কাছে রামমোহনের দাবি ছিল (দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাষায়) 'To make all in heart and mind in hopes and aspirations one with Englishmen' —পার্লামেন্টের শাসনে ইংরেজ প্রজা যে-সব গণতান্ত্রিক অধিকার পায় সেগুলি ভারতীয়দেরও প্রাপ্য। এই ছিল রামমোহনের বক্তব্য। কি কারণে পরাধীন উপনিবেশের লোক বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি বিদেশী ধনবাদী শাসকগোষ্ঠীর কাছে পেতে পারেন না —তাঁর আমলে সেগুলি সুবিদিত ছিল না। সত্য কথা বলতে কি, ইংলণ্ডের সাধারণ মানুষও প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ অধিকারগুলি ষোল আনা ভোগ করতে পেত না। তবে নিজের দেশে একটু রেখে ঢেকে এবং উপনিবেশে সেই গণতান্ত্রিক শাসনের ভণ্ডামি নগ্নভাবে প্রকাশ পেত। ('The profound hypocrisy and inherent barbarism of bourgeois civilisation lies unveiled before our eyes, turning from its home, where it assumes respectable forms to the Colonies, where it goes naked.'—Marx)

কিন্তু রামমোহনের কালে পার্লামেণ্টারি শাসনব্যবস্থার অন্তর্লীন 'ধূমাঙ্কিত কালি' স্পষ্ট দেখা যায়নি। তাঁর বা তাঁর অনুবর্তীদের কাছে সমস্যাটা ছিল:

(১) মোগল শাসনের পুনঃপ্রবর্তন অথবা বৃটিশ শাসন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন অথবা সরাসরি পার্লামেণ্টের শাসন।

কোম্পানীর শাসনের চেয়ে পার্লামেণ্টের শাসনকেই রামমোহন এবং তাঁর অনুগামীরা ভালো মনে করেছেন। তাই চতুর্থ জর্জের পরিষদের কাছে আবেদন, পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে বিবরণী দাখিল করা হয়েছে। এ দেশের বৃটিশ শাসকদের (কোম্পানী আমলের রাজপুরুষ) বিরুদ্ধে অভিযোগও আছে। তখনকার স্থপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ফ্রান্সিস ম্যাকনাটেনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ সম্বন্ধে রামমোহনের বক্তব্য —পার্লামেণ্ট ঠিক করেছেন, কাউন্সিলে পাশ হবার পর কোনো বিধিকে আইনে পরিণত করার আগে কুড়িদিন সময় থাকবে, যার মধ্যে বিচারপতিরা সাধারণের অস্থবিধা অভিযোগ ইত্যাদি শুনবেন এবং সেই অনুযায়ী সংশোধনের পরই আইন হিসেবে রেজিস্ট্রি হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে (সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে) তা হয়নি। স্পষ্টতই ম্যাক্‌নাটেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ: 'The judges enter into previous contact with the local Government, and thus preclude the possibility of any effectual representation from your faithful subjects who have no intimation of what, is meditated till it be finally resolved upon.'

আবেদনের ৩০ নং অনুচ্ছেদে আছে, 'A Government conscious of rectitude of intention can not be afraid of public scrutiny by means of the press'; কারণ জনসাধারণের মনে ভুল ধারণা থাকলে সরকার পক্ষের বক্তব্যও সরকার সংবাদপত্রে বলতে পারবেন। এর সঙ্গে তুলনীয় স্থপ্রীম কোর্টের আবেদনের একটি অংশ: 'Every good ruler, who is convinced of the imperfection of human nature must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast empire'।

যখন বেলি তাঁর মিনিটে লিখছেন, যে-ধরনের ব্যবস্থা আমরা এ দেশে করেছি প্রেসের স্বাধীনতা ব্যাপারটা তার সঙ্গে Consistent নয়, যদিও 'The liberty of the press, however, essential to the nature of a free state'; তখনই স্থপ্রীম কোর্টের কাছে রামমোহন প্রমুখ জানিয়েছেন সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রশাসনের একমাত্র প্রভাবশীল মাধ্যম ('The only effectual means that can be employed)'।

৩৪ নং অনুচ্ছেদে আরও স্পষ্ট বোঝা যায়, বৃটিশ তোষণনীতি বা 'বিশ্বস্ত সহযোগিতার নীতি' তিনি কখনোই গ্রহণ করেননি। 'যেহেতু ভারত একটি উপনিবেশ বা দূরস্থিত অধীন দেশ, স্থতরাং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার নিরাপদ নয়' —'তাহলে তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে তারা চিরকাল অত্যাচারিত হতে থাকবে, যতদিন বৃটিশ শাসন থাকবে ততদিন অবস্থার উন্নতির আশা নেই।'

'এ কথা সবাই জানেন যে, স্বৈরাচারী সরকার স্বভাবতই মত প্রকাশের স্বাধীনতা দমন করতে চায় (৩৬ নং অনুচ্ছেদ) যাতে তাদের নিপীড়নের ঘটনাগুলি না প্রকাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু বহুকাল ধরে ভোগ-করে আসা সুযোগ-সুবিধা অপহরণ, দেশের অবস্থার দিক থেকে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত এবং খেয়াল-খুশী মতো বিবিধ নিষেধাজ্ঞা আরোপ (উদ্দেশ্য যাই হোক) সত্য গোপন, দুর্নীতি সংরক্ষণ এবং অত্যাচারকে উৎসাহ দেবার জন্যই পরিকল্পিত (৩৮ নং অনুচ্ছেদ) —এ সবের বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণ সবিনয়ে প্রতিবাদ জানাতে চায়।' ইংরেজীতে 'against the injustice of robbing them', 'Calculated to suppress truth, protect abuses and encourage oppression.' শব্দ চয়নের দৃঢ়তা ১৮২৩ সালে শুধু নয়, ১৯২৬ সালেও কংগ্রেসের কোনো প্রস্তাবে দেখা যায় না। এখানকার ইংরেজ প্রশাসকরা অবুঝ, অযোগ্য, 'ক্ষমতার অপব্যবহারকারী' এ কথাও রামমোহন বলেছেন।

ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের জন্য তিনি মহান্ বিশ্বস্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। (Final Appeal to the Christian public) কারণ ইংরেজ জাতি কেবল নিজেই 'Civil and political Liberty' ভোগ করে না, অন্য জাতিকেও সেই সুযোগ দেয়। বলা বাহুল্য, তাঁর এই ধারণা যথার্থ নয়। কিন্তু ইংরেজ শাসনের প্রশংসার পেছনে কি মনোভাব কার্যকর ছিল বোঝা যায়।

কতদিন বৃটিশ এ দেশ শাসন করবে? চিরকাল ভারতবর্ষ রাজনৈতিকভাবে পরাধীন থাকবে? রামমোহন লিখছেন: ধরো একশ বছর ভারতবর্ষ য়ুরোপের বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার সাহচর্য পেল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা লাভ করল, তার পরেও কি তারা অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জানাবে না? (ক্রফোর্ডকে লেখা চিঠি ১৮ই আগস্ট, ১৮২৮)। আর্নটও বলেছেন: তিনি (রামমোহন) সর্বদা এই মত পোষণ করতেন, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বৃটিশ শাসন এ দেশে থাকা প্রয়োজন। এর অর্থ খুবই স্পষ্ট যে, বৃটিশ শাসনের মাধ্যমে য়ুরোপীয় বিজ্ঞান এবং গণতন্ত্র যখন আমাদের মনোজগতের আবহাওয়াকে আমূল পাল্টে দেবে তারপর আর বিদেশী শাসন দরকার হবে না। যিনি বিদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে উৎসাহী, দাসপ্রথার অবসানে উল্লসিত, তিনি কি স্বদেশের জন্য চিরকাল পরশাসন চাইতে পারেন? যিনি বলেন, 'অন্যায়ের শত্রুরা, স্বাধীনতার শত্রুরা পরাভূত হবেই' —তিনি কখনোই উপনিবেশবাদ সমর্থন করতে পারেন না। কলোনাইজেশন সমর্থনের অর্থ ছিল তাঁর কাছে উন্নত কৃষিবিজ্ঞানী, শিক্ষক, গণতান্ত্রিক আদর্শে আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যলাভ। এ কথা স্বীকার করা উচিত যে, ভারতবাসীর মঙ্গল চিন্তা সার করে বিদেশীরা কখনোই দলে দলে এ দেশে আসবে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় জানা যায়, কলোনাইজেশনের বাইরের ছদ্মবেশ সভ্যতার আলো ছড়ানো, আসল লক্ষ্য অর্থনৈতিক শোষণ।

কিন্তু রামমোহনের কালে উপনিবেশবাদ-বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়নি। উপনিবেশ যে আসলে ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই বিশেষ কৌশল—এ সত্য তখনও ধরা পড়েনি। অবাধ বাণিজ্য বনাম একচেটিয়া ব্যবসায়ের দ্বন্দ্বে রামমোহন যখন অবাধ বাণিজ্যনীতি সমর্থন করেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরোধিতা করেন, তখনও তাঁর মনে ছিল অর্থনীতির মূল কথা —প্রতিযোগিতার ফলে গরীব কৃষকদের ওপর অত্যাচার কম হবে, কৃষিমজুর ভালো মজুরী পাবে, পণ্যের দাম বাড়বে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার আমলেই যখন কৃষিমজুররা মাসিক চার টাকা মাইনে পাচ্ছে (যা পূর্বে অকল্পনীয় ছিল), তখন ফ্রি ট্রেডের আমলে নিশ্চয়ই রায়তদের অবস্থার আরও উন্নতি হবে। ১৮৩৪ সালে কোম্পানী সনদ সংশোধনের পরেই নীলকররা এ দেশে জমি কিনতে পারত, ধান-পাটের জমিকেও নীলের জন্য চিহ্নিত করত এবং রায়তদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীল চাষে বাধা সৃষ্টি করত। সি. ডব্লু. ওয়াইনকে লেখা চিঠি (১৬ই এপ্রিল, ১৮৩২) থেকে জানা যায় রামমোহন পার্লামেণ্টের সদস্য হতে চেয়েছিলেন। 'Not from any ambition to assume so ardous an office but from a desire to pave the way for his Countrymen for which object R. R. might for a few weeks, undertake the task.'

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাবও মোটেই বৃটিশ সহযোগী নয়। ১৯২০ সালে জমিদারদের তরফ থেকে সরকারকে যে পত্র দেওয়া হয়, তাতে আছে: বাঙলা এবং ভারতের সর্বত্র বেশির ভাগ লোকই কৃষিজীবী, শতকরা ৭৭ জনই কৃষক। আবার এই শতকরা ৭৭ জনের মধ্যে ৭০ জন এত গরীব যে, মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২/৪ টাকা মাত্র; 'they go to bed everyday without a square meal.' জমিদাররা এবং মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড চেয়েছিলেন, রায়তদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসংস্কার। জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা তখন কৃষকদের সমস্যা নিয়ে কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ না করলেও জমিদার গোষ্ঠীরই একজন প্রমথ চৌধুরী এই প্রস্তাবের অন্তঃসারহীনতা দেখিয়েছেন। 'এ বিষয়ে কথা তুললে হস্তান্তরযোগ্য রায়তীস্বত্ব, মৌরসী-মোকররী অধিকার ইত্যাদি তাঁরা (ব্যবস্থাপক সভার রাজনীতিকেরা) যে-রকম অসোয়াস্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাতে মনে হয় তাঁরা একটু উভয়সঙ্কটে পড়েছেন। প্রজার উপকার করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রজাকে কোনো অধিকার দিতে রাজী নন।' (রায়তের কথা, পৃঃ ৬)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারের 'স্বত্ব' চিরস্থায়ী হল, তারা রায়তদের খাজনা-বৃদ্ধির অবাধ অধিকার পেল, দাখিল-খারিজের মাধ্যমে উপরি-আয় বাড়ল। কেবল দাখিল-খারিজ সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য: দাখিল-খারিজ প্রার্থীদের জমিদারের কাছারিতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নড়ি ছিঁড়ে যায়। জোত-খরিদ্দারের পক্ষে জমিদারের সেরেস্তায় নাম পত্তন করার চাইতে বিয়ে করা কম

কথায় হয়, যদিচ, বিয়ের জন্য লাখ কথা চাই। এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব গোমস্তা জমানবিশ সুমারন বিশ পাইক বরকন্দাজ যে পারে সেই মোড় দিয়ে দু-পয়সা আদায় করে নেয়। সুতরাং তার এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে আশা করি বলশেভিজম্-এর পরিচয় দেওয়া হয় না' (রায়তের কথা, পৃঃ. ১৭)।

১৯২৬ সালের গৌহাটি কংগ্রেসে প্রস্তাব ওঠে, জমিদার ও ধনিকের সঙ্গে যখন কৃষক ও শ্রমিকের বিরোধ বাধবে তখন কংগ্রেসকে দাঁড়াতে হবে কৃষক-শ্রমিকের পক্ষে। পণ্ডিত মতিলাল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাই কৃষক ও শ্রমিকস্বার্থকে যাঁরা দেশের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য মনে করেন, তাঁরা আলাদা দল 'পেজাণ্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি' গঠন করেন। তাঁরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন, 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অত্যন্ত বেশি মাত্রায় জমিদার-গণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে আছে। কংগ্রেস নেতৃগণের অধিকাংশই জমিদার। গৌহাটি কংগ্রেসে নেতৃগণ যে-রূপ দৃঢ়তার সঙ্গে জমিদারের পক্ষ সমর্থন করেছেন তাতে বোঝা যায় যে, কংগ্রেস আন্দোলন সর্বতোভাবে জমিদারের দ্বারা চালিত না হলেও জমিদারদেরই জন্যে চালিত হয়ে থাকে।' (মুজফফর আহ্‌মদ, গণবাণী, ২১শে এপ্রিল, ১৯২৭)।

১৯২৬-২৭ সালের যখন রায়তের অধিকার প্রসঙ্গে জাতীয় নেতৃত্বের এই অবস্থা, তখন দেখা যাক রামমোহন কি বলেছিলেন ১৮৩১ সালে। তাহলেই বোঝা যাবে কেন প্রমথ চৌধুরী এবং ১৯২০-২৬ সালের কথা আনা হল। নিছক ধান ভানতে শিবের গীত গাইবার জন্য নয়। ১৯শে আগস্ট, ১৮৩১ রামমোহন পার্লামেণ্টকে প্রস্তাব দেন: (১) জমিদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উপকৃত। কিন্তু কৃষিকর্মীদের এমনই করুণ অবস্থা যে, তাদের কথা বলতে গেলেই আমি গভীর বেদনায় অভিভূত হয়ে পড়ি। (২) রায়তের খাজনা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা থাকা দরকার। (৩) রায়তের খাজনা হ্রাসের জন্য দরকার হলে জমিদারের রাজস্ব হ্রাস। (৪) রায়তদের আত্মরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে দেওয়া হয়েছিল, আইনে তার কিছুই নেই। (৫) জমিদারকে খাজনা বাড়াতে, অনাবাদী জমিকে আবাদী রূপে বিলি করতে এবং খাজনার দায়ে একতরফা ডিক্রি করে নিতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। এতে রায়তদের সমূহ সর্বনাশ। (৬) আইনের আশ্রয় রায়তদের পক্ষে দুর্লভ, কারণ কোর্ট-কাছারী গ্রাম থেকে দূরে, বিচার-পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল। খাজনা বৃদ্ধির ন্যায্যতা বিচারের এক্তিয়ার আদালতের নেই। জমিদার এবং তার আমলাদের পক্ষে সহজেই বিচারবিভাগকে প্রভাবিত করা সম্ভব। (৭) যাঁরা কালেক্টর তাঁরাই ম্যাজিস্ট্রেট অর্থাৎ অভিযোক্তা ও বিচারক অভিন্ন ব্যক্তি —এ সব ক্ষেত্রে সুবিচারের আশা কম। কালেক্টরদের বেতনও ১০০০/১৫০০ থেকে অনেক কমানো উচিত।

বাঙলাদেশের নানা অঞ্চলে রামমোহনের জমিদারী ছিল। সেই সূত্রেই বৃটিশ শাসনে ইংরেজ রাজপুরুষ এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে জমিদার কিভাবে আবওয়াব বখশিস নজরানী দাখিল খারিজ ইত্যাদিতে গ্রামের গরীবদের শোষণ করত, তার নগ্ন স্বরূপকে চিনেছিলেন। যেমন চিনেছিলেন প্রমথ চৌধুরী। এ বিষয়ে তিনি রায়তের কথা-য় বারংবার রামমোহনের নামোল্লেখ করেছেন। জমিদার-শ্রেণী সাধারণভাবে বৃটিশ শাসনেরই অনুগত ধ্বজাবাহী। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে—রামমোহন রায় তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাঁর পথ অনুসরণেই একজন জমিদার জমিদারী-মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে লিখতে পারেন: 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরেজ-রাজ যখন বিদেশী রাজ, তখন দেশে এমন একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরেজ-রাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপদে বিপদে এই দল ইংরেজ-রাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।'

বৃটিশ শাসনে এ দেশের বিচারবিভাগেও অনেক গলদ ছিল। রামমোহনই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এ বিষয়ে সমালোচনা করেন। জুরি প্রথার দেশীবিদেশী প্রজাদের সমান অধিকার দাবি করেন। আইনের পর্যায়করণ (Codification) এবং প্রশাসন ও বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য (Separation of powers) দাবি করেন।

জেরোমি বেন্থাম, রবার্ট ওয়েন, বিচারপতি হ্যারিংটন প্রমুখ উদারনীতিক ইংরেজদের রচনা পড়ে (সিঙ্ক বাকিংহাম, উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এবং হাইড ইস্টও বেন্থামপন্থী) এবং প্রত্যক্ষ সংস্রবে এসে তাঁর মনে হয়েছিল বৃটিশ ডেমোক্রাসি মানুষের উদ্ভাবিত সবচেয়ে উন্নত শাসনব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' প্রবন্ধাবলী থেকে জানা যায়, গোটা উনিশ শতকেই শিক্ষিত বাঙালীর মনে বৃটিশ ডেমোক্রাসি এই আশা ভরসা জাগিয়েছিল। রামমোহন এখানে যুগের সীমার দ্বারাই বিচার্য। তিনি তো স্পষ্টই বলেছেন, ভারতের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক স্থায়ী হতে পারে, কিন্তু একটি শর্ত: 'Provided only that the latter Country (ভারত) be Governed in a liberal manner, by means of parliamentary Superintendence and such other legislative checks in this Country as may be devised and established.'

সাম্রাজ্যবাদ, ধনবাদ, উপনিবেশবাদ প্রভৃতির মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক আছে, এখন তা সুবিদিত। রামমোহনের কালে তা ছিল না। রামমোহনের বুর্জোয়া গণতন্ত্রে মোহ ছিল। এ কথা ঐতিহাসিক কারণেই যথার্থ, মোহ রূপে সত্য নয়। পার্লামেণ্টের রিফর্ম বিল সম্পর্কে রামমোহনের অতিশয় প্রত্যাশা সেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরই অঙ্গ। তিনি মনে করেছিলেন রিফর্ম বিলের পক্ষ ও প্রতিপক্ষের লড়াই আসলে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, যথার্থের সঙ্গে অযথার্থের লড়াই। মার্কসীয়-

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে রিফর্ম বিল হচ্ছে ভূম্যধিকারী আভিজাত্যের এক-চেটিয়া অধিকার বনাম শিল্প-বুর্জোয়াদের ক্ষমতার লড়াই। 'The proletariat and the petty bourgeoisie, most prominent in the struggle for the reform, were duped by the liberal bourgeoisie and did not secure electoral rights.' উইলিয়ম র‍্যাথবোন-কে লেখা রামমোহনের চিঠিতে এই বিলের দ্বারা পার্লামেণ্টারী রাজনীতিতে নবপর্যায়ের সূচনায় তিনি উল্লাস ও আশা প্রকাশ করেছেন।

রিফর্ম বিল সম্পর্কে তাঁর আশাভঙ্গ ঘটতেও বিলম্ব হয়নি। উড্‌ফোর্ডকে রামমোহন জানিয়েছিলেন (২২শে আগস্ট, ১৮৩৩) 'The reformed parliament has disappointed the people of England.'

বৃটিশ শাসন সম্পর্কে রামমোহনের শেষ কথা ছিল ঐই যে, অত্যাচারের ভিত্তিতে কোনো শাসনব্যবস্থা স্থায়ী হতে পারে না ; এ দেশের ইংরেজ রাজপুরুষরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে না ; এবং ইংরেজের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ইত্যাদির দ্বারা ভারতবাসী মধ্যযুগীয় কুসংস্কার কাটিয়ে উঠলেই India for Indians বা স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

মধুসূদন বিষয়ে কয়েকটি জিজ্ঞাসা

বাংলা সাহিত্যের এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে মধুসূদনের অভ্যুদয়, কিংবা বলা যায়, মধুসূদনের কাব্যচর্চায় যে-যুগসন্ধিলক্ষণের প্রথম সারস্বত প্রকাশ, তাকে কোনোমতেই এড়িয়ে যাওয়া চলে না। তাই মধুসূদন আজও আধুনিক বাংলা কাব্যে সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। যাঁরা মধুসূদনের খ্রীস্টানধর্ম ও যুরোপীয় আচার--ব্যবহারে ক্ষুব্ধ তাঁরাও বলেছেন: 'হা মাইকেল, তোমার অন্ত্যেষ্টির সময় তোমার নিকটে গিয়া তোমার আত্মীয়গণ রোদন করিতে পারিল না। তুমি পরের মতো বিদেশী ম্লেচ্ছগণের হস্তে মস্তক প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছ! তুমি কবরে যাইবার সময় বিজাতীয়েরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিল, আমরা সজল নয়নে দূর হইতেই কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, নিকটে যাইবার ইচ্ছা করিলেও যাইতে পারিলাম না! হিন্দুধর্মের পারে গমন করিয়া তুমি যেন সমুদ্র-পারবর্তী জনের ন্যায় বহুদূরবর্তী হইয়া পড়িলে!'[১] জাত্যন্তর ও সমাজচ্যুতির ভয়েই রক্ষণশীলরা কবি মধুসূদনের পক্ষে সোচ্চার হতে পারেননি; তাঁর কবিপ্রতিভার মহত্ত্ব তাঁদের নীরব স্বীকৃতি পেয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে বৃত্রসংহার নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। গ্রন্থসমালোচনা ছাড়াও 'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'[২] নামে দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে মধুসূদনের কোনো কাব্যই আলোচিত হয়নি। সঞ্জীব-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে এবিষয়ে আক্ষেপ করে লিখেছেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।[৩] মধুসূদনের মৃত্যুতে অবশ্য আবেগময় ভাষায় বঙ্কিম লিখেছিলেন: 'পতাকা উড়াইয়া দাও। তাহাতে নাম লেখ —শ্রীমধুসূদন।' কিন্তু এর পরেও তিনি কাব্যালোচনা করেননি। অবশ্য ক্যালকাটা রিভ্যুতে প্রকাশিত প্রবন্ধে মধুসূদনের কাব্যনাটক আলোচনা আছে। অন্যদিকে, হেমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নব্য সাহিত্যের রসিকেরা তাঁর যথার্থ প্রাপ্য স্বীকারে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। ১৯৬৪ সালে মেঘনাদ বধের শতবর্ষপূর্তি হবার পরেও আলোচনা-বিতর্কের শেষ নেই। এর দ্বারা তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির আশ্চর্য সজীবতাই প্রমাণিত হয়। এই সুযোগে আমিও মধুসূদন সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই।

ইংরেজী সাহিত্য ও মধুসূদন

সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যেই মধুস্‌দনের গভীর প্রবেশাধিকার ছিল। ভাষা-শিক্ষার অতিব্যস্ত কর্মস্থচী থেকে যদি ধরে নিই, লাতিন, হিব্রু, গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় তাঁর জ্ঞান ভাসাভাসা ছিল মাত্র, ফরাসী এবং প্রধানত ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ ছিল; তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, সে কোন ইংরেজী সাহিত্য? সমকালীন ইংরেজী সাহিত্যে তখন রোমাণ্টিক পর্বের পড়ন্ত দশা এবং টেনিসনের অভ্যুদয় হয়েছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার, গণতন্ত্রের চিন্তাধারা, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ তখন ইংলণ্ডে তথা সারা য়ুরোপের আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত। ফরাসী বিপ্লবের ব্যর্থতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীরা কল্পস্বর্গভ্রষ্ট হলেও রাজতন্ত্র বা পুরনো প্রশাসনযন্ত্রের বাঁধন আল্‌গা হয়ে গেল। নানা দেশে গণতান্ত্রিক চেতনা নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করল।

প্রকৃতিচেতনা, সৌন্দর্যকল্পনা, পুরনোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানবাধিকার প্রভৃতি রোমাণ্টিক সাহিত্যের লক্ষণ।

মধুস্‌দনের চিঠিপত্রে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উল্লেখ আছে। ছাত্র বয়সে এবং মাদ্রাজে লিখিত ইংরেজী কবিতায় ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রতিচ্ছায়াও স্পষ্ট। তিনি বায়রনও পড়েছিলেন। গৌরদাস বসাকের কাছ থেকে Tom's Life of Byron নিয়ে পড়ছেন—এমন সংবাদও আছে (দ্রষ্টব্য: ২৭শে নভেম্বর, ১৮৪২-এ লেখা চিঠি)। 'ক্যাপটিভ লেডি' এবং 'কিং পোরাস—এ লিজেণ্ড অফ ওল্ড' পড়লে বোঝা যায়, পলাশীর যুদ্ধের কবির আগেই তিনি বায়রনকে আত্মসাৎ করেছেন, তাঁর মতো ভেবেছেন, তাঁর মতো লিখেছেন। 'My Favourite Byron' উক্তিও আছে। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের বিশদ আলোচনার পর বায়রন-প্রসঙ্গ আলোচনা করা বাহুল্য। তিনি কি শেলী পড়েছিলেন? কীটসের কবিতার সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটেছিল কি? কবির জবানী বা অপরের স্মৃতিকথা থেকে এর সদুত্তর মেলে না। বায়রনের অব্যবস্থিতচিত্ততা, স্বাধীনতাস্পৃহা মধুস্‌দনের প্রকৃতিতেও ছিল; ম্যানফ্রেডের দেবদূত ও শয়তান-দূতের দ্বন্দ্ব বায়রন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বে লক্ষ্য করা যেতে পারে। এখানে বায়রন ও মধুস্‌দনের যথার্থ পূর্বসূরী মিল্টন—'প্যারাডাইস লস্ট'-এর প্রভাবেই হয়ত দুই কবির চরিত্রচিন্তায় এই অন্তর্দ্বন্দ্ব স্থান পেয়েছে। কিন্তু নারীবিদ্বেষী বায়রনের উচ্চকণ্ঠ প্রগলভতা মধুস্‌দনকে আকৃষ্ট করেনি। কবি প্রতিভার দিক থেকেও মধুস্‌দন বায়রনের সমধর্মী নন, বরং নবীনচন্দ্রের উচ্ছ্বাস-প্রবণতা, বাগ্‌বাহুল্য, আত্মাদর অনেকটা বায়রনকে মনে পড়ায়।

আমাদের মনে হয়, শেলীর কাব্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় হয়নি। যিনি বলতে পারেন, 'Byron, Moor and Scott form the highest Heaven of poetry in his (রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) estimation. I wish he would

travel further. He would then find what 'hills peep o'er hills—what 'Alps on' 'Alps arise'.[৪] তিনি নিশ্চয় শেলী ও কীটসকে বায়রনের উর্ধ্বে স্থান দেবেন। শেলী ছিলেন বন্ধন-অসহিষ্ণু, সামাজিক দায়িত্ব-সচেতন কবি। একেবারে বায়রনের বিপরীত কোটি। শেলী পড়লে মধুসূদনের কাব্যের চেহারাই বদলে যেত। কবিতাকে স্বাধীনতার সনদ করতে চেয়েছিলেন শেলী একাধিকবার। 'এ ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি'র একাংশে বাক-স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতার সপক্ষে যে-সব যুক্তি আছে, তা ওড টু লিবার্টি রচয়িতারই উপযুক্ত।

রোমান্টিক যুগের আর একজন উল্লেখ্য কবি কোলরিজ। অবশ্য কবিপ্রকৃতির দিক থেকে কোলরিজ ও মধুসূদনের ব্যবধান মেরুপ্রমাণ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সেই উগ্রসংঘর্ষের যুগে 'ইয়ংবেঙ্গল' মধুসূদন কখনোই অতিপ্রাকৃত রসে নিমগ্ন হতে পারেন না। খ্রীস্টিয় প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব তাঁর প্রেরণা-উৎস হওয়া সম্ভব ছিল না।

চতুর্দশপদাবলীতে টেনিসন সম্পর্কে কবিতা আছে, কিন্তু মধুসূদনের কাব্যচর্চায় টেনিসন-প্রভাব নেই।

সবচেয়ে বড় কথা, ছাত্রজীবন থেকেই মিল্টন-প্রতিভার অনন্যসাধারণতা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। তাই বায়রন বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মধুসূদনের কবিমানস গঠনে passing phase-এর মতো অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী প্রভাব; তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মিল্টনের দিকে। 'Milton is divine !' কিন্তু মিল্টন-প্রকৃতির সঙ্গে মধুসূদনের বৈসাদৃশ্য কি গভীর-প্রোথিত নয়? মিল্টনের আবাল্য সংযত গম্ভীর প্রকৃতি পিউরিটান আচার, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, ক্রমওয়েল-পক্ষে রাজনৈতিক লড়াই, অপূর্ব অধিকার-সনদ এ্যারিওপ্যাজিটিকা রচনা কি মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব? অন্তত মিল্টনের জীবনচর্যা ও কাব্যঐতিহ্য তিনি অনুসরণ করেননি। মনে রাখতে হবে, Paradise Regained পর্যন্ত পৌঁছাবার কথা ভেবেই মিল্টন Paradise Lost লিখেছিলেন; কারণ প্রথমটি মিল্টন-মানসের পূর্বমেঘ, দ্বিতীয়টি উত্তরমেঘ। মধুসূদনের পক্ষে Paradise Regained অকল্পনীয়।

কমনওয়েল্‌থ আন্দোলন এবং রেস্টোরেশনের প্রবল সামাজিক বিপর্যয়ের কালেও মিল্টন আত্মসমাহিত, স্থিতধী; নিরুদ্যম তাঁর স্বভাবধর্মেরই প্রতিকূল ছিল। মিল্টনও প্রবল সামাজিক বিপর্যয়ের কালের কবি। সেই কালের অস্থিরতা, অন্তর্বিরোধ, নতুন উপলব্ধি ও তার সীমাবদ্ধতা সবই মধুসূদনের কাব্যে মূর্ত। আমাদের বক্তব্য, উভয়ের চিত্তদর্পণের প্রকৃতি তুলনীয় নয়। তবু মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি মিল্টনের শ্রেষ্ঠ কাব্যেরই আদর্শে রচিত। দ্বিতীয় সৃষ্টি আদর্শের এত কাছাকাছি আর কখনও পৌঁছাতে পেরেছে কি-না জানি না। বাংলার নবজাগৃতির পটভূমি এবং 'পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম' মনে রাখলে মেঘনাদ বধ প্যারাডাইস লস্টের চেয়ে মহনীয়।

মধুসূদনের একটি উক্তি, 'He (Milton) is Satan himself'[৫] বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, জ্ঞানবৃক্ষের ফল-খাওয়া আদমের original sin অবশ্যই শাস্তিযোগ্য, ঈশ্বরবিধানের অলঙ্ঘ্যনীয়তা এবং শয়তানের পরাভব মিল্টনের বর্ণিতব্য হলেও শিল্পীর সহানুভূতিগুণে শয়তানের পৌরুষ, ভাগ্য-বিড়ম্বিত ব্যক্তিত্বের যন্ত্রণা অনেক বেশি মানবীয় সম্পদে মণ্ডিত হয়েছে। সে জন্যেই 'Paradise Regained seems to most modern readers a very slight thing besides its gigantic predecessor.'[৬]

মেঘনাদ বধ কাব্যের পাঠকও ভাবতে পারেন, 'Madhusudan is Ravana himself.' গ্রীক প্যাগানিজমের চেয়ে 'প্রাক্তন', 'নিয়তি', 'ভাগ্যদোষে', 'কর্মফলে' প্রভৃতি শব্দে যে গূঢ় নীতিবোধের সঙ্গে মানবীয় চিত্তবৃত্তির সংঘাত এই মহাকাব্যে রূপায়িত, তার মূল যুগপৎ মিল্টনীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে এবং উনিশ শতকের যুগমানসে প্রোথিত।

বিশেষ চরিত্র, ঘটনা ও বর্ণনাভঙ্গি, এমন কি মহাকাব্যীয় উপমা কতদূর মিল্টন থেকে গৃহীত, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ উপাদানে আমাদের উৎসাহ নেই। তা সত্ত্বেও বোঝা যায়, মধুসূদন তাঁর সমগ্র কবিসত্তায় প্যারাডাইস লস্টের কবিকে ধারণ করেছিলেন; তাই বাইবেলের পুনর্মূল্যায়নের মতো রামায়ণের সম্পূর্ণ নতুন রসভাষ্য শিল্পিত হয়েছে মেঘনাদ বধে।

আর একটি প্রসঙ্গও বিশেষ উল্লেখ্য। ইংরেজি ব্ল্যাঙ্কভার্সের একটা বিবর্তন আছে। কোনো একজনের রচনায় তার পূর্ণ পরিণত চেহারা ফুটে ওঠেনি। মার্লোর অনুশীলনে প্রথম ব্ল্যাঙ্কভার্সের জন্ম ও নাট্যোপযোগী অবয়ব, শেক্সপীয়রে বিচিত্রপ্রয়োগ, মিল্টনে চূড়ান্ত পরিণতি। পঞ্চমাত্রিক Iambic ইংরাজী ভাষার স্বভাবজ ছন্দ, তাকেই ভিত্তি করে আশ্চর্য দৃঢ়তাব্যঞ্জক অথচ নিহিত সঙ্গীতময় ব্ল্যাঙ্কভার্স সৃষ্টি করেছেন মিল্টন। পূর্বসূরীদের তিনি বহুদূর ছাড়িয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য যে, একক মিল্টনের অনুশীলনেই মধুসূদন মার্লো, শেক্সপীয়র ও মিল্টনের নিরীক্ষা আত্মসাৎ করে অমিত্রাক্ষর উদ্ভাবন করেছেন। এখানেও ভিত্তি বাংলার স্বভাবজ ছন্দ চৌদ্দমাত্রিক পয়ার। অমিত্রাক্ষর অনুকরণ নয়, নতুন সৃষ্টি —যেমন এক প্রদীপ থেকে অন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু প্রত্যেক দীপশিখা তার নিজস্ব দীপ্তিকেই প্রকাশ করে।

নারীমুক্তিচেতনা ও মধুসূদন

গডউইনের লেখা তিনি পড়েছিলেন কি-না বলা কঠিন, কিন্তু বাংলাদেশে সেকালে যে নারীমুক্তি আন্দোলন ইয়ংবেঙ্গল —ব্রাহ্ম-প্রগতিশীল হিন্দু সমাজে সাড়া জাগিয়েছিল, তার সঙ্গে মধুসূদনের যোগ ছিল। তিনি ছাত্র বয়সেই লিখেছিলেন, 'In India, I may say in all the oriental countries

women are looked upon as created merely to contribute to the gratification of the animal appetites of men.'[৭] বিদ্যাসাগরের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সম্পর্ক, বীরাঙ্গনা কাব্যোৎসর্গ, উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ' অনুবাদের ইচ্ছা, চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, জনা, সীতা সৃষ্টিতে তাঁর মনোভাব পরিস্ফুট। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রূপেও নারীপ্রগতি বিষয়ে তাঁর মতামত অনুমান করা যায়।

কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে যায়, রামমোহন বা বিদ্যাসাগরের মতো তিনি কি নারী-ব্যক্তিত্বের মূল্য সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছিলেন? বীরাঙ্গনার কবিও কি নারীর স্বাধিকারচেতনায় অকুণ্ঠ বিশ্বাসী? তাহলে, তারা, জনা, কৈকেয়ীর পাশাপাশি ভানুমতী, দুঃশলা স্থান পায় কি করে? জনা ও কৈকেয়ীতে যদি নিজস্ব মূল্যবোধের সঙ্গে স্বাধীন মূল্যবোধের বিরোধ প্রধান হয়, তারায় ধর্মবোধ ও সমাজগর্হিত প্রেমের দ্বন্দ্ব, তাহলে জাহ্নবীতে মূল কথা সনাতন পৌরাণিক ধর্মে আস্থা। বীরাঙ্গনা কাব্যের মূল সুরের সঙ্গে জাহ্নবী-পত্রিকার বক্তব্য একেবারে মেলে না। দুঃশলা-ভানুমতীও কনভেনশনাল বাঙালী মহিলা মাত্র। মেঘনাদবধের চিত্রাঙ্গদা প্রমীলা মধুসূদনের বলিষ্ঠ নারী-চরিত্রাঙ্কন, কিন্তু বিদ্যাসাগর-অনুরাগী কবি সাড়ম্বরে প্রমীলার সহমরণ বর্ণনা করলেন কেন? সহমরণ-দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসতা প্রস্ফুট হলে সতীদাহের বিরুদ্ধেই কবির রায় প্রকাশ পেত। কিন্তু 'দেয় হুলাহুলি সধবা রাক্ষসনারী আর্দ্র অশ্রুনীরে —হায়রে, মঙ্গলধ্বনি অমঙ্গল দিনে' —ছাড়া আর কোনো আক্ষেপ নেই। বরং চিতায় আরোহিত সতী (ফুলাসনে যেন!) 'বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে; প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরীপ্রদেশে'। চৌদিকে পুষ্পবৃষ্টি ইত্যাদির কথাও আছে। যে-সতী হ্যালিডে সাহেবের সামনে প্রসন্নমুখে আঙুল পুড়িয়ে সতীদাহের পক্ষে হিন্দুনারীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রমাণ করেছিল, প্রমীলা যেন তারই এক সংস্করণ! আরও বেদনাদায়ক, এই সতীদাহে রাবণের নীরব সমর্থন। পুত্রবধূর এই অসময়োচিত বীভৎস মৃত্যু ('বসন্তারম্ভে, হায়রে, শুকাল হেন ফুল!') রাবণকে বিচলিত করেনি। তিনি কেবল মেঘনাদের জন্যই বিলাপ করেছেন।

ইন্দ্র, শচী, কার্তিক, যম আদি দেবতা ও ঋষিরা, 'আর আর প্রাণী যত ত্রিদিব-নিবাসী' সকলেই এই গৌরবজনক দৃশ্য দেখতে আকাশে সমবেত। অবশ্য মহাদেব অগ্নিকে আদেশ করেছেন, 'সর্বশুচি'র দ্বারা পবিত্র হয়ে রাক্ষসদম্পতি যেন শীঘ্র শিবধামে আনীত হয়। এর শিল্পগত ফলশ্রুতি কি? আপাতবিচারে আমরা যে-সতীদাহকে নিষ্ঠুরতা মনে করি, তা আসলে ঝটিতি সাদরে স্বর্গে অভ্যর্থনা পাবার ছাড়পত্র। দেবতাদের ব্যাপার এবং রাবণ-বিলাপে প্রমীলার অনুল্লেখ নিঃসন্দেহে অনবধানতার পরিচায়ক। এ সবের বাহুল্য না থাকলে—

বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে!

পংক্তিদ্বয়ের শোকব্যঞ্জনা পক্ষান্তরে সতীদাহের নিষ্ঠুরতাকেই ধিক্কার দিত।

বুর্জোয়া সাহিত্য ও মধুসূদন

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ একটি নতুন শ্রেণী গড়ে উঠল। তাদের অনেকেই বংশসূত্রে ভূম্যধিকারীর সন্তান—আচরণে ও মানসিকতায় ফিউডাল, তার সঙ্গে যুক্ত হল বুর্জোয়া চিন্তাধারা। যন্ত্রবিজ্ঞান রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য নগর-শহর উন্নত হল। গ্রাম থেকে সমাজের কেন্দ্র উঠে এল শহরে। ইংরেজের আনীত বুর্জোয়া সভ্যতা মূলত Urban. গ্রামগুলি ধীরে ধীরে শিক্ষা-সংস্কৃতির আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে আরও নিস্তরঙ্গ নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ল। উপনিবেশবাদের অপরিহার্য অঙ্গ রূপেই ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিকতন্ত্র অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে ছিল।

তবু বুর্জোয়া ভাবধারা নিঃসন্দেহে সমাজপরিবর্তনের দিশারী। বিদেশী শাসনের ছায়ায় এর সম্পূর্ণ ও সুস্থ চেহারা সম্ভব নয়। 'যে সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার উচ্ছেদ ধনবাদের অবশ্য কর্তব্য, ভারতে বৃটিশ ধনবাদ ও তাহার অনুচর ভারতীয় ধনবাদ কেহই তাহা সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিল না। যে নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হইল তাহা রহিয়া গেল আধা-ফিউডাল; পুরাতন জীবনাদর্শের মোহ তাহাদিগকে অনেকাংশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুরানো অবস্থাও টিঁকিয়া থাকিতে পারিল না। সমাজ জীবনে আসিল গতিশীলতা, আসিল জাগরণ ...এই নূতন চেতনার প্রধান পুরোহিত রামমোহন ও ডিরোজিও এবং এই চেতনার প্রধান রূপকার—মধুসূদন।'[৮]

বাংলাসাহিত্যে প্রথম বুর্জোয়া-চেতনার শিল্পী মধুসূদন। তাঁর চিত্তেও ফিউডাল-বুর্জোয়া ভাবধারার সংঘাত ছিল। জীবনে ও সাহিত্যে তার নিদর্শন প্রচুর। রাবণের ঐশ্বর্যপ্রীতি, অহঙ্কার, প্রাক্তনের বিশ্বাস ফিউডাল সংস্কারের এবং সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কার স্বাধীনতা-রক্ষার প্রতিজ্ঞা, একে একে বীরপুত্রের আত্মবিসর্জন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস বুর্জোয়া সংস্কারের পরিচায়ক। কবি নতুন বুর্জোয়া-চেতনায় উদ্দীপিত হয়েই 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ'—এই আলঙ্কারিক নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন। তৎসত্ত্বেও মেঘনাদ বধ মহনীয় কাব্য হয়ে উঠেছে। কারণ 'য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা যখন সত্য তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু-না কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না।'[৯] বলা বাহুল্য, সকলে এই চেতনার স্পর্শ পাননি। তাই মধুসূদনের অনেক পরেও ভারতচন্দ্র-ঈশ্বরচন্দ্র অনুসরণে কাব্য রচিত হয়েছে। তার মধ্যে

কোনো কোনো কবি 'রসসাগর' খেতাব পেয়েছেন। কিন্তু মধুসূদনে এই নতুন চেতনার উজ্জীবন, ফিউডাল ও বুর্জোয়া আইডিয়ার সংঘাত অপূর্ব শিল্পমূর্তি পেয়েছে।

বুর্জোয়া সমাজপত্তনের অন্যতম লক্ষণ মাতৃভাষার সমৃদ্ধি। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসে হিব্রু গ্রীক লাটিন চর্চার দ্বারা মাতৃভাষারই উন্নতি সাধিত হয়েছিল। মধুসূদন বাংলাভাষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, 'প্রথিবী' বলে'ছিলেন ; তেলেগু সংস্কৃত লাটিন গ্রীক হিব্রু ফরাসী শিখেছিলেন।[১০] কিন্তু সৎই মাতৃভাষার উন্নতিসাধনের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে স্মরণীয়।[১১] পয়ার থেকে অমিত্রছন্দ, মহাকাব্য, পত্রমূলক নাট্যকাব্য, গীতিকবিতা, সনেট প্রভৃতির মাধ্যমে মধুসূদন মাতৃভাষার বৈপ্লবিক উন্নতি সম্পন্ন করেছেন।

তবু আক্ষেপ জাগে, নাট্যসংলাপের আদর্শ বিষয়ে যাঁর ধারণা এত স্বচ্ছ, তিনি কেন প্রহসন দুটি ছাড়া সেই আদর্শ প্রয়োগ করতে পারলেন না ? নাটকের ফর্মেও তিনি কতটুকু অগ্রসর হলেন ? রামনারায়ণ এবং সাহিত্যদর্পণকে ধিক্কার দিয়ে কি লাভ হল ? এখানেও সেই ফিউডাল-বুর্জোয়ার দ্বন্দ্ব। তিনি তো অগ্রণী, কিন্তু মঞ্চের মালিক, দর্শকগোষ্ঠী ? ছোটরাজা-বড়রাজার ওপর যে-নাটক মঞ্চায়নের ভার, সেই নাটক হবে আইডিয়ায় অ্যান্টিফিউডাল ? তা হতে পারে না। সে জন্যই শর্মিষ্ঠায় তাঁদের যে সমর্থন সেটা বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ বা কৃষ্ণকুমারীর পক্ষে তা সম্ভব নয়।

দেশাত্মবোধ পরাধীন দেশের বুর্জোয়া-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। রামায়ণের মধ্যে দেশাত্মবোধের সূত্র আছে এ কথা বাল্মীকি, কৃত্তিবাস, তুলসীদাস বা দ্বিজ রামচন্দ্র খানের মনে হয়নি। ধর্মানুরক্তি, ভক্তিবিহ্বলতাই তখন কাব্যানুশীলনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু পরাধীন দেশের কবি মধুসূদন পরদেশ-আক্রমণকারী আগন্তুক-শক্তিকে ক্ষমা করতে পারেননি। তাই রামচন্দ্র সপার্ষদ নিন্দিত, বিভীষণ ভৎর্সিত। রাবণ-মেঘনাদের প্রজ্জ্বলন্ত দেশপ্রেম উনিশ শতকের সমাজপ্রেক্ষিতেই বিচার্য।

কথাশেষ

আমরা মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনা কাব্যকে মধুসূদনের সমকাল এবং সাহিত্যের আধুনিক আদর্শ দিয়ে বিচার করি। এ কথা বলি, চিত্রাঙ্গদা, প্রমীলা, জনা, শৈবলিনী-বিনোদিনী কিরণময়ীর অঙ্কুর। তবে তিনি সরাসরি সমকালকে আশ্রয় করলেন না কেন ? 'পুরাতন পাত্রে নূতন সুরা' পরিবেষণ ছাড়া কি পথ ছিল না ? প্রহসন দুটির সাফল্যে অন্তত এ বিষয়ে লেখকের মন সংশয়মুক্ত হতে পারত। কোনো কাব্যে নারী চরিত্রে যদি ভূদেবজননী ও কবির আত্মীয়ার চরিত্র উপাদান যোগায়, তবে অতীতচারিতার প্রয়োজন কি ? এর উত্তরে হয়ত বলা যায়, পুরনো সমাজব্যবস্থার কাঠামো না ভেঙে ওপর-ওপর একটা নতুন ব্যবস্থার রঙ চড়ানো

হয়েছিল বলে নতুন জীবনবোধে অন্বিত নরনারী তখনও বাস্তবে দেখা দেয়নি। তাদের আবির্ভাব ঘটেছে আরও অনেক পরে —বঙ্কিমের আমলে। তাই অসম প্রণয়ীকে আত্মনিবেদন এবং তার জন্যে প্রবল বিবেক-তাড়না, বিধবা যুবতীর প্রণয়োন্মেষ ইত্যাদি আধুনিক বিষয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারীব্যক্তিত্ব অতীতকালে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তা ছাড়া পুরাতনের নতুন মূল্যায়ন, নতুন ব্যাখ্যা নতুন কালেরই পরিচয়বহ।

১॥ সমাজদর্পণ, ১৮৭৩

২॥ বঙ্গদর্শন

৩॥ মেঘনাদবধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বঙ্গদর্শন, ১২৮৮

৪॥ মধুস্মৃতি ; ২য় সংস্করণ, পৃ. ৬০২, রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র

৫॥ ঐ ; পৃ. ৬১৭, রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র

৬॥ W. H. Hudson: *An Outline History of English Literature* ; ভারতীয় সংস্করণ পৃ. ৮৭

৭॥ মধুসূদনের বাল্যরচনা, মধুস্মৃতি ; পৃ. ৫৫৩

৮॥ সাহিত্যবীক্ষা ; নীরেন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ১০৫-৬

৯॥ সাহিত্যসৃষ্টি, সাহিত্য ; রবীন্দ্রনাথ

১০॥ মধুস্মৃতি ; পৃ. ৫৯৮

১১॥ ঐ ; পৃ. ৫৯২

রবীন্দ্রনাটক, গণনাট্যের দৃষ্টিভঙ্গি

রবীন্দ্রনাটক সম্বন্ধে দুর্মর কুসংস্কার এই যে, তাঁর নাটক দুর্বোধ; যে-পরিমাণে সাহিত্য-গুণান্বিত, সে-পরিমাণে অভিনয়যোগ্য নয়। এড্‌ওয়ার্ড টমসনের প্রতিধ্বনি মুখে মুখে ফেরে —রবীন্দ্রনাটক 'আইডিয়ার বাহন, কিন্তু নাটকীয় নয়, চরিত্রগুলিও কথার পুতুল'। এই অভিযোগধর্মী সংস্কারগুলি অংশত সত্য মাত্র। কিন্তু এই সব সরলীকৃত দোষদর্শী সমালোচনায় ভ্রান্তিও অল্প নেই। গণনাট্য সঙ্ঘ তো গ্রাম-বাংলার নানা অঞ্চলেও সাফল্যের সঙ্গে 'বিসর্জন যাত্রা' অভিনয় করেছেন। 'রক্তকরবী'-'মুক্তধারা'-র 'দুর্বোধ' বিশেষণ এখন শোনা যায় না। 'দুর্বুদ্ধি' ও 'উলুখড়ের বিপদ' গল্পের নাট্যরূপ কৃষক-সমাবেশে অভিনয়-সফল হয়েছে।

তবু কয়েকটি প্রশ্ন থেকে যায়: (১) সংলাপ নাটকের প্রাণ। গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটক বিশ্বস্ত সমাজচিত্র নয়, সার্থক নাটকও নয়; তবু চরিত্রানুগ সংলাপের গুণে রঙ্গমঞ্চে সুসহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংলাপ? যেন বড় বেশী sophisticated, সকলেই অভিজাত পরিশীলিত সংলাপে অভ্যস্ত। বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল কি মায়াবসানের সংলাপ রবীন্দ্রনাটকে ভাবাই যায় না।

(২) কয়েকজন ব্যক্তি, এক বা একাধিক পরিবার নাটকের কেন্দ্র হলেও গোটা সমাজের একটা পটভূমি নাটকীয় বাস্তবতা সৃজনের পক্ষে অপরিহার্য। এর জন্যেই বহু গুণ সত্ত্বেও বহু নাটক বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন এবং বহু ত্রুটি একান্ত প্রকট হলেও 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' সফল অভিনয়ের নাটক। রবীন্দ্রনাথের নাটকে এই পটভূমি থাকে না; গৌণচরিত্রগুলি প্রয়োজনের মাপে একেবারেই নিয়ন্ত্রিত। তাই সমাজবাস্তবের প্রতিবিম্ব নেই।

(৩) গল্পগুলির মধ্যে আছে 'সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ' সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-কলহ-সমস্যার কথা। প্রসঙ্গত এসেছে রাজনীতি কোথাও বা সামাজিক পণপ্রথা। সেই মানুষগুলি আমাদের চেনা-জানা। তুলনায় নাটকের পাত্র-পাত্রী আমাদের প্রায়-অচেনা। চরিত্রগুলির মনোজগৎ আমাদের স্থূল বাস্তবের ঊর্ধ্ব-চারী। সেখানেই জনগণের পক্ষে রবীন্দ্রনাটকের রসাস্বাদে অন্তরায়।

(৪) বিষয় ও আঙ্গিকের sophistication আছে বলেই জনগণের আসরে

স্বল্পশিক্ষিত মেহনতী মানুষের দ্বারা রবীন্দ্রনাটকের অভিনয়ও সম্ভব নয়। চারটি প্রশ্নের যোগফলে দাঁড়ায় যে, গণনাট্যের ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাটক ভিন্ন কোটির; গণনাট্যের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাটকের স্থান নেই।

এই প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধানের পূর্বে রবীন্দ্র-নাট্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৮ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাট্যের প্রথম পর্যায়; কল্পনা-প্রাধান্যের কাল। রুদ্রচণ্ড, কালমৃগয়া, বাল্মীকি প্রতিভা, প্রকৃতির প্রতিশোধ, মায়ার খেলা এই পর্যায়ের রচনা। এগুলি শিল্পকর্ম হিসেবে ত্রুটিহীন নয়। কারণ তখনও বিপুল মানবসংসার সম্বন্ধে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি। আত্মভাবুকতাময় মানসিকতার জগৎকেই মোহিতচন্দ্র সেন বলেছেন 'হৃদয়-অরণ্য'। 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি, জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'—একটা abstract আত্মীয়তার ব্যাপার। শিলাইদহ-পতিসর বাসের পূর্বে প্রত্যক্ষ সংসারজীবনে তাঁর দীক্ষা হয়নি। নাটকের লক্ষণ সম্বন্ধেও তিনি পুরোপুরি অবহিত বলে মনে হয় না। নাটকীয়তার বোধ থাকলে প্রকৃতির প্রতিশোধের আখ্যানবিন্যাস অত পল্লবিত হত না। কিংবা নলিনীর মতোই রুদ্রচণ্ডকেও কাব্যরূপে প্রকাশ করতেন। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, সন্ন্যাসী ও বাল্মীকির মনোজগতে যে আইডিয়ার সংঘাত, তার নাট্যমূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যে ঘটনাবিরল ভাবদ্বন্দ্বের পথে তাঁর নাট্যবোধকে প্রকাশ করবেন, তার ইঙ্গিত এই পর্বে প্রস্ফুট।

প্রযোজনার দিক থেকে কালমৃগয়া ও বাল্মীকি প্রতিভার একটি সুবিধা এই যে, খুব রঙচঙে পোশাক ছাড়াই জনপ্রিয় পৌরাণিক পটভূমিতে নাট্যবিষয়ের প্রস্তাবনা। ব্যাধের বলিষ্ঠ দেহগঠন, ধনুতে শরযোজনা এবং ডাকাতদলের কীর্তিকলাপ সহজে লোকপ্রিয় হবে। অথচ প্রেম ও করুণার বাণী (উন্নত সাহিত্যের বিষয়) আবৃত্তি ও সংগীতের মাধ্যমে তার স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা জনচিত্তে সঞ্চারিত হবে।

মায়ার খেলার ধরন আলাদা। এর সমস্যা আসলে কাব্যেরই সমস্যা; নাটকীয় উপস্থাপনায় এই বিষয় এনেছেন পরে—রাজা ও রানীতে; এবং আরও পরে তপতীতে। নাটকের ফলশ্রুতি এবং প্রয়োগের দিক থেকে রাজা ও রানী, তপতী ভিন্ন আদর্শের।

রাজা ও রানী এবং বিসর্জন দ্বিতীয় পর্যায়ের (১৮৮৯-৯৭)। এই দুটি নাটকের কাহিনী বিন্যাসে তিনি সজ্ঞানে শেক্সপীরীয় শৈলী অনুসরণ করেছেন। গণনাট্য প্রযোজনার দিক থেকে বিসর্জন নাটকের চেয়ে যাত্রা রূপই কার্যকর। তেমনি রাজা ও রানী। অবশ্য প্রচলিত সংস্করণের চেহারা তাতে বদলাতে হবে। প্রযোজনার সুবিধার জন্য এই ধরনের অদল-বদল রবীন্দ্রনাথ বারংবার করেছেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, 'যাহাদের পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার' সেই মেহনতী সাধারণ মানুষের দর্শক-সমাবেশের জন্য উদ্দিষ্ট গণনাট্য-রূপে তাঁর অনুমোদন মিলত। কিছু গোঁড়া রবীন্দ্রভক্ত এবং বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ড যাই

বলুন, এ বিষয়ে নাট্যকারের সমর্থন মিলবে। 'তপতী'-র ভূমিকায় মঞ্চপ্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

'আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রব রূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।...নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান গতিশীল; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু; ...আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না।'

তিনি ঘন ঘন দৃশ্যান্তর বোঝাতে পটের পরিবর্তন পছন্দ করেননি। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বা বিশ শতকের গোড়াতেও ঘোড়াসুদ্ধ সৈনিককে স্টেজে দেখানো বা আপাদমস্তক জল ঝরিয়ে বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ যেমন স্থূল ন্যাচারালিজম, 'ভাবসত্যকেও বাধা দেয়,' তেমনি এ কালের আলোকসম্পাতে মঞ্চে রেলগাড়ি চালানো, জলের তলায় খুঁচিয়ে মারা প্রভৃতিও ন্যাচারালিজমের রকমফের। রবীন্দ্রনাথ ব্যয়সাধ্য প্রয়োগরীতির বিপক্ষে ছিলেন। অথচ তাঁর রক্তকরবীর জন্য ন্যূনতম হাজার টাকার প্রয়োগরীতিই এখন চালু। দৃশ্যের আলো, পর্দা ইত্যাদি ছাড়া স্থানের স্বাতন্ত্র্য, সময় ও ভাবের পরিবর্তন বোঝানো যাবে কি করে? রবীন্দ্রনাথ এর সহজ সমাধানে পৌঁছেছেন খোলা-মঞ্চে। এখন 'মুক্তাঙ্গন' অঙ্গনে মঞ্চ নিয়ে নতুন করে নিরীক্ষা হচ্ছে। সেও বাঁধা মঞ্চ। যাযাবরের দলের মতো সহজে তাদের সরানো-নড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের অকুস্থল 'পথ'। এমন কি যে পরিত্রাণ নাটকে একটা ইতিহাসের আবহ আছে, সেখানেও ঐতিহাসিক নাটকসুলভ জাঁকজমকের চিহ্নমাত্র নেই। ডাকঘর, অচলায়তন, রক্তকরবী, মুক্তধারা —সবগুলিতেই পথের প্রাধান্য। একটিমাত্র পেছনের পর্দা (Back curtain) হলেই যথেষ্ট। মন্দির বোঝানোর জন্য তারি গায়ে একটি বাঘছাল বা পুজোর আসন ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে —দু'পাশে পিলসুজের ওপর প্রদীপও চলতে পারে। কাশ্মীরের পথ এবং জালন্ধরের পথের পার্থক্য সূচিত হবে পথিকদের আলাপে। স্থবিরপত্তনের অচলায়তন ও রক্তকরবীর যক্ষপুরী বদ্ধজগৎ। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। তবু দুটি নাটকেই মেলবার জায়গা- -জালের জানালার সামনে দিয়ে সুড়ঙ্গের দিকে, খোদাইকর পল্লীর দিকে, আবার সে পথেই নন্দিনী, সর্দার ও কেনারাম গোঁসাইয়ের আসা-যাওয়া। উত্তরকূট ও শিবতরাইয়ের মধ্যবর্তী পথেই দু'দল মানুষের গতায়াত। সেই পথের দু'দিকে দুই চূড়ো। একটি মানবকল্যাণের —কালভৈরবের, অপরটি বিভূতির, যন্ত্রের।

আবার রাজা ও রানীর প্রযোজনার কথায় আসা যাক। জালন্ধর প্রাসাদ, পথ,

প্রামাদ কানন, সিংহগড়, কাশ্মীর প্রাসাদ, শিবির, অরণ্য, দেবীমন্দির, হাট প্রভৃতি দৃশ্যের বর্ণনা আছে। 'পথ'-ও আছে। সিংহ প্রতীক দিয়ে 'সিংহগড়', কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে 'শিবির', সামান্য পশরা সমেত পথচারী দিয়ে 'হাট' বোঝানো যায়। রাজা ও দেবদত্তের অন্তঃপুরের পক্ষে প্রতীকবিহীন পর্দাই চলতে পারে। বলা বাহুল্য, প্রয়োগের খাতিরেই তৃতীয় অঙ্ক ঢেলে সাজা দরকার। ইলা-কুমার উপবৃত্তের সংকোচন অবশ্যম্ভাবী! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ইলা-কুমারের উপসর্গ' 'শোচনীয় রূপে অসংগত'। তার বদলে নরেশ-বিপাশা কি নতুন উপসর্গ নয়? কেবল গান গেয়ে কবির রোমান্টিক প্রেমাদর্শকে সুব্যাখ্যাত করার জন্য কোনো চরিত্রযুগলের নাটকীয় অপরিহার্যতা নেই। বরং ইলা-কুমারের human interst অনেক বেশি নাটকীয়। দেশরক্ষার কর্তব্যবোধে আসন্ন বিবাহের প্রাক-মুহূর্তে সানন্দে যুদ্ধযাত্রা কুমারসেন চরিত্রটিকে মহিমান্বিত করেছে। 'লিরিকের জলাজমি' অভিনয়যোগ্যতা ক্ষুণ্ণ করেছে অন্য কারণে। উপস্থাপনার দোষে।

তৃতীয় অঙ্কে নাট্যদ্বন্দ্বের চরমতা প্রত্যাশিত। কাহিনীবিন্যাসের দিক থেকেও তৃতীয় অঙ্কে উপকাহিনীর সম্ভাবনা ছিল না। ইতোমধ্যেই সুমিত্রা 'তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে' বলে জালন্ধর ত্যাগ করেছেন এবং বিক্রমের অন্ধ ক্ষাত্রতেজের বিকৃত জাগরণে যুদ্ধের প্রস্তুতি হয়েছে। নাট্যদ্বন্দ্ব যে মোড় নেবে তারই সুস্পষ্ট আভাস—

তবে দাও, ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম মোর—
রাজধর্ম ফিরে দাও, পুরুষ হৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গমাঝে।
কোথা কর্মক্ষেত্র! কোথা জনস্রোত! কোথা
জীবনমরণ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখ দুঃখ-বিপদ-সম্পদ-
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস!

নাট্যাভিনয়ের দিক থেকে এই অংশকে Ideal tragic Action বলা যায়। স্বভাবতঃই মনে হয় তৃতীয় অঙ্কে দেখা যাবে, বিক্রম কর্মচঞ্চল, যুদ্ধে লিপ্ত; সুমিত্রা বিক্রমের সুস্থিত হবার পথে সহায়, প্রেমের কর্তব্যেই সে জালন্ধর-কাশ্মীর বিবাদ মীমাংসায় অগ্রণী। পরিবর্তে তৃতীয় অঙ্ক জুড়ে পাই 'লিরিকের প্লাবন', তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় ও পঞ্চম দৃশ্যে একই প্রমোদ কাননের পুনরাবৃত্তি, পঞ্চম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যেই সেই পরিবেশ। কেবল গান ওমালা গাঁথায় নাট্যদ্বন্দ্ব স্থগিত। অনুরূপত তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য এবং চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে কুমার-সুমিত্রার স্মৃতিচারণে নাট্যদ্বন্দ্বের অপলাপ। এইভাবেই বিক্রম-সুমিত্রার মূল কাহিনী আড়ালে পড়ে গেছে। চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে নাটকের climax স্থাপিত হয়েছে। সুমিত্রার শিবিকা প্রত্যাখ্যানে উভয়ের মধ্যে সংযোগের সেতু বিচ্ছিন্ন। রানীর সঙ্গে রাজার বিরোধ এখানেই অ্যাকশনের

মাধ্যমে তুঙ্গশীর্ষ স্পর্শ করেছে। প্রয়োগের খাতিরে এই ব্যাপারকে তৃতীয় অঙ্কে আনা উচিত এবং তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম দৃশ্যে 'অতি-সংক্ষেপ' অথবা 'বর্জন' অত্যাবশ্যক।

থালায় ছিন্নশির বহন এবং পরে সুমিত্রার পতন, মূর্ছা ও মৃত্যু ট্র্যাজেডিকে নষ্ট করেছে। এত দুঃখভোগের পর এই স্থূল চমৎকৃতি আচম্‌কা মনে হয়। 'তপতী'-তে এই স্থূলতা বর্জিত। কিন্তু সেখানে আবার সুমিত্রার মৃত্যু এত আইডিয়া-ধর্মী যে, তাতে বিক্রমের catharsis —তার চিত্ত পরিবর্তন উহ্য।

অগ্নিতে সূর্যতাপসী আত্মাহুতি দেবার পূর্ব মুহূর্তেও পুরোহিত ভার্গব ভীত হয়েছেন বিক্রমের 'দুর্দান্ত হিংস্রতায়'। সুতরাং কি করে ধরে নেওয়া যায় ব্রাহ্মণগণের প্রদক্ষিণমন্ত্র ('অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান/বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো/ভূয়িষ্ঠাং তেনম উক্তিং বিধেম') শুনেই উদ্যত কৃপাণ হাতে মঞ্চে প্রবেশমাত্রেই বিক্রমের চিত্তপরিবর্তন ঘটবে। আর যাই হোক, উপনিষৎ-শ্লোকের মহতীপ্রভাবে আস্থা দ্বারা নাটকের মুখরক্ষা হয় না। এর তুলনায় রাজা ও রানীতে বিক্রমের পরিবর্তন স্তরে স্তরে স্বাভাবিক ও নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত। সে জন্য নাট্যপ্রযোজনায় 'তপতী'র উপসংহার বর্জন করাই সমীচীন। মন্ত্রের অর্থও সাধারণের পক্ষে সুবোধ্য নয়। তাছাড়া এ যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লেখনীধারণ! তিনি বরাবর আচারমূলক শাস্ত্রীয় ধর্মের বিরুদ্ধে। মানবী সুমিত্রাকে এ কোন তপস্বিনীতে পরিণত করলেন! ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রাচার মানুষের দুঃখকে ছাপিয়ে গেল। তার চেয়ে রাজা ও রানীর অনুশোচনা-দগ্ধ বিক্রমের মর্মমথিত উক্তি ('দেবী যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের/তাই বলে মার্জনাও করিলে না?') আবেগপ্রবণ হলেও অনেক স্বাভাবিক, মর্মস্পর্শী এবং ট্রাজিক মহিমাশ্রয়ী।

এ ছাড়া আরেকটি কারণেও গণনাটকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজা ও রানী অভিনয়-যোগ্য। এর মধ্যে জালন্ধর ও কাশ্মীরের নাম থাকলেও ইতিহাস রস পরিবেষণ লেখকের লক্ষ্য নয়। তবু সমকালীন রাজনৈতিক পটভূমির ছায়া আছে। অত্যাচারী বিদেশী কাশ্মীরী যুধাজিৎ, উদয়ভাস্কর, জয়সেন প্রমুখের আড়ালে আছে বিদেশী ইংরেজ রাজপুরুষদের শোষণচিত্র। এখনও সেই ট্রাডিশন চলেছে। তাই দেবদত্তের উক্তি গভীর তাৎপর্যবহ হয়ে দাঁড়ায়—

দেবদত্ত॥ ১. ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মতো লোলজিহ্বা
এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি উচ্ছিষ্ট কখনো।…

২. দেশ অরাজক?
অরাজক কে বলিবে সহস্ররাজক।

৩. যত উপসর্গ ছিল অন্ন বস্ত্র আদি
সব গেছে, আছে শুধু অস্থি আর চর্ম।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বিদেশী অপশাসনের যুগে। স্বদেশী অপশাসনেই বরং এর তাৎপর্য হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি হচ্ছে।

প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে সমবেত জনগণের চিত্র আছে। কিন্তু নাপিত, মনসুখ চাষা, কুঞ্জরলাল কামার, মূর্খ ব্রাহ্মণ নন্দলাল, শ্রীহর কলু, হরিদীন কুমোর প্রমুখ জড়ো হয়ে নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করছে। স্বার্থ, বর্ণদম্ভ, সরলতা, ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষ, আর্থিক সমস্যা ও অনটনের সঙ্গে মিলেছে অনবদ্য হিউমার। যাতে এই ক্ষণস্থায়ী চরিত্রগুলো সজীব হতে পেরেছে। এর নাট্যতাৎপর্য চিরকালের। এই সাধারণ মেহনতী মানুষেরাই সমাজের ভিত্তি। তাই নানা ধাপ্পায় রাষ্ট্রযন্ত্র এদের ভুলিয়ে রাখে।

সুতরাং দেখা গেল, বিসর্জন যাত্রা-আঙ্গিকের মতো রবীন্দ্রনির্দেশিত পথে রাজা ও রানী-র রূপান্তরিত চেহারাও গণনাটকের ঐতিহ্যে সার্থক হতে পারবে।

বিসর্জন সম্পর্কে খুব বেশী বলার নেই। কারণ স্বয়ং নাট্যকার প্রচলিত সংস্করণের চেয়ে যাত্রারূপকেই বেশী পছন্দ করতেন। গণনাট্য সঙ্ঘ সঙ্গত-কারণেই এই রূপটিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে যদি রাজা, অরূপরতন এবং অচলায়তন, গুরু পাশাপাশি স্থান পায়, তবে বিসর্জনের সেই যাত্রা-পাঠ স্থান পায় না কেন? কবি-অনুরাগীদের অনিচ্ছা?

বিসর্জন সম্পর্কে কিছু অরসিকের বিতর্ক আছে। এখানে না-কি শাক্ত বনাম বৈষ্ণবের পূজাবিধি প্রধান নাট্যবিষয়। ব্রাহ্মলেখকের পৌত্তলিকতার বিরোধিতাও গোপন নেই। নানা আকারে এ হেন অরসিকের আলোচনা এখনও শোনা যায়। সে জন্যই কিছু আলোচনা দরকার।

বিসর্জনের প্রধান নাট্যবিষয় সংস্কার-কলুষবিসর্জন এবং 'মানুষের ধর্মে' প্রতিষ্ঠা। এই মানুষের ধর্ম বা 'প্রেম' নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত। সবচেয়ে দুর্গম মানুষ —সে নিজেই জানে না তার চরম কাঙ্ক্ষণীয় কি। তাই গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি ঈর্ষ্যায় রঘুপতি-চরিত্রে যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তার মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব, পৌরোহিত্য, সনাতন ধর্মে নিষ্ঠা গৌণ। মূল প্রেরণা অপমানিত পিতৃহৃদয়ের প্রতিহিংসা। যদি পৌত্তলিকতাকে আঘাত করাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে প্রতিমা-বিসর্জনেই নাটকের সমাপ্তি ঘটত। তাহলে 'দেবী' গল্পের বিষয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে দান করার প্রয়োজন হত না। পরন্তু পানুবাবুর মতো চরিত্রে তিনি ভণ্ডব্রাহ্ম দেখাতে দ্বিধা করেননি।

এহ বাহ্য। বিসর্জনে আচারধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা এমন স্তরে স্তরে উন্মোচিত হয়েছে যে, মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরি-বিপত্তারিনী-পূজিত গ্রামাঞ্চলের মানুষেরও তা হৃদয়-গ্রাহী হয়েছে। আজও ধর্মীয় কুসংস্কার নানা সামাজিক প্রথা ও লোকাচারের

নামে কম প্রভাবশালী নয়। তার বিরুদ্ধে 'বিসর্জন' ভাবগত সংগ্রামের শাণিত হাতিয়ার। পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে জয়সিংহের আত্মহত্যা এবং তার প্রতিক্রিয়ায় রঘুপতির ভ্রান্তি বিসর্জন ও পিতৃহৃদয়ের হাহাকারেই নাটকের যথার্থ সমাপ্তি।

১৯০৮ থেকে ১৯১৬ সাল রবীন্দ্রনাটকের তৃতীয় পর্ব। তখন ঘটনাকেন্দ্রিক নাট্যসংঘাত তিনি বর্জন করেছেন। রূপক-প্রতীক-সঙ্কেতের ব্যবহারে নাট্যপ্রকরণ হয়েছে অভিনব। তার কোনো পূর্ব-দোসর বাংলা সাহিত্যে ছিল না। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজে শারদোৎসব থেকে ফাল্গুনী পর্যন্ত নাট্যরচনাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেছেন। সে তার অধ্যাত্ম আদর্শের বিচারে। কবির ঋতুরঙ্গ দর্শনের দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। এই পর্বের অরূপ-ভাবনা আছে রাজা-অরূপরতনে, ডাকঘরেরও। কিন্তু অচলায়তন বা গুরুর আবেদন ব্যাপকতর। বলা বাহুল্য, ডাকঘরের অমল, মাধব, পাহারাওয়ালা, দইওয়ালা ব্যক্তি-মানুষ রূপেই আমাদের অন্তরঙ্গ। তাই রাজার ডাকঘরের আধ্যাত্মিক রূপক গৌণ হয়ে পড়ে সামাজিক স্তরের নানা মানুষের সংস্পর্শে। সেখানেই জোর দিতে হবে প্রযোজনায় এবং অভিনয় কৌশলে। তাহলে এর অস্পষ্ট অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা অবিকৃত রেখেই অমলের দুঃখ, পাঁচমুড়ো গ্রামের সাধারণ মানুষ, কাজ খুঁজতে যাওয়া সেই ক্লান্ত দিনমজুর যে-ঝরণাতলায় পুঁটলি খুলে ছাতু খায়, দইওয়ালা, গাঁয়ে-মানে-না আপনি মোড়ল, প্রহরী, ছেলের দল মিলে নাটকে একটি বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সহজ একটি সেটেই ডাকঘর মাঠে ময়দানে অভিনীত হতে পারে।

রাজা-অরূপরতনের বিষয় ব্যক্তিগত অধ্যাত্মভাবুকতা বা অরূপ-ব্যাকুলতা। সামাজিক মানুষের প্রতিবিম্ব এখানে গৌণ। তাই গণনাটকের আসরে এর অভিনয়ের দাবি জরুরী নয়। কিন্তু অচলায়তন বা গুরু? এর রূপক কোথাও অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন নয়; গোটা সমাজের চেহারাটাই স্থবিরপত্তনের এই আয়তনে ধরা পড়েছে। 'যেথা আচারের মরুবালুরাশি/বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই আসি' —সেই ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের কাম্য। কিন্তু সে তো বাস্তবে নেই, আছে স্থবিরপত্তন এই দেশ। আচারে-নিয়মে-মন্ত্রে বিধানের বেড়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এতে কায়েমী স্বার্থেরও সুবিধে।

এর পঞ্চক-মহাপঞ্চক রবীন্দ্রনাথেরই দুই সত্তার বিরোধ। তাই তারা সহোদর রূপে কল্পিত। রবীন্দ্রজীবনী পাঠে জানা যায়, বিশ শতকের গোড়ায় রিভাইভালিজমের ছায়া রবীন্দ্রনাথকেও আচ্ছন্ন করেছিল। ব্রহ্মবান্ধবের মতো ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, বিবেকানন্দের মতো হিন্দু বৈদান্তিক এবং রবীন্দ্রনাথের মতো ব্রাহ্মবৈদান্তিক সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম, পুরাণ এবং তপোবনমহিমার জয়গানে পঞ্চমুখ। সকলেই হিন্দুত্ব-গৌরব নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ', 'হিন্দুত্ব', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে মহাপঞ্চকের স্রষ্টাকেই পাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানসধাতু রক্ষণশীলতার বিপক্ষে। তাই পঞ্চক, দাদাঠাকুরের সৃষ্টি। কালের

যাত্রায় যেমন রথ সচল হয়েছে সমবেত শূদ্রের হাতের টানে, তেমনি অচলায়তনের বাইরের দর্ভকপল্লী বা শোনপাংশুরা অপরিহার্য এবং বন্ধন-অসহিষ্ণু পঞ্চক ঠাকুরদার পরামর্শ নেবার আগেই মিলেছে এই দলে। এখানেই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি।

ডঃ. সুকুমার সেন বলেন, 'শোনপাংশুদের অচলায়তন আক্রমণের মধ্যে আমাদের দেশে ইউরোপীয় শক্তির প্রথম সংঘর্ষের ব্যঞ্জনা আছে'। হয়ত আছে। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে আর্য রামায়ণের একটি ব্যাখ্যা আছে! আমার মনে হয়, 'অচলায়তন' রচনার সময় এই ব্যাখ্যাটি তাঁর মনে সক্রিয় ছিল।

'আর্যদের ভারত-অধিকারের পূর্বে যে দ্রাবিড়জাতীয়েরা আদিম নিবাসীদিগকে জয় করিয়া এই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত অসভ্য ছিল না। তাহারা আর্যদের কাছে সহজে হার মানে নাই। ইহারা আর্যদের যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটাইত, চাষের ব্যাঘাত করিত; কুলপতিরা অরণ্য কাটিয়া যে এক-একটি আশ্রম স্থাপন করিতেন সেই আশ্রমে তাহারা কেবলই উৎপাত করিত।

'দাক্ষিণাত্যে কোন দুর্গম স্থানে এই দ্রাবিড়জাতীয়, রাজবংশ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। তাহাদেরই প্রেরিত দলবল হঠাৎ বনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আর্য উপনিবেশগুলিকে ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।'

চণ্ডকের স্থবির হবার চেষ্টা এবং শিরশ্ছেদ রামায়ণে শূদ্রকের শিরশ্ছেদের কথা স্মরণ করায়। সেও অরণ্যচর শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণত্ব অর্জনের চেষ্টা করেছিল। রাজাকে সমর্থন করেছেন মহাপঞ্চক। বশিষ্ঠের নির্দেশেই রাম শূদ্রকমহিষীর কাতর আবেদন অগ্রাহ্য করেও শূদ্রকের মাথা কেটেছিলেন। উপরন্তু এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, যতক্ষণ শাস্ত্রের নিয়ম রাজার কাজে লাগে ততক্ষণই তা সত্য, শাশ্বত; কিন্তু যেই আচার্য অদীনপুণ্যকে শাস্ত্রের খোলস ছাড়তে দেখা গেল, তখনই বিতাড়নের ব্যবস্থা। আর তিথি-নক্ষত্র দরকার নেই। রাজ-অধিকার খাটালেই হবে।

নাটকের উপসংহারে 'দর্ভকের গোঁসাই' ও গুরুর বেশে দাদাঠাকুরের আবির্ভাব এবং অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ফেলায় অন্ত্যজ মানুষগুলিরই জয় হল, যারা লোহা গলিয়ে আকার দেয়, কাঠ কাটে, এক কথায় যারা শ্রমজীবী মানুষের প্রতিভূ।

গুরু অচলায়তনের তুলনায় সংহত, 'অভিনয়যোগ্য', গানের সংখ্যাও কমেছে। অভিনয়ের সুবিধার্থে আরও কমানো যেতে পারে। হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়গত ধর্মের বিরুদ্ধে নয়, সাধারণভাবেই অনুষ্ঠানশাসিত জীবনের নীরসতা, নিষ্ঠুরতা, অমানবীয় নীচতার চিত্র দেখানোই তাঁর লক্ষ্য। তার সমাধানের ইঙ্গিত আছে বলেই শিল্প হিসেবে এর মূল্য এবং গণনাট্যের প্রযোজনায় এর তাৎপর্য ইতিবাচক।

মুক্তধারা, রক্তকরবী ও রথের রশি নাট্যপ্রকরণে ভিন্ন হলেও কয়েকটি বিষয়ে ঐক্য আছে। 'যাত্রার আসরের মতো রঙ্গমঞ্চে পাত্রপাত্রীর আসা-যাওয়া।' অর্থাৎ তিনটিতেই রঙ্গমঞ্চের দর্শকগোষ্ঠীর সঙ্গে কুশীলবের দূরত্ব ঘোচানোর দিকে লেখক দৃষ্টি দিয়েছেন। ১৯৪১ সালের আনন্দবাজার শারদীয় সংখ্যাতে 'বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে শিশিরকুমার ভাদুড়ী লিখেছিলেন, 'প্রেক্ষাগৃহে অভিনেতা অভিনয় করবেন আর দর্শকরা কাঠগড়ায় আসামীর মতো বসে থাকবে, এর ভেতর ঘোর অসামঞ্জস্য আছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথম যিনি প্রথম রঙ্গমঞ্চে দর্শক ও মঞ্চের ভেতর ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছেন।' 'শেষরক্ষা'র অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথের যা ভালো লেগেছিল তা ব্যক্তিগত অভিনয় নৈপুণ্য নয়, 'থিয়েট্রিক্যাল ইন্‌টিমেসি।' তিনি বলেছিলেন, 'শিশিরবাবু মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত বাধা ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে থিয়েট্রিক্যাল ইন্‌টিমেসির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই শেষরক্ষা নাটকে।' এই মন্তব্যের মধ্যেই নাট্যপ্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বোঝা যায়।

মুক্তধারার একটি মাত্র অকুস্থল 'পথ'। এ বিষয়ে তাঁর নির্দেশ, 'উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে ভৈরবমন্দির চূড়ায় ত্রিশূল। পথের পাশে আমবাগানে রাজা রণজিতের শিবির।'

মুক্তধারায় এই একটিমাত্র মঞ্চনির্দেশই আছে। প্রয়োগের দিকটি কত সরল। গণনাট্য প্রযোজনার মূলনীতিই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ব্যয়ে সরল প্রয়োগকৌশল, সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তির মহিমা প্রতিষ্ঠা। শোষক শক্তির ঔদ্ধত্যের পরাভব। নাটকের প্রথমেই সাধারণ মানুষের কথোপকথন। মধ্যে সুমনের মা-র বুকভাঙা আর্তনাদ পীড়নমূলক সভ্যতার অন্তর্লীন চেহারাকেই ব্যক্ত করেছে। বটুক চরিত্রের পরিকল্পনাটিও সুন্দর। কেবল গণনাট্যের বক্তব্যের বিরোধী হল ধনঞ্জয় বৈরাগী। 'সত্যের আহ্বান', 'চরকা' প্রভৃতি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। কিন্তু ধনঞ্জয় চরিত্রে বাউলের নির্লিপ্তি, আত্মিক শক্তির উদ্বোধন এবং গান্ধীর আদর্শই স্থান পেয়েছে। 'দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত' —কবির এই ট্র্যাজেডি-তত্ত্ব অনুসারেই ঘরে-বাইরের অমূল্য, বিসর্জনের জয়সিংহ, মুক্তধারার অভিজিৎ, রক্তকরবীর রঞ্জন সেই দুঃখের মন্থনবেগ গ্রহণ করেছে। ঠাকুরদা, বিশু পাগল এবং ধনঞ্জয় রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় চরিত্র। ঠাকুরদা চরিত্রের জীবন-দর্শন কোনো নাটকেই জনবিরোধী হয়ে ওঠেনি। অচলায়তনের ঠাকুরদা তো পূর্বের নাটকগুলির ঠাকুরদা চরিত্রেরই বহুলাংশে বিবর্তিত রূপ। খেটে-খাওয়া মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়েই তার উপস্থিতি। বিশুপাগল যক্ষপুরীর পরিবেশে অপরিহার্য। কিন্তু ধনঞ্জয়ের মতো কেউই হেঁয়ালী-ভাবুক নয়। মূল সমস্যাকে সে এড়িয়ে গেছে। সেই সময় গান্ধীর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব সম্বন্ধে কবির গভীর মোহ ছিল। তার সঙ্গে বাউলপ্রীতি মিলে পরিত্রাণ, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি

নাটকেও এর পুনরাবির্ভাব। অনেকগুলি গান যোগ করার সুবিধাও বোধহয় তাঁকে এই শ্রেণীর চরিত্রসৃজনে উৎসাহী করেছিল।

সুতরাং মুক্তধারার নাট্যপ্রযোজনায় মূল বিষয়ের প্রতি মর্যাদা দেখাতে গেলে, পরবর্তী কালের রবীন্দ্র-রাষ্ট্রনীতি চিন্তার আলোকে ধনঞ্জয় বৈরাগীর ভূমিকা সঙ্কুচিত করে ফেলতে হয়। এবং তাঁর আন্তর্জাতিক ইতিহাস চেতনার সে-সঙ্কোচন রবীন্দ্র-অনুমোদিত বললেও অত্যুক্তি হয় না। তার ফলে অবশ্য মুক্তধারা যা আছে তা থাকবে না। কিন্তু তাতে দোষ কোথায়? রাজা ও রানীর সুমিত্রা যা ছিল তপতী'র সুমিত্রা তা নয়। উভয় রূপই নাট্যকার-অনুমোদিত। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কবিতা এবং আন্তর্জাতিক ঘটনায় তাঁর মানস প্রতিক্রিয়া মনে রাখলে নাট্যবক্তব্যে এ ধরনের 'মোটিফ' পরিবর্তন মোটেই অন্যায় নয়।

আপাতত এইটুকু বলে শেষ করি যে, এই আলোচনার মধ্যে 'বাউদলারাইজ' করার প্রবণতা নেই। গণনাট্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনার সমস্যাটিকে দেখার চেষ্টা হয়েছে। তাতে রবীন্দ্র-উত্তরাধিকারের বিস্তৃতি ঘটবে জনগণের মধ্যে। সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার সাধারণ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়াই প্রগতিশীল সংস্কৃতি কর্মীদের কর্তব্য। সে দিক থেকে রবীন্দ্রনাট্য-প্রযোজনায় কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। যদি জীবদ্দশাতেই তিনি নাট্য-প্রযোজকের প্রস্তাব অনুযায়ী গোড়ায় গলদ-কে শেষরক্ষা করে থাকেন, 'গোরা'র নরেশ মিত্র কৃত নাট্যরূপই (চিত্রনাট্য) অনুমোদন করেন তাহলে তাঁর নাটক প্রযোজনার তাৎপর্য অনুযায়ী অদল-বদল করলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের মাননীয় সদস্যদের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের যে-সব নাট্যাভিনয় হয়েছে, সেগুলির কোনোটিই রবীন্দ্রকৃত নয়। তাঁরা সে-সব অভিনয়ে মুগ্ধও হয়েছেন। যদিও বিশেষ বিদ্যায়তনের বা অন্য প্রতিষ্ঠানের অ-পেশাদার অভিনয়, তবু এই পরিবর্তন-রূপান্তর ব্যাপারে তাঁদের মনে কোনো নৈতিক বাধা ছিল না। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে রবীন্দ্রগল্পের এমন অজস্র নাট্যরূপ (রবীন্দ্রকৃত নয়) অভিনীত হতে দেখেছি। সুতরাং ন্যায়-সঙ্গতভাবেই গণনাট্যের মহৎ উদ্দেশ্যের কর্মসূচীর মধ্যে রবীন্দ্রনাট্যের প্রযোজনা বিশেষ স্থান অধিকার করতে পারে।

গল্পকার লু স্যুন

চীনীয় কথাশিল্পীদের মধ্যে এ দেশে মাও তুন এবং লু স্যুনের নাম সর্বাধিক পরিচিত। রচনাবৈচিত্র্যে এবং বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনায় লু স্যুনের স্থান সকলের উর্ধ্বে। চীনের গৌরবী ঐতিহ্যে আন্তরিক মগ্ন থেকেও 'ঐতিহ্যবাদী' রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত লেখনী ছিল ক্লান্তিহীন। সব বড় লেখকের মতো লু স্যুনও বিশেষ অর্থে চীনের এবং ব্যাপক অর্থে বিশ্বেরই জীবনশিল্পী। তাঁর সব রচনার ইংরেজি সংস্করণ আমাদের কাছে এখনও সহজপ্রাপ্য নয়। তবু অধিকাংশ প্রবন্ধ এবং কিছু গল্প এখন ইংরেজি রূপান্তরে পাওয়া যায়। এ কথা ঠিক, অনুবাদের মধ্যে মূলের রস অবিকৃত থাকে না এবং দুধের স্বাদ ঘোলে নেই; তবু পাঠকের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করার এই পথই প্রশস্ত।

বেইজিং থেকে প্রকাশিত আঠারোটি গল্পের সংগ্রহ, বুনো ঘাস, উন্মাদের রোজনামচা, পায়চারি, বিকেলে ভোরের ফুল, অবলম্বনেই আমরা গল্পকার লু স্যুনের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করব। পুরনো গল্পের নতুন বিবৃতি-সঙ্কলনটিও তাৎপর্যপূর্ণ।

'কোনো পাচকের তৈরি খাবারে কেউ দোষ ধরলে পাচক নিশ্চয় হাতের ছুরি-কাঁটা আর পাত্র দিয়ে তাকে বলবে না, চেষ্টা করে দেখুন না, কতটা ভালো করতে পারেন!' অর্থাৎ সমালোচকেরা লেখায় যা পাচ্ছেন তার আলোচনা করবেন, তার বাইরে যাবেন না। লু স্যুনের গল্প বিচারে তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করা উচিত।

লু স্যুনের গল্প সময়ের তাগিদে রচিত। অর্থাৎ বাস্তব-নিরপেক্ষ নান্দনিক প্রেরণায় তিনি কিছুই লেখেননি। তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহ 'যুদ্ধের ডাক'-এর ভূমিকা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত হতে পারে—

> আত্মপ্রকাশের কোনো প্রবল ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু একাকীত্বের দুঃখময় স্মৃতি আমি ভুলতে পারিনি। ভুলিনি সেই সব যোদ্ধাদের যারা একাকী হয়েও আবেগে দীপ্ত।…আমার এই যন্ত্রণার নিদর্শনগুলি বিষাদের, সাহসের, হাসির অথবা প্রতিরোধের —তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। 'ওষুধ' গল্পে পুত্রের কবরের ওপর শূন্য থেকে মালা ছুঁড়ে দিইনি।

> 'আগামীকাল' গল্পে চতুর্থ শানের স্ত্রীর ছোট ছেলের জন্য স্বপ্নের কথা বলেছি। নেতারা তখন হতাশাবাদের বিরুদ্ধে। আমি যে তিক্ত যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা আমি ছড়িয়ে দিতে চাইনি স্বপ্নালু তরুণদের মনে। আমিও যৌবনে স্বপ্ন দেখতাম।

গল্পকার লু স্থনের প্রেরণাভূমিকে পাওয়া গেল। এ-বার তাঁর গল্পের স্বাদ নেওয়া যেতে পারে।

'সুখী সংসার' নামে একটি গল্প লিখতে চেয়েছিলেন এক গল্পকার। নিজে দরিদ্র হলেও দারিদ্র্যের কান্না নিয়ে সাহিত্য আর ভালো লাগছিল না। একটি ছোট সুখী সংসারের এমন গল্প লিখবেন যা চীনে দুর্লভ, কিন্তু হলে ভালোই হত। নায়কের পড়ার এবং বসার ঘর খুব সুন্দর সাজানো। থরে থরে কাঁচের আলমারিতে নানা ধরনের বই। এক কপি 'আদর্শ স্বামী' বইও থাকবে। গল্পকার কি বইটি পড়েছেন? না, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকমণ্ডলী যখন প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন নিশ্চয় চীনের সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিত রচনা।

> স্বভাবতই স্বামী-স্ত্রীর সংসার। কর্তা আর গিন্নি। ভালোবেসে বিয়ে হয়েছে দু'জনের। স্বামী-স্ত্রীর সমতা ও অবাধ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া চল্লিশ পাতা বিয়ের চুক্তিপত্রের নীচে সই আছে। দু'জনেই উচ্চ-শিক্ষিত, রুচিশীল। জাপান থেকে শিক্ষালাভ করে ফেরা ছেলেদের ফ্যাশন আজকাল বেশ কমে গেছে। অতএব এরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাধারায় পুষ্ট। বাড়ির কর্তা ছেলেটি সব সময়ই সাদা কলার লাগানো এক জাতীয় বিদেশী স্যুট পরে থাকে। বউটির সামনের চুলগুলি চড়াইয়ের বাসার মতো সব সময় ভারি সুন্দর ভাবে কুঁকড়ে কপালের ওপর দোলে। মুক্তোর মতো সাদা সাদা দাঁতগুলো সর্বদা সামান্য স্মিত হাসির ছোঁয়াচ নিয়ে একটুখানি প্রকাশিত। মেয়েটির পরনে কিন্তু চীনে পোশাক…

নাটকীয়ভাবে এখানে কাহিনীতে ছেদ পড়েছে। কে যেন পঁচিশ ক্যাটিস চাইছে। লেখকের স্ত্রী চাইছেন দুশো পঞ্চাশ ক্যাটিস। লোকটা আসলে কাঠওয়ালা। জ্বালানির জন্য কাঠ দরকার। ক্যাটিস চাই। লেখক-গৃহিণীর তাগিদ। তিনি কোনো রকমে রফা করতে চান গৃহিণীর সঙ্গে। তাই মানিব্যাগ খুলে দুশো পঞ্চাশ ক্যাটিস দিলেন। এখন সুখী পরিবারের স্বপ্নে তিনি বিভোর। মাঝে মাঝে বিরক্তি। ঠিক হচ্ছে না। স্বচ্ছল পরিবারের ছবি ফুটছে না। অস্বস্তি।

> না, আমার গল্পের সংসারটায় বেশ কয়েকটা ঘর থাকা চাই। একটা আলাদা ভাঁড়ার ঘর তরি-তরকারি, শাক-সব্জি থাকবে। পড়ার ঘরটা থাকবে বেশ কিছুটা দূরে নিরিবিলিতে। সে-ঘরটায় কোনা আবর্জনা থাকবে না। দেওয়ালে সারি সারি সুদৃশ্য র‍্যাকে ঠাসা থাকবে অসংখ্য

> চীনা ও বিদেশী বই। ...এ ছাড়া চাই আলাদা একটা শোবার ঘর। তাতে থাকবে পেতলে মোড়া এলম্ কাঠের ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে একটা খাট। খাটের নীচেটা পরিষ্কার।

এরপরেই কাহিনীতে সেই অনবদ্য টুইস্ট—যাতে মধ্যবিত্ত চীনা পরিবারের বাস্তব অবস্থা এবং তার অভিজাত হয়ে-ওঠার স্বপ্নের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানটি হঠাৎ পাঠককে ধাক্কা দেয়। নিজের খাটের তলায় লেখকের চোখ পড়ে। সেখানে পুঞ্জিত ধুলো। জ্বালানি কাঠের সঞ্চয় নিঃশেষ। কাঠ বাঁধা খড়ের দড়িটা মরা সাপের মতো দেখাচ্ছে। লেখকেরও কর্তা-গিন্নির সংসার, একটি ছোট মেয়ে। মেয়েটি কাঁদে। লেখক ভাবেন, কার্ল মার্কস যখন ডাস ক্যাপিটাল লিখেছিলেন, তার পাশে ঠিক এমনি করে ছেলে মেয়েরা কাঁদতো সর্বক্ষণ। সত্যি তিনি মনীষী। কিন্তু গল্পকার শেষরক্ষা করতে পারলেন না। গল্পটি লেখা হল না। —দরাদরি করে গৃহিণী কাঠ কিনে শোবার ঘরে ঢোকালেন—ঐ একটিই তো ঘর! আর লেখক মিথ্যা সুখী পরিবারের গল্পের খসড়া ছিঁড়ে মেয়েটির কান্না ভেজা নাক-মুখ মোছালেন। (অনুবাদ: মিহির গৌতম/সারস্বত ১৯৫৪)

'একটি উন্মাদের রোজনামচা' লু স্যুনের প্রথম দিকের রচনা। অংশত রিপোর্টাজ-ধর্মী, অংশত আত্মজীবনীমূলক। গল্পের বাঁধুনি আল্‌গা হলেও ডায়েরির রীতি, বিশেষত পাগলের ডায়েরি বলায় অসম্বদ্ধতার দায় আর থাকে না।

> দুই ভাই। ছোট ভাইয়ের ধারণা মানুষ মানুষের মাংস খায়। তার প্রতি সকলের এত নজর কেন। আসলে সবাই তার শরীরের ওজন, তার মাংসের কথা ভাবে। কৌতূহলী চোখে সকলেরই লোভার্ত দৃষ্টি। সকলেই যেন মানুষখেকোর দলে। এদের হাত এড়িয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

স্পষ্টই Persecution Mania নিয়ে গল্পটি রচিত। মনস্তত্ত্ব এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র হিসেবে এই মানসিক রোগের বিকার-লক্ষণগুলি তাঁর জানা। কিন্তু গল্পটি নিছক মানসিক ব্যাধি সম্পর্কিত নয়। চাপা শ্লেষ ও ব্যঙ্গের আশ্রয়ে লেখক দেখেছেন তাঁর চারপাশের সমাজে যে শোষণ ও ঘৃণার পিরামিড-সৌধ, তাতে সবাই যেন মুখিয়ে আছে—কখন একজনকে গ্রাস করে আর একজন স্ফীত হয়ে উঠবে। রাজার দাবি সামন্তরাজাদের কাছে, তারা কর্মচারী মারফৎ লুঠে আনে প্রজার সম্পদ, দাবি না মেটালে বাসনপত্র জমি-জায়গা বন্ধক রেখে টাকা দেয়, সুদ-আসল মিটিয়ে কোনোদিনই বন্ধকী জিনিস সে ফেরৎ নিতে পারে না। এমন করেই জমিদার হয় মহাজন এবং মহাজনী থেকে জমিদারী আয় ও আয়তন বৃদ্ধি। দ্বিতীয় উল্লেখ্য রচনা আ-কিউ কাহিনীতেও আছে, মহাজন-জমিদার-খামারপতি চাও মশাই আ-কিউ-এর ছাড়া-জামাটাও ফেরৎ দেয়নি—তিনদফা কাজে লাগিয়েছিল।

পাগল ছোট ভাই ভাবছে—

> বুড়ো চেনও বেশ চড়া মেজাজ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল, কিন্তু কিছুতেই ও আমার কণ্ঠরোধ করতে পারল না। আমি চিৎকার করে উঠলাম —'বদলাতে তোমাদের হবেই। অন্তরের গভীরতম স্থল থেকে তোমাদের একটা আমূল পরিবর্তন দরকার। জেনে রেখো, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে মানুষখেকোদের জন্য কোনো জায়গা থাকবে না।
>
> 'যদি তোমরা নিজেদের না শোধরাও, একদিন তোমরা সবাই একে অন্যের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জানি, তোমাদের মতো অনেক মানুষ জন্মেছে। কিন্তু মনে রেখো, শিকারীরা যেভাবে নেকড়ে বাঘ বা ক্লেদাক্ত সাপ মারে, ঠিক তেমনি করে ভাবীকালের মানুষের মতো মানুষেরা তোমাদের পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলবে।'
>
> (অনুবাদ : মিহির গৌতম / সারস্বত)

এই ভাবনার পেছনে আছে জীবনশিল্পী লু স্যুনের নিজের ভাবনা—'পারসিকিউশন ম্যানিয়া' দিয়ে এই জীবনপ্রেমী পাগলের আর ব্যাখ্যা চলে না। গল্পটির পটভূমি উল্লেখ করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯০১ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত লু স্যুনের আত্ম-অন্বেষার পর্ব। রেল-খনি স্কুল থেকে কৃতী স্নাতক হয়ে লু স্যুন গেছেন জাপানে মেধাবৃত্তি নিয়ে। জাপানের চীনা ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা তখন ছড়িয়ে পড়েছে। লু স্যুন তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। তাঁর দেশাত্মবোধ ব্যক্তিগত সাফল্যের অন্তরায় হল। ইংরেজী-রুশ-জার্মান ভাষা শিখে ইতোমধ্যে তিনি বায়রন শেলী হাইনে পুশকিন লারমন্তভ প্রমুখের রচনা পড়েছেন ; কিছু অনুবাদও করেছেন। একটি চলচ্চিত্রে চীনা-নিপীড়ন এবং শিক্ষিত চীনাদের সেই দেশপ্রেমী সম্পর্কে বিরূপ কৌতূহল যেন তাঁর বিবেককে কশাহত করে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বাবার মতো বিনা চিকিৎসার মানুষদের সারিয়ে তুলতে ডাক্তার হওয়ার চেয়ে বড় কাজ দেশের অবস্থাটাকেই পাল্টানো। 'এ ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে সাহিত্য। তাই সাহিত্য-আন্দোলনকেই এগিয়ে নিয়ে যাব ঠিক করলাম।' ১৯০৮ সালে তিনি কুয়াঙ-ফু হুই বিপ্লবী দলের সদস্য হন। ১৯১১ সালের বিপ্লবকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানান শিক্ষক লু স্যুন। ১৯১২ সালের অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়েযুক্ত হন। চীনের পুরনো ঐতিহ্যে খোঁজ পেলেন বার্হস্পত্য দর্শনের মতো বস্তুবাদী চিন্তাবিদ ও কবি চি কাঙের। কনফুসিয়াসের অন্ধ অধ্যাত্মমোহের প্রতিষেধক রূপে লু স্যুন চি কাঙের কাব্যসঙ্কলন প্রকাশ করেন। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের খবর চীনে পৌঁছেছে। সারা দুনিয়ার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে জড়িত দেশপ্রেমিকরা নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পার্থক্য বুঝতে শিখেছে। ভারতের মতো চীনেরও অধিকাংশ বিপ্লবীরা পরে মার্কসবাদ অঙ্গীকার করেন। লু স্যুনও পথ চিনে নিতে দেরি করেননি! তাই মাও সে তুঙ বলেছেন, 'লু স্যুন

ভাবপ্রবণতা বা ভণ্ডামিকে প্রশ্রয় দিতেন না। জলের মধ্যে হাবুডুবু-খাওয়া জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পাগলা কুকুরগুলিকে এখনো ঠিকমতো পিটুনি দেওয়া হয়নি। অবশ্যই লু স্যুনের এই শিক্ষা গ্রহণ করে সারা দেশে আমাদের তা ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।' (অনুবাদ : সন্দীপ সেনগুপ্ত)

লেখকের এই মানসিক পটভূমিতেই 'উন্মাদের রোজনামচা' এবং 'আ-কিউ-র সত্য কাহিনী' বিচার্য। দ্বিতীয় রচনাটিকে বড় গল্প বলা যায়। লু স্যুনের অধিকাংশ গল্পের মতোই এ রচনারও আরম্ভ অত্যন্ত সাধারণভাবে এবং কাহিনীর অগ্রগতিও ধীর লয়ে। তারপরে ঈষৎ চাপা বিদ্রূপ ও সমালোচনার সূত্রে লেখকের সত্য-অন্বেষা অর্থাৎ তাঁর ভিতরের মানুষটি গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আ-কিউ একজন ঘরছাড়া মানুষ। পাগল বলে সকলের কাছে পরিহাসের পাত্র। কিন্তু তাকে যেহেতু শ্রমিক হিসেবে গাধার মতো খাটানো যেত, তাই সকলের কাছেই তার সমাদর —অন্তত আ-কিউ তাই মনে করত। কিন্তু আসলে সেটা তার শ্রমের সমাদর মাত্র। এই কাহিনীতে খুব সরস ভঙ্গিতে তির্যকভাবে সামন্তশাসণ, চীনের উচ্চমধ্যবিত্তদের বিপ্লব-বিরোধিতা, পরে সুযোগ বুঝে অংশগ্রহণ, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিবিপ্লবে পর্যবসান দেখানো হয়েছে। ১৯১১-র বিপ্লবের ব্যর্থতাই আ-কিউ কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য। আ-কিউ-এর মৃত্যুদৃশ্য অবশ্যই পরবর্তী তরুণ বিপ্লবীদের হৃদয়ে সমবেদনা সঞ্চার করেছিল। একটি যুগের ঐতিহাসিক সত্যই কথাশিল্পে বিধৃত হয়ে আছে। এখানেই গল্পটির সার্থকতা। যুগের বেদনাদীর্ণ ছবি হয়েও আ-কিউ কাহিনী যুগোত্তীর্ণ।

নববর্ষের বলি, সাবান, ওষুধ, ছোট্ট ঘটনা, অনুশোচনা, আশা, এমন যোদ্ধা, চায়ের পেয়ালায় তুফান, মানব বিদ্বেষী, পুরনো বাড়ি প্রভৃতি গল্পে এমন একজন শিল্পীকে পাই যিনি চীনের প্রথম তিন দশকের সার্থক রূপকার হয়েই সর্বদেশীয় শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর আসনে অধিষ্ঠিত। বিশেষ প্রাচ্য ভূখণ্ডের সুদীর্ঘ সামন্তশাসন, তার গ্রাম্যসমাজ, অশিক্ষা, কুসংস্কার, জনচেতনার অভাব, ধর্ম ও পরকালের ভয়, নারীপীড়ন ইত্যাদি যেহেতু একই সমাজব্যবস্থার পরিচয়বহ, তাই লু স্যুন প্রাচ্য ভূখণ্ডের কথাশিল্পীদের মধ্যে অবশ্য অগ্রগণ্যদের একজন।

'ওষুধ' গল্পটি ধরা যাক। একজন বৃদ্ধ চায়ের দোকানদার। দোকান সংলগ্ন ঘরেই একটি ছেলে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর বাস। খুবই অল্প আয়ের সংসার। ছেলে বাবাকে সাহায্য করে দোকানে। কিন্তু ছেলে চুয়ানের হল অসুখ, দুরারোগ্য অসুখ। সর্বদা কাশে, কাশির দমকে শরীর দুমড়ে বেঁকে যায়। ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের মতো। শেষ সম্বলটুকু নিয়ে এক দুর্জয় শীতের ভোরে বাপ গেল ওষুধ আনতে। পথে শান্তির প্রহরীরা সর্বস্ব লুটে নিল। কিন্তু ওষুধ সে পেয়েছিল। গাঁয়ের গুনিনের ওষুধ, কোনো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা নয়। মানুষের রক্তে ভেজানো রুটি। পাখি করে পাকানো।

চুয়ান বাঁচল না। তার কবরে মাটি দিতে গিয়ে চুয়ানের বুড়ি মা দেখতে পেল আর একজন বুড়ি মা-কে। সেও এসেছে ছেলের কবরে ভাত নিয়ে। দু'জনেই চোখে কম দেখে। তবু দেখল, ওদের কবরে অনেক লাল সাদা ফুল। কে বা কারা যেন দিয়েছে। ওরা ফিরে গেল বাড়ি। তখন রোদ উঠেছে। কাক ডাকছে।

লু স্থন মেজাজে স্পষ্টবক্তা লেখক। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে সে প্রমাণ সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু গল্পে প্রায়ই রূপকের আবরণ, প্রতীকের দ্যোতনা, সঙ্কেতের ব্যবহার আছে। আইনের ভয়েই হয়ত এই বক্রপথ তাঁকে বেছে নিতে হয়েছে। তাতে অবশ্যই সাহিত্যমূল্য আরও সার্থক, সুন্দর হয়েছে, বিশেষ রূপ পেয়েছে। ঐ ফুল কারা দিয়েছে? তরুণ বিপ্লবীরা। এর তাৎপর্য তোমাদের মতো মেহনতী মানুষদের বেঘোরে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেব না। আমরা শান্তি চাই। শ্মশানের শান্তি নয়। শান্তির জন্য সাদা ফুল, রক্ত দিয়ে শান্তি আনব, তাই লাল ফুল। সব চুয়ানের রোগের সেই হল মহৌষধ।

'অনুশোচনা' গল্পটি বিপ্লবীর আত্মসমীক্ষায় পূর্ণ; কিন্তু এখানে তিনি ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের সীমাকে যেন ছাড়াতে পেরেছেন। তাই অনুশোচনা নয়, আশাবাদেই গল্পের পরিণতি। জুয়ান শেঙ ভালোবেসেছিল শি-জুনকে। শি-জুন অন্তর থেকে সায় দিয়েছিল। দারিদ্র্যের চাপে জীর্ণ জুয়ান শেঙ, যার চালচুলো নেই, নেই মাথা গোঁজবার ঠাঁই, তাকে কে মেয়ে দেবে! সঙ্গত কারণেই শি-জুনের কাকা এ বিয়েতে অরাজী। কিন্তু লাজুক হলেও মনে মনে দৃঢ় শি-জুন কাকার কথা অমান্য করল। পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারও হারাল। তবু ছোট সংসার, সুখের সংসার গড়ে উঠল ছোট্ট ঘরে। জুয়ান শেঙের মনে ছিল কবিত্ব, যৌবনোচিত কিছু রোমান্টিকতা। সে আনত নানা রকম ফুল, আলোচনা করত ইবসেন, শেলী, রবীন্দ্রনাথের কথা। আর শি-জুন সংসারকেই সাজিয়ে তুলত কাব্যের মতো। কিন্তু সৎকর্মী হিসেবে কমিশনারের সঙ্গে তার বিরোধ বাধল। জনৈকার ক্রীম-ফেস পাউডারে এনামেল করা মুখের উস্কানি কমিশনারকে সক্রিয় করে তুলল জুয়ান শেঙের বিরুদ্ধে। তারই পরিণতি ভগ্নদূতের চিঠি— By the order of the Commissioner, Shi Juansheng is discharged.

—The Secretariat, October 9th.

স্বামী-স্ত্রীর মানসিক যন্ত্রণার একটি অন্তরঙ্গ আলেখ্য লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন—

I hesitated for a long time over the wording of the letter. When I stopped writing to think, and glanced at her in the dusky lamplight, she was looking very wistful again. I had never imagined a trifle like this could cause such a striking change in some one so firm and fearless as Zijun. She really

had grown much weaker lately ; this was not something that had just started that evening.

ভালোবাসা নিখাদ ; অথচ সুখের সংসার নয়। অভাব, অনটন, সমস্যা—নায়কের স্বপ্নের সৌধ ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে —গড়তে পারছে না। নায়িকা ঘর ছেড়েছে, কিন্তু ঘর বাঁধতে পারছে না —উভয়েই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। তারপর ঐ কমিশনারের চিঠি। বেকারের সংসারে উভয়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি কেবলই বাড়ে। এখানেও তাই। তবু জুয়ান শেঙ ভাবতে পারেনি, সত্যি শি-জুন চলে যাবে কাকার সঙ্গে। আবার তাকে সে দোষ দিতেও পারছে না।

এই বিষাদ ভালোবাসা উষ্ণতায় মনোরম, অথচ ব্যর্থতার গ্লানিতে মলিন। লু স্যুনের এই গল্পটি অনুভবী পাঠকের জন্য। তবে উপসংহারে দেখা যায় হতাশার মেঘের পাড়ে আলোর রূপোলি রেখা : I have nothing now but the early spring night which is still as long as ever. All I have is weeping like singing as I mourn for Zijun, burying her in oblivion. এখনও জুয়ান শেঙের আশা —নতুন করে জীবন শুরু করবে।

'বুনো ঘাস' রচনাসঙ্কলনকে লিপিকার সঙ্গে তুলনা করা যায়। 'লিপিকা' যেমন নিছক গদ্য কবিতার নিরীক্ষা নয় ; তোতা কাহিনী, ভুল স্বর্গের মতো গল্পে গভীরতর রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়, তেমনই 'বুনো ঘাস' লঘু সুরে গভীর কথার স্তবকগুচ্ছ। লেখক নিজেই পরে রচনাগুলির পটভূমি ব্যাখ্যায় বলেছেন : 'সেকালে হারানো প্রেমের বিষাদ নিয়ে কবিতা লেখার রেওয়াজ ছিল, তাকেই বিদ্রূপ করে লেখা 'আমার হারানো প্রেম', নিস্পৃহ দর্শকদের মনে রেখে লেখা 'প্রতিশোধ', তরুণ সমাজের নিষ্ক্রিয়তায় বিস্মিত হয়ে লিখি 'আশা'। যুদ্ধবাজ শক্তির লেজুড় বুদ্ধিজীবীদের কথা 'এমন একজন লড়াকু', সহৃদয় বন্ধুদের জন্য লেখা 'পোকাধরা পাতা', চীনের গৃহযুদ্ধের এক পর্যায় চিত্রিত 'জাগরণ' রচনায়—তখন আমার পক্ষে পিকিঙে থাকা সম্ভব হয়নি।'

বুদ্ধিজীবীরা কেমন লড়াকু? নিধিরাম সর্দারের মতো। তাদের মাথার ওপরে ঝুলছে কারুকাজ করা কত সুন্দর পতাকা, লেখন —শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত, লেখক, প্রবীণ, তরুণ, শিল্পরসিক ভদ্রলোক ; তলায় আছে বহু রকমের পোশাক —তাতে চিত্র-বিচিত্র করে লেখা : পাণ্ডিত্য, নীতিজ্ঞান, জাতীয় সংস্কৃতি, জনমত, যুক্তিবিদ্যা, ন্যায়বিচার, প্রাচ্যসভ্যতা··· ।

শত্রুপক্ষের একটি বর্শার খোঁচায় তারা মরছে নীরবে, রক্ত ঝরছে না। এইভাবেই তারা শূন্য হয়ে যাচ্ছে। —এই কাব্যধর্মী ছোট্ট লেখাটি মোটেই 'পোকাধরা পাতা' নয়। বিদ্রূপের ভিত্তি হল, এই বুদ্ধিজীবী সৈনিকের সকলেরই যথাস্থানে তাদের হৃদ্‌পিণ্ড আছে। কিন্তু বর্শার খোঁচা দিয়ে দেখা গেল, তারা মরল বিনা প্রতিবাদে। যথাস্থানে তাদের হৃদ্‌পিণ্ড নেই, থাকলে লড়াই হত, রক্ত ঝরত।

'কুকুরের জবাব' খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে উদ্ধৃত করা হল। অত্যন্ত ঝাঁঝালো retort—

স্বপ্নে দেখি : সরু গলি দিয়ে হেঁটে চলেছি
জামা কাপড় ছেঁড়া
ভিখিরির মতো।
পেছনে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল।
তার দিকে ফিরে ধিক্কারে চিৎকার করি—
'চুপ হতচ্ছাড়া, বেতমিজ কুত্তা!'
কুকুরটা বিচ্ছিরি শব্দ করল।
ও বলল, 'না, না, মানুষের মতো অতটা না।'
'কি?' —আমি ক্ষেপে উঠি, মানুষের এত বড় অপমান!
ও বলল, 'বলতে লজ্জা পাই
তামার সঙ্গে রূপোর, সিল্কের সঙ্গে সুতীর, ওপরওয়ালার সঙ্গে সাধারণের,
মনিবের সঙ্গে দাসের ইত্যাদি ইত্যাদির কি যে পার্থক্য আমি কি জানি না।'
আমি দৌড়ে পালালাম।
পেছন থেকে কুকুরটা তখনও বলছে, 'আর একটু দাঁড়াও, আরও দু চারটা কথা…'
আমি আর দাঁড়াই! দে-দৌড়!
দৌড়তেই স্বপ্নভঙ্গ। দেখি, বিছানাতেই আছি।

শ্লেষ খুবই স্পষ্ট। তবে এই স্বপ্নকণা গল্প বা কবিতা হিসেবে শিল্পোত্তীর্ণ।

'উন্মাদের রোজনামচা'র ছোট ভাই, আ-কিউ এবং কুঙ ই চি এক ধরনেরই চরিত্র। লু স্যুনের টাইপ। লোকে এদের ঠাট্টা করে, পাগল বলে, কিন্তু এরা এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এবং বিশেষত গুছিয়ে নেবার ধান্দায় মত্ত মধ্যবিত্তদের অবজ্ঞার শিকার। কুঙ ই চি লেখাপড়া জানে, বই পড়তে ভালোবাসে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোর ভবঘুরে পরিচয় নিয়ে সে জনারণ্যে হারিয়ে যায়, হয়ত মৃত্যু ঘটে। 'দারিদ্র্যের মধ্যেও সত্যিকার ভদ্রলোক চরিত্র খোয়ায় না' —এই বাণী সে মুখস্থ বলতে পারে, কিন্তু চরিত্র না-খুইয়ে বাঁচতে পারে না।

লু স্যুনের অনেক গল্পে হাসপাতালের, ওষুধের দোকানের বর্ণনা আছে—সেগুলো একই রকমের। তাই মনে হয়, নেহাৎই গল্পের প্রয়োজনে দায়সারা নয় এই বর্ণনাগুলি; অভিজ্ঞতার নিকষে তাঁর মনের গভীরে এগুলি দাগ কেটে রেখেছে। বিনা চিকিৎসায় বাবার মৃত্যুর দৃশ্য তাঁর অনেক গল্পে ছায়া ফেলেছে।

তাঁর গল্পগুলির সমকালীন যে অজস্র ছোট বড় প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে, সেগুলি একসঙ্গে পড়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী যেমন অনেক কবিতা, গল্প, অনেক ধ্যান-ধারণা ও অনুভবের নেপথ্য ইতিহাস ধারণ করে রেখেছে, তেমনি

লু স্থনের প্রবন্ধগুলি তাঁর সৃজনী সাহিত্যের সম্পূরক। উভয় শ্রেণীর রচনাই এক বিদগ্ধ এবং বিক্ষত হৃদয়ের উৎস থেকে উৎসারিত। চীনের জাতীয় পটভূমিতেই তাঁর গল্পগুচ্ছ এবং গল্পে বিধৃত চরিত্রগুলির আনাগোনা। যিনি এ সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ, তিনি অনেক সময় গল্পের শ্লেষটুকু, গল্পকারের সাহসটুকু স্বরূপে ধরতে পারেন না।

লু স্থনের গল্প বানানো কাহিনী নয়। শিল্পীর হাতের সামান্য একটু সংযোজন বর্জন। নতুবা তারা জীবন থেকে উঠে এসেছে মসিলিপ্ত কাগজের পৃষ্ঠায়। তাই কালির দাগের নীচে কোথাও জমে থাকে দারিদ্র্যের ক্লেদ, কোথাও ঘৃণা, কোথাও রক্ত।

'পায়চারি' (Wandering) গল্পসমষ্টি যখন লেখা হয়, তখন তিনি আময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে কর্মচ্যুত। পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি নানা হাসপাতালে নাম ভাঁড়িয়ে কিছুদিন করে থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

'আ-কিউ' রচনা সম্বন্ধে লু স্থন নিজেই বলেছেন, 'অনেক বছর ধরেই আ-কিউ আমার কল্পনায় আছে, তবে কখনও এমন ভাবিনি যে তার কাহিনী লিখব। মর্নিং নিউজ পত্রিকার সান ফু উয়ান আমাকে অনুরোধ করেন সপ্তাহে একটি করে লেখা দিতে 'হিউমার' কলমের জন্য। সে দিন সন্ধ্যাতেই লিখলুম 'ভূমিকা'। 'হিউমার' কলমের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে বেশ কিছু অবান্তর হাসি-মস্করা জুড়ে দিলাম যেগুলো আসল গল্পের সঙ্গে ঠিক মেলে না। বা-রেন —এই ছদ্মনামে লেখাটি বেরিয়েছিল।...'

লু স্থনের সাহিত্যচর্চা লু স্থনের জীবনসংগ্রামেরই অংশ। তিনি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন কি-না সেটা বড় কথা নয়। তাঁর সম্বন্ধে যা সত্যিকারের বড় কথা —তা যে-কোনো বড় লেখক সম্বন্ধেই সত্য।

লু স্থন চীনকে, চীনের শোষিত মেহনতী মানুষদের ভালোবেসেছিলেন। চীনের মানুষকে কুসংস্কার, কনফুসিয়াসবাদ ও সামন্তশোষণ থেকে মুক্ত করা ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। রাজনীতিক কর্তব্যকে তিনি সেই লক্ষ্যের সামিল করেছিলেন। ভয় এবং লোভের কাছে কখনও ধরা দেননি। স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা এবং জাত্যভিমানের পার্থক্য বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেতন ছিলেন। দেশকে শোষণমুক্ত করার সংগ্রামই তাঁর জীবন ও শিল্পের মূল প্রেরণা —তাই সৃজনী সাহিত্যের পাশাপাশি আছে সুবিপুল প্রবন্ধ সম্ভার —প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিজ্ঞার উচ্চারণ।

দুই হুজুগের কবি

রুশ কবি মায়াকভস্কি সম্বন্ধে অনেকে বলেন, তিনি বিপ্লবের উদ্দীপনা-উত্তেজনার যুগের প্রচার পুস্তিকা রচয়িতা, বিপ্লবোত্তর সমাজতান্ত্রিক যুগে তাঁর রচনার কাব্যমূল্য নগণ্য। পশ্চিমী সমালোচকরাও এ বিষয়ে একমত। 'সব লোকই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি।' কাব্যলক্ষ্মীর নির্বাচিত সেই কতিপয় সুজনমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেতে হলে সোচ্চার কণ্ঠে কিছু দাবি করা চলবে না, সমাজ-পরিবর্তনের জন্য উদ্যোগী হওয়া তো আরও অপরাধ। তবু মায়াকভস্কি রুশ দেশের সমাজেতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ। বিশ্বের ইতিহাসে সব চেয়ে বড় ভাঙনের সূচনা যে-দেশে যে-লগ্নে ঘটেছিল, মায়াকভস্কি সেই দেশের, সেই মহালগ্নের কবি। সঙ্গত কারণেই তিনি অব্যবহিত কর্তব্যে প্রাণমন অর্পণ করেছিলেন। তাই তিনি মুহূর্তের কবি, হুজুগের কবি।

আ-চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যে কোনো কালাপাহাড়ী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। মধুসূদন ও ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসকে কেউ কেউ বৈপ্লবিক অর্থে 'কালাপাহাড়' বলেছেন। কিন্তু সে অভিধা অলঙ্করণ মাত্র। মধুসূদন ঐতিহাসিক কারণেই সমকাল চেতনাকে পুরাণ-ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ছড়িয়ে ফেলেছেন ; গোবিন্দচন্দ্র দাসের বিদ্রোহ দেহাত্মবাদের সঙ্কীর্ণ জগতেই সীমিত। কিন্তু নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্র-সূর্যের পাশাপাশি একটি ব্যতিক্রমী সোচ্চার কণ্ঠ। তিনি বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে 'যুগান্তরের খড়্গপাণি'কে খুঁজেছেন। মায়াকভস্কির 'At the top of my voice' এবং নজরুলের 'বিদ্রোহী', 'আমার কৈফিয়ৎ' বিষয় ও প্রকরণ মূল্যে সদৃশ নয় ; তবু কোথায় একটি গভীর সাধর্ম্য আছে। নজরুলের সব কবিতাই 'At the top of my voice'-এ ভাব প্রকাশের চেষ্টা। দুই কবির কাব্যে এখানে আশ্চর্য রকম মিল।

নজরুল ও মায়াকভস্কি দু'জনেই অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তথাকথিত ভদ্রতার, বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্বের প্রচলিত মানদণ্ড দু'জনেই অস্বীকার করেছেন। উভয়ের কণ্ঠেই ভাঙার গান ; বিদ্রূপ, উচ্চকিত ঘোষণা। শান্ত ধীর মস্তিষ্কে আবেগের স্মৃতিচর্বণা তাঁরা করেননি। সে তো তপ্ত হৃদয়ের যথার্থ অনুভূতি নয়, আসলের প্রতিলিপি —অর্থাৎ নকল মুক্তোর মালা।

'পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে' —যে কবিমানস এই উক্তির সাহস জোগায়, সে শুধু শব্দমোহে মুগ্ধ কবি নয়, তার উদ্দাম জীবনবেগ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ তার কবিকৃত্যের সহায়ক। নতুবা এই পঙক্তি তো প্রগল্‌ভ আত্মঘোষণা। মায়াকভস্কির কাব্যে, ভাষণেও অনুরূপ 'পরোয়া করি না' ভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সভা-সমিতিতে ভাষণ দেওয়া, যুবসমাজকে উদ্দীপিত করা দু'জন কবিই কাব্য-প্রয়োজনের সম্পূরক মনে করেছেন। কারণ সমাজ পরিবর্তন উভয় কবিরই অন্বিষ্ট। নজরুল বলেছেন, 'যাঁরা ধ্বংসব্রতী —তাঁরা ভৃগুর মত বিদ্রোহী। তাঁরা বলেন, এ দুঃখ, এ বেদনার একটা কিনারা হোক। এর রিফর্ম হবে ইভো-লিউশন দিয়ে নয়, একেবারে রক্তমাখা রিভোলিউশন দিয়ে। এর খোল নলচে দুই বদলে একেবারে নতুন সৃষ্টি করব।' (নজরুল রচনাসম্ভার ; ১ম, পৃ. ১৫৮) মায়াকভস্কি প্রত্যক্ষভাবেই বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, পার্টির জন্য পোষ্টার লিখেছেন—

Hi, Listen !
    Comrade heirs and descendants,
    to an agitator,
    loud-speaker-in-chief !

*　　　*　　　*

Deafening
    Poetic deluge,
I stride to you
    through lyrical Volumes.
    as they live
    with the living speaks.

(At the top of my voice)

সত্যই জোর দিয়ে কবি শোনাতে চেয়েছেন বিপ্লবোত্তর সুন্দর জীবনকে পেতে হলে ভাঙনের পালা কত অপরিহার্য। গতানুগতিকের শব বহন করে চলেছে যে সমাজ—

Descendants
    in our lexicons,
        look up the flotsam
that floats down from the lethe,
odd Remnant words
    like 'Prostitution'
        'tuberculosis'
            'blockades'.

For you,
who're so healthy and nimble,
a poet
licked up
Consumptive spittle
with the crude rough tongue of placards.

নজরুলের স্বীকৃতি—

আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দনশ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর !
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহরা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরমবেদনা, বিষজ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত
বুকে গতিফের।

মায়াকভস্কি বলেছেন, 'The devil I care what they say !' সেই হুজুগে কবির মনোভাব ! নজরুলের সব কবিতাই পাঠককে ডেকে মনের কথা শোনানো ; নিদ্রিত, আধো-জাগা, কর্ম-ভীরুদের তিনি পরাধীনতা, অসাম্য, অসত্যের শৃঙ্খল ভাঙতে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর উদ্দীপিত ঘোষণা—

আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান।
মম চরণের তলে মরণের মার খেয়ে মরে ভগবান।

* * *

আদি ও অন্তহীন
আজ মনে পড়ে সেই দিন—
প্রথম যেদিন আপনার মাঝে আপনি জাগিনু আমি,
আর চিৎকার করি কাঁদিয়া উঠিল তোদের জগৎস্বামী।

রবীন্দ্রসমকালের এই উচ্চকণ্ঠ কবিকে কোনো সমালোচক উপেক্ষা করতে পারেননি। কেউ বলেছেন, 'শক্তির মূঢ় অপব্যয়', কেউ বলেছেন, 'তাঁর সমকাল-বন্দিত 'চীৎকৃত' কবিতাগুলি থাকবে না, মহাকালের কণ্ঠে যে গানের মালা তিনি দুলিয়ে দিয়েছেন, তাই অক্ষয় হয়ে থাকবে।' আবার কেউ বা আঙুল দিয়ে দেখান রাজনীতির দিকে, সে যে কত বড় শত্রু কবিতার, তার প্রমাণ কাজী নজরুল ইসলাম। বিশ-ত্রিশের দশকে বাংলা দেশ আন্দোলনে উত্তাল; অসহযোগ, চরকা, ইংরাজ-বিদ্বেষ, সন্ত্রাসবাদ, অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষক শক্তির জাগরণ; এই প্রেক্ষিতে নজরুল ইসলামের কবি ব্যক্তিত্বের বিকাশ। কিন্তু তাঁদের মতে, কাব্যে রাজনীতির প্রচার উদ্দীপক, উত্তেজক হয়ে ওঠে, অথচ উত্তেজনার আগুনে কাব্যের শক্তি নির্জীব হয়ে পড়ে। যে-ই অস্থিরতার কাল অতিক্রান্ত হয়, পাঠকের রুচির সঙ্গে কবির বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গির ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকে।

কিন্তু নিছক কাব্যকলাকুতূহলের প্রলোভনে আমরা ভুলে যাই, সমাজ-উৎক্রান্তির কালে সব জাগ্রত মানুষের মতো কবিরও একটা ভূমিকা আছে। নতুবা 'Conscription Army' কবি-সাহিত্যিক-অধ্যাপক-বুদ্ধিজীবীতে পূর্ণ হত না। রাষ্ট্র সাম্রাজ্যরক্ষার স্বার্থে যখন বাধ্যতামূলক ভার চাপায়, তখনই 'Conscription', যখন ক্ষুব্ধ বিবেকের তাড়নায় সাহিত্যের ভাষাশৈলী বদলায়, তখন হয় সন্ধিযুগের কাব্য। নজরুল ও মায়াকভস্কি সেই সন্ধিকালের কবি —তাঁরা জরা-মরাদের মৃত্যু এবং দুর্মদপ্রাণ নবীনের জন্য মুক্ত জীবনক্ষেত্র আকাঙ্ক্ষা করেছেন। দু'জনেই শঠতা, ভণ্ডামির শত্রু। মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে নজরুল—

যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামি ভাই করব সেথায় বিদ্রোহ!
ধামা-ধরা! জামা-ধরা! মরণ-ভীতু! চুপ রহো।
আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
এই দুলালুম বিজয় নিশান, মরতে আছি —মরব শেষ।
নরম গরম পচে গেছে আমরা নবীন চরমদল!
ডুবেছি না ডুবতে আছি, স্বর্গ কিম্বা পাতালতল!

মায়াকভস্কিও তাদের 'জোঁক', 'অকর্মণ্য' বলে গাল দিয়েছেন। উভয়ের কাব্য সম্পর্কে সমালোচকরা কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপন করেন। দুঃখের বিষয়, দুই কবির কাছ থেকেই তাঁদের বক্তব্য শোনার উপায় নেই। কারণ, মায়াকভস্কির মৃত্যুর অনেক পরে অভিযোগগুলি উঠেছে, আর নজরুল ইসলাম জীবন্মৃত ছিলেন দীর্ঘকাল। মায়াকভস্কির 'Bigness' এবং নজরুলের 'আমি' একই কবি-ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাবহ।

প্রকৃত কবি কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং বর্তমান পৃথিবীর সমাজব্যবস্থায় খুশী হতে পারেন না। মানবসমাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা তাঁকে সমাজ পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়। সেই শৃঙ্খলমুক্তির স্বপ্ন বৈপ্লবিক রোমান্টিকতায় রূপ নেয়। মায়াকভস্কি যেমন অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, নজরুল তেমনি বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম বিপ্লবের চারণ কবি। তিনি বাঙালী মধ্যবিত্তের চেতনায় ইণ্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের সুর সঞ্চার করেছেন। শ্রমিক-কৃষকদের হাতে দিয়েছেন কাস্তে-হাতুড়ীর গান। সাম্যবাদী, সর্বহারা, কৃষাণ, কুলি-মজুর প্রভৃতি শব্দ ও শব্দের অভিধার্থ বাংলা কাব্যে নজরুল ইসলামের সংযোজন। যেমন হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে তিনি সাংস্কৃতিক, অর্থনীতিক মিলনসূত্রে দেখেছেন, তেমনি কর্মী-সংগঠক রূপে কবি নিজেই ধরেছেন সম্পাদকীয় কলম ; 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'নবযুগ'-এ। কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে, ক্ষেত-মজুর সংগঠনে, ধীবর সম্মেলনে নজরুল ইসলাম সাগ্রহে যোগ দিয়েছেন, নতুন গানও লিখেছেন। বৈপ্লবিক রোমান্টিকতার স্বপ্ন আর বাস্তব কর্মযজ্ঞ একই জীবন দর্শনের অঙ্গীভূত।

তবু কবির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ সমালোচকদের কণ্ঠে বহুবার প্রচারিত হয়েছে, তিনি না-কি কাব্যের বিষয়-মহিমাকে নীচে নামিয়েছেন। মায়াকভস্কি সম্পর্কেও অনুরূপ অভিযোগ উঠেছিল। 'They say that Mayakovosky chose themes that were vulgar, too common, shallow, light in style, etc.' এ কথা ঠিক, সাধারণে যে-বিষয় ও ব্যক্তিদের কাব্যসংসারে প্রবেশ নিষিদ্ধ মনে করে, সেগুলিকেই বিনা দ্বিধায় এই দুই কবি কাব্যের দরবারে প্রাধান্য দিয়েছেন। বামপন্থী ঝোঁক এই দুই কবিকেই না-কি স্বধর্মচ্যুত করেছে, 'Earthly themes' দুই কবিরই প্রধান উপজীব্য।

আর একটি অভিযোগ কবিদের শব্দ-চেতনা নিয়ে (lowering lexicon)। কিছু অশালীন, এমন কি অশ্লীল গালি পর্যন্ত মায়াকভস্কির রচনাতে আছে; নজরুল কাব্যে বে-তমিজ, ভণ্ড, ধড়িবাজ, রক্তচোষা, লাথি মার ভাঙরে তালা, ছ' পাই, ন' পাই, ঢাক ঢাক আর গুড় গুড় প্রভৃতি শব্দ বাংলা কাব্যে একেবারে নতুন। সমাজের আভিজাত্যের চেয়ে বাংলা কাব্যের শব্দভাণ্ডারে আভিজাত্যের সংস্কার অনেক প্রবল। নজরুল সেই ধারা অনুসরণ করেননি, যেমন পুশকিন থেকে মায়াকভস্কির শব্দজগৎ একেবারে ভিন্ন। এই ভিন্ন প্রকৃতির শব্দচেতনায় মেহনতী মানুষের ব্যবহৃত শব্দের অন্তর্নিহিত শক্তি বিশেষ মূল্য পেয়েছে। পদ-বিন্যাস সম্পর্কেও সমালোচকদের আপত্তি আছে। মায়াকভস্কি ও নজরুল যে-ধরনের বাক্য-বন্ধ লিখেছেন, তার সঙ্গে সুবক্তার আবেগমথিত উক্তি, ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মানুষের খেদের ভাষার নৈকট্য অনেক বেশি। 'Heightened speech', ভাষার উন্নীত বা মার্জিত রূপ কাব্যে থাকা উচিত—এই সংস্কার আলোচ্য দুই কবি অগ্রাহ্য করেছেন।

ছন্দ বিষয়ে অভিযোগও সামান্য নয়। নজরুলের বিদ্রোহী, ঝড়, সৃষ্টি সুখের উল্লাস, প্রলয়োল্লাস প্রভৃতি কবিতায় ছন্দের ত্রুটি ছান্দসিকদের আহত করেছে। অনেক দলছুট অতিপর্ব ও পঙক্তি নজরুলের কবিতায় আছে। পঙক্তির অসমবিন্যাস প্রায়শঃই দেখা যায়। দীর্ঘ, ক্রমানুবৃত্ত চরণবিন্যাসও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর মধ্যে অনেকগুলি লক্ষণ মায়াকভস্কির ছন্দেও আছে। বিশেষত পল্লবায়িত চরণ দুই কবির ছন্দকেই প্রাণবেগ দান করেছে। রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দে (সমিল প্রবহমান পয়ার) বাণীচয়নের গাম্ভীর্য যথারীতি বর্তমান; অবশ্য পুনশ্চ, পত্রপুট বা সানাই, শ্যামলী-র কোনো কোনো কবিতায় একেবারে 'গৃহস্থালীর ভাষা' মৌখিক বাক্‌রীতিকে অনুসরণ করেই কাব্যে উপস্থিত। তবু বলাকার ছন্দ ও বিদ্রোহীর ছন্দ এক নয়। রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নজরুলের পয়ারে অনেক নিয়ম-ভাঙা রকমফের আছে। মায়াকভস্কির কবিতায় গদ্যপদ্যের ব্যবধান স্বল্প 'আবেগের প্রবহমানতা চরণকে দীর্ঘায়ত সোপানবৃত্ত করেছে। নজরুল প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, তাঁর অনেক কবিতাই গানের জন্য লেখা, সুরের বিন্যাসে নিয়ম-ভাঙার ফাঁকগুলি ঢাকা পড়ে

যায়। অন্য কবিতাগুলিও আবৃত্তির উপযোগী, বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গিতে আবৃত্তির মধ্যে তথাকথিত ছন্দের ত্রুটিগুলি অপ্রকট হয়ে পড়ে। লুনাচারস্কি বলেছেন, 'What are Mayakovosky's rhythms? Mayakovosky's rhythm is the rhythm of argument, the rhythm of an orator's appeal, the rhythm of industrial sounds, industrial production metres, and the rhythm of a March'—নজরুলের ছন্দ সম্পর্কেও অনেকাংশে এই অভিমত সত্য।

মায়াকভস্কির কবি-ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত ছিল। কবি নিজেও সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তাঁর একটি স্বীকৃতি থেকে জানা যায়, 'Do not ask me anything else about it. There my double was stronger than I, there he over-came me and did me in, and I feel that if I did not kill the metal Mayakovosky, he would probably go on living as a broken man'. নজরুলের কবিজীবনে ঠিক এই ধরনের ব্যক্তিত্বের সঙ্কট ছিল না। কিন্তু নজরুলের কবি জীবনেও সঙ্গতির অভাব, পরস্পরবিরোধী ভাবের আকর্ষণ দেখা গেছে। ধর্মের ভণ্ডামি, অসত্যের বেসাতিতে যিনি বারবার আঘাত করেছেন, মোল্লা-পুরুত যার কশাঘাতে জর্জরিত, তিনিই আবার শ্যামাসঙ্গীতে বিভোর হয়েছেন, আল্লার মহিমা গানে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাব্য-নাটক লিখেছেন। শিক্ষক বরদাকান্ত মজুমদারের কাছে তাঁর যোগাভ্যাসের কথা যদি সত্য হয়, তবে 'ফসলের ফরমান'-এর লেখক নজরুলকে আমরা কি হারিয়ে ফেলেছি? অর্থাৎ ব্যাধির কবলে লুপ্ত-চৈতন্য হবার পূর্বেই কি তাঁর অন্তর্জীবনে আত্মহননের পালা শুরু হয়েছিল?

কবির কাব্যঐতিহ্য বিচারে এ সব প্রশ্ন অবান্তর। আন্তরিক অনুভূতি মাত্রেরই কাব্যরূপায়ণ সম্ভব; আঙ্গিকচেতনার চেয়ে বড় কবিহৃদয়ে গণচেতনার স্বীকরণ। সেই স্বীকরণের শক্তিতেই মায়াকভস্কি ও নজরুল ইসলাম চিরকালের কবি। যেখানেই 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল', সেখানেই এই দুই কবির উজ্জ্বল উপস্থিতি অনুভব করা যায়। বিশেষত 'বর্তমানের কবি', অথচ দু'জনেই মূলত ভবিষ্যতের চারণ।

ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি

কাজী নজরুল ইসলামের কবি-ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্যে সুচিহ্নিত। তখন রবীন্দ্র প্রতিভা মধ্যাহ্নদীপ্তিতে ভাস্বর, অথচ আবির্ভাব মাত্রেই নজরুল বাঙালী পাঠকদের হৃদয় জয় করে নিলেন। অনেক জনপ্রিয় লেখকই সমকালের হাততালি কুড়িয়ে জীবনের অন্তিম প্রহরে লক্ষ্য করেন, পাঠক সমাজ তাঁকে ছাড়িয়ে অন্য পথে অগ্রসর। কিন্তু নজরুল সাময়িক জীবনের কবি-ভাষ্যকার হয়েও চিরকালের কবি। কারণ মানুষের বেদনার বহ্নিজ্বালাই তাঁর কাব্যে জীবিত। গভীর আবেগময় ভালোবাসাই সে জ্বালাকে তীব্রতর করেছে।

কিন্তু নজরুলের কবিতা হাতে নিয়ে মনে হয়, ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাব্যসংজ্ঞা সর্বাংশে সত্য নয়। আবেগের নির্জন স্মৃতিচর্বণাই কি কবিতার একতম উৎস? এ কথা ঠিক, নজরুলের সহানুভূতি, তীব্র বেদনাবোধ তাঁর কাব্যে এনে দিয়েছে প্রবল উষ্মা, উত্তেজনা কখনও বা ক্ষোভে ফেটে-পড়া মানুষের সমবেত কলরব। বাগ্মিতার সঙ্গে কবিতার প্রভেদচিহ্ন প্রায় লুপ্ত। তবু কবিতা কি Memorable Speech নয়?

আবেগের অব্যবহিত প্রকাশে হয়ত তীব্রতা, উদ্দামতা বেশি থাকে, অন্যায়ের প্রতিবাদে যে ক্রোধ, অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা তার কাব্যত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাহলে কাব্য পরিধিই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। নজরুল কাব্যের honest anger বাংলা কবিতায় নতুন ঐতিহ্য স্রষ্টা।

কাব্যনামেই নজরুলের কবি ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সরস শ্যামল বাংলা কাব্যে মরীচিকা মরুমায়া মরুশিখা আমদানি করেছেন। নজরুলের অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান-এ যে বিদ্রোহচেতনা, সর্বহারা, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দুতে তারই পরিণতি। ফণি-মনসা ও জিঞ্জিরে-ও সামাজিক অসাম্য অত্যাচারে পীড়িত নজরুল ইসলামের ক্রুদ্ধ আর্তস্বর শোনা যায়। নজরুল কাব্যে যদিও একাধিক সুর লভ্য, তবু আর্ত মানবতার বিদ্রোহের সুরটিই প্রধান। তাই 'শায়ক বেঁধা পাখি' নজরুল কবি-মানসের প্রতীক।

ওরে মানিক! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে—
'তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষপুটে ঢাকি'।

ওরে আমার কোমল-বুকে কাঁটা-বেঁধা পাখী !
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি ?

ঘন দুর্যোগের দিনে ধূলিলুণ্ঠিত একটি শায়ক-বেঁধা পাখির জন্য কবিচিত্ত মমতায় বিগলিত, তাঁর অন্তরে 'চিরকালের মা' অশ্রুবর্ষণে কাতর। এই সর্বব্যাপী সমবেদনাই নজরুলের কবিতাকে কখনও বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ, কখনও প্রতিবাদে মুখর, কখনও বা ক্রোধে উদ্দীপ্ত করেছে। তাই সমবেদনাসূত্রে তিনি আদিকবি বাল্মীকিরই যোগ্য উত্তরাধিকারী। 'আমার কৈফিয়ৎ' সমগ্র নজরুল কাব্যেরই যথার্থ প্রস্তাবনা। কেন তাঁর কাব্যে ললিত মধুরের অর্চনা নেই, কেন সংহত আবেগের চেয়ে উচ্ছ্বাস প্রবল, কেন তিনি বিদ্রূপে পরুষ, ক্রোধে তীক্ষ্ণ—তার পরিচয় এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে উৎকীর্ণ—

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না বড় বিষজ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া খেপিয়া গিয়াছি
তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা,
বড়ো কথা বড়ো ভাব আসে নাক' মাথায়, বন্ধু, বড়ো দুঃখে।
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

'যুগের হুজুগ' কেটে গেলে যদি সমালোচকের উন্নাসিক বিচারে তিনি অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য হন, তাহলেও খেদ নেই। তবু যারা মিথ্যার বেসাতি করে, স্বরাজের নামে চাঁদা নিয়ে পোড়াবার্তাকু আনতে চায়, তাদের ধৃষ্টতায় শঠতার রাজনীতিতে কবির ক্রুদ্ধ বিবেক গর্জে ওঠে। সেই ক্রোধ-ক্ষোভের জ্বালা হয়ত তাঁর কাব্যকলাকে রসের পরনির্বৃতিলোকে উত্তীর্ণ হতে দেয়নি, কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ কবিব্যক্তিত্বের সেই আর্তি, সেই সহৃদয় মুক্তিমন্ত্রোচ্চারণ—মুগ্ধ হয়ে শোনবার মতো।

দোহাই তোদের ! এবার তোরা সত্যি ক'রে সত্য বল্ !
ঢের দেখালি ঢাক্ ঢাক্ আর গুড়্ গুড়্ ঢের মিথ্যা ছল।
এবার তোরা সত্য বল্।

* * *

বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই !

রাজনীতির সঙ্গে কাব্যকলার এমন ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য তাঁর পূর্বে আর কোনো বাঙালী কবি স্থাপন করেননি। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ, বক্তৃতা এবং স্বদেশী গানগুলির কথা মনে রেখেও এ কথা বলা যায়। হিন্দুমেলা, বঙ্গভঙ্গ, রাখীবন্ধন, বক্সা দুর্গে বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা প্রভৃতি ঘটনা

অবিস্মরণীয়। 'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে', 'ওদের আঁখি যতই রক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই'— গানের অজস্র প্রবাহে রবীন্দ্রনাথের যুগসচেতন মনের পরিচয় আছে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের যুক্তিহীন আতিশয্য কবিকে পীড়িত করেছিল। তাই তিনি অত্যুৎসাহের রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নতুন যুগ পেল নতুন চারণকবিকে। সেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রভক্ত নজরুল বিশেষত স্বদেশী গানে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তাঁর 'এই শিকল পরা ছল, মোদের এ শিকল পরা ছল', 'নমো বাঙলা', 'চল্‌রে চপল তরুণ দল', 'জাগো দুস্তর পথে নবযাত্রী', 'বাজাও প্রভু ঘন বাজাও' —গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর', 'কারার ঐ লৌহকপাট', 'বল নাহি ভয় নাহি ভয়', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'ভারতভাগ্যবিধাতার বুকে গুরুলাঞ্ছনা পাষাণভার', 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ' প্রভৃতি গানে নজরুলের নিজস্ব দৃপ্তভঙ্গি ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পাই।

দুই

প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ তারুণ্যকে জয়পত্র দিয়েছেন 'সবুজের অভিযান' কবিতায়—

রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।

এই প্রমত্ত, জীবন্ত, প্রচণ্ড, অমর কাঁচাকে কবি দায়িত্ব দিয়েছেন— 'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে ভুলগুলি সব আনরে বাছা বাছা।' কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ-ঈপ্সিত সেই দুরন্ত প্রচণ্ড যৌবনশক্তির কবি। আমাদের ধর্মে, রাষ্ট্রিক চেতনায়, কাজে ও কথায় কত মিথ্যার বেসাতি, আত্মপ্রবঞ্চনা, কত ভুল বহুদিন ধরে সঞ্চিত হয়েছে, নজরুলের 'ধূমকেতু'র পুচ্ছতাড়নে সে-সব গ্লানির দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে, লেগেছে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়। সবুজের অভিযানের প্রত্যাশপূরণ নজরুলের দ্বারা সম্ভব, কবির এই বিশ্বাসের পরিচয় পাই ধূমকেতুর আশীর্বাদে—

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
প্রলয়ের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে রে বিজয়কেতন

'ধূমকেতু' পত্রিকা দীর্ঘদিন চলেনি। কিন্তু সেই বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে সে যে অন্ধকার দীর্ণ করে বিশ্বাসের অগ্নিসেতু রচনা করেছিল, তার পরিচয় 'রুদ্রমঙ্গল', 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থে বিধৃত আছে। সাংবাদিক ও কবি নজরুলের অম্বিষ্ট এক।

সাময়িক ঘটনাকে আশ্রয় করে তাঁর পূর্বে অনেকেই কবিতা লিখেছেন। বিশেষত স্মরণীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অবশ্য তাঁর সব কবিতা নজরুলের পূর্ববর্তী নয়। বঙ্গভঙ্গ পর্বে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন 'সন্ধিক্ষণ' হাতে নিয়ে। তারপর স্বর্গাদপি গরীয়সী, রাজা-কারিগর, দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা, নাগ-বাঘ প্রভৃতি কবিতায় তাঁর সমাজসচেতন কবিমানসের পরিচয় প্রস্ফুট। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যে অর্থে সাময়িকতার কবি, নজরুল কা'ব্যর সাময়িকতা সে-সূত্রে আলোচ্য নয়। কারণ বৈচিত্র্যপ্রিয় সত্যেন্দ্রনাথের জী'নে পরাধীনতার মর্মবেদনা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ এমন গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেনি, যার উৎস মুখে আবেগের প্রকাশ হয় আগ্নেয়, জ্বালাময়। সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিষয়ের কবিতাগুলি তাৎক্ষণিক passing phase মাত্র, তাই সর্বদা তিনি ভঙ্গুর ধ্বনিমোহে মুগ্ধ। তাঁর কবিমনের প্রকৃত মুক্তি ঘটেছে পাল্কীর গান, পিয়ানোর গানে, লাল-পরী, নীল পরী, সবুজ পরী, জর্দা পরীর জগতে। আর আর্ত মানুষের বেদনার জ্বালাই নজরুলের কাব্যপ্রেরণার উৎস। এই যন্ত্রণার সূচীমুখে সংবেদী কবিহৃদয় তাই প্রথাগতভাবে কল্পনার অমরাবতীতে বসে সৌন্দর্যস্বপ্ন দেখেনি। যেখানে 'জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ', স্বরাজের নামে 'কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধার গ্রাস' অপহৃত হয়, যেখানে ভীত মধ্যপন্থী স্ববিরোধে অস্থির, সেখানে নজরুলের মতো বিদ্রোহী কবির কাব্যে প্রচণ্ড উষ্মা, ক্রোধ ও ব্যঙ্গই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি কখনোই সুস্থবুদ্ধি খুইয়ে বসেননি। এরও পেছনে সক্রিয় তাঁর সকল মানুষের সঙ্গে সমান আত্মীয়তা। ১৯২৬-এর দাঙ্গায় যখন অনেকে বিচার-বিবেচনা হারিয়ে বিমূঢ়, তখন নজরুল সেই অশুভ সংঘাতের গর্ভেই মহান্ প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করেছেন—

> মাভৈঃ মাভৈঃ, এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
> সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান।
> 'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, অর্জুন ছোঁড়ে বাণ।
> জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান।

যে-লাঠি মন্দির মসজিদ ভাঙতে উদ্যত, তাতেই অচিরে 'শত্রুদুর্গ গুঁড়া' হবে। চরম বিপদের দিনেও কবির সুস্থ অনসূয় বুদ্ধি 'বিজয় কেতন' উড়িয়েছে। 'ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন স্বর্ণলঙ্কা পুড়া।' 'রবীন্দ্রনাথ জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ' করেননি, তাঁর পক্ষে চিত্তরাজ্যে 'বুদ্ধির স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা করা সহজ। অশিক্ষিতপটু গ্রাম্য বালকের হঠাৎ শহরে-আসা, যুদ্ধে যোগদান এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কবিতাচর্চায় সুস্থ বিবেকের নির্দেশ মান্য করা—সত্যি বিস্ময়কর। ঈশ্বর গুপ্ত-সুলভ স্ববিরোধী ভাবনার দ্বন্দ্বই বরং প্রত্যাশিত ছিল। কালীর নামে গীতা হাতে নিয়ে হিন্দুর স্বদেশোদ্ধার ব্রতে মুসলিম কবি যোগ না-ও দিতে পারেন, খিলাফতের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ায় ইসলাম-শক্তির নবজাগরণে যে সাম্প্রদায়িকতার সূত্র

ছিল, তার মধ্যে নজরুল ইসলামের জড়িয়ে-পড়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মৃত্তিকানিষ্ঠ বাস্তব জীবনবোধের অধিকারী রূপেই তিনি জেনেছিলেন, মানুষের মুক্তি ধর্মের মধ্যে নেই।

তিন

অনেকে বলেন, নজরুল পরাধীন ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের চারণকবি মাত্র। চারণকবি মুকুন্দদাসের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির মিলটুকুও লক্ষণীয়। দু'জনেই পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ, দু'জনের কাছেই কালী পরাধীন জাতিকে শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার সহায়ক, নজরুলের 'জাতির নামে বজ্জাতি সব' এবং 'ঘোর্ রে আমার সাধের চরকা ঘোর্' গান দুটি মুকুন্দদাস তাঁর নাটকে যোগ করেন। এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও নজরুল ইসলামের কবিতা ভিন্নতর নিরিখে বিচার্য। যিনি বাঙালীর জন্য আন্তর্জাতিক সঙ্গীত (অন্তরন্যাশনাল সংহতিরে) রচনা করেন, দাঙ্গার আত্মক্ষয়ী অন্ধকারে যিনি মৃত শহীদের নামে প্রশ্ন করেন, 'আজি পরীক্ষা জাতির, অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ', বৃটেনের শ্রমিক ধর্মঘট (১৯২৬) যাঁকে বিশ্বশ্রমিকচেতনায় উদ্দীপিত করে, তিনি অবশ্যই সজ্ঞানত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কবি। 'লাঙল' সম্পাদনা, কৃষক-প্রজা-মজুর দলের সংগঠন, সাম্যবাদের আদর্শ কবি নজরুলকে বেদনা-নিরসনের মন্ত্র দিল। 'সর্বহারা' সেই শৃঙ্খলমুক্তির কবিতা-সঙ্কলন।

কিন্তু যে-কবি 'জাহান্নমের আগুনে' বসেও 'পুষ্পের হাসি' হাসেন, 'অশ্রুপাথার হিমপারাবার পারায়ে', 'কুজ্ঝটিকার ঘোমটা-পরা' দিগন্তরে দাঁড়ানো পৌষের ছবি আঁকেন, কিংবা যাঁর মন-মৌমাছি 'ঘাসের ফুলে মটরশুঁটির ক্ষেতে' মগ্ন হয়ে দেখে —'কাশ বনে কে শ্বাস ফেলে যায়, বাব্‌লা ফুলে নাকছাবি তার, গায় শাড়ি নীল অপরাজিতার' —তাঁর শান্ত সুকুমার সৌন্দর্য আস্বাদনের শক্তিতে সন্দেহ করবে কে? কেন তার সৌন্দর্যস্বর্গ ভেঙে গেল? তার উত্তর আছে 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' কবিতায়—

> পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি? মুক্তভারতী ভারতে কই?
> আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক, সত্য বলিলে বন্দী হই,
> অত্যাচারিত হইয়া যেখানে বলিতে পারি না অত্যাচার,
> যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী সহিছে বিচার চেড়ীর মার।

সে জন্যই কবিকণ্ঠ সঙ্গীতহারা, অপমানিত বিবেকের কশাঘাতে জর্জর। 'কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি, বাণীর কমল খাটিবে জেল।' নজরুল কখনোই একান্তভাবে নেতিবাচনের শিল্পী নন। তিনি 'নবসৃষ্টির মহানন্দে' অধীন বিশ্বকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন। তিনি শুধু ভাঙার গান লেখেননি। শোষণ-পীড়নমুক্ত মানবসমাজের যে জ্যোতির্ময় স্বপ্ন নজরুল দেখেছিলেন, বাস্তব পরিবেশ ছিল তার

সম্পূর্ণ বিপরীত। চোখের সামনে ব্যাপ্ত দারিদ্র্য শোষণ অপমান গ্লানির ক্লিন্ন সংসার। তাই সাইক্লোন, ঘূর্ণি, প্রলয় হয়েছে কবিচিত্তের উপমান। তিনি 'যত অপমানিতের মরম বেদনা'র রূপকার; তাই 'বিশ্ব তোরণে মানব বিজয় বৈজয়ন্তীকেতন' প্রতিষ্ঠা তাঁর কাব্যসাধনার পরম লক্ষ্য।

'লাথি মার, ভাঙ্‌রে তালা', চালা হাতুড়ি শাবল চালা 'বিধির বিধান ভাঙিয়াছি আমি এমনি শক্তিমান' কবিতার উদ্ধত মনোভাব এবং কালাপাহাড়, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর, নাদির শা, গজনী মামুদ তাঁর প্রার্থিত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও নজরুল কাব্য স্বধর্মভ্রষ্ট নয়। 'নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে' এই নামগুলি প্রথাবিরোধী দুর্মদ প্রাণশক্তির প্রতীকে রূপান্তরিত। সুন্দরের এই অপমান দেখেই কবি যুগান্তরের খড়্গপাণিকে আহ্বান জানিয়েছেন। বাস্তবজীবনের বিকার বারে বারেই তাঁর সুন্দর বোধকে পীড়িত করেছে—

আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ।
স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের।...
দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশি
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?

তবু কখনও তাঁর অন্তরে সুন্দরের ধ্যান হারিয়ে যায়নি, কখনও জীবনযুদ্ধে দারিদ্র্য অনটনের অন্তরায়ের কাছে, জঠরের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। কবি আগামী কালের পদধ্বনি শুনেছেন, 'সিক্ত যাদের সারা দেহমন মাটির মমতা বসে, এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরই বশে।' তাই 'জীবন বন্দনা' স্বভাবতঃই মেহনতী মানুষের বন্দনায় আরব্ধ—

গাহি তাদের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক কঠিন যাদের নির্দয় মুঠিতলে
ত্রস্তা ধরণী নজরাণা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।

যুগাবতার, মহাদেবতা, মহারুদ্র, কালীয়দমন, তুরীয়ানন্দ, আত্মশক্তি প্রভৃতি শব্দ অধ্যাত্মবিশ্বাসীর কাছে সুপরিচিত। এই ধরনের শব্দপ্রয়োগ এবং বহুতর পৌরাণিক উপমা, রূপক উল্লেখ নজরুল কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তবু কবি প্রচলিত অর্থে মিস্টিক বা অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না। আপন অন্তরাবেগের কাব্য সৌন্দর্যমণ্ডিত রূপ দিতে গিয়ে কবি পুরাণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন মাত্র। এখানে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর কবি স্বভাবের ঐক্যটি স্মরণীয়। অবশ্য পার্থক্যও সুস্পষ্ট। হিন্দু

ধর্মানুগত না হলেও মধুসূদন অদৃষ্টবাদী, অধ্যাত্মবিশ্বাসী কবি ; নজরুল ইসলাম সর্বদা 'আত্মশক্তি' উদ্বোধনে আগ্রহী—

আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনেছি আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !

'সোঽহং'তত্ত্ব নয়, পুরুষকার-আমিই কবির অনিষ্ট। পরমার্থবাদীর আত্মানং বিদ্ধির সঙ্গে শাব্দিক সাদৃশ্য মাত্র আছে। তাই মোহিতলালের 'আমি' প্রবন্ধের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার নৈকট্য যত বেশি, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে ভাবের দূরত্ব ঠিক ততখানি।

যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের কাব্যেও ধর্মের ভণ্ডামি, সমাজের দুর্নীতি প্রথার জগদ্দল পাথরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে, কিন্তু কেউ সমাজের আমূল পরিবর্তন বা সমাজবিপ্লব কামনা করেননি। নজরুলের দৃষ্টি মেহনতী মানুষের জাগরণের দিকে সাগ্রহে নিবদ্ধ ছিল। তাই কৃষক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায় ও কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠকদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল। আদি পিতা ভগবানের দরবারে 'ফরিয়াদ' জানানো নিষ্ফল, তাই 'জয়জনগণ উত্থান জয় নব-অভিযান' ধ্রুবপদে কবিতার উপসংহার। নজরুল ইসলাম প্রচলিত অর্থে উত্তম অধীতি কবি নন ; বিদ্যায়তনের পরিধি থেকে বিশেষ জ্ঞানের আলো তিনি পাননি। তবু বিপ্লবের মধ্যেই যে কালান্তরের সূচনা এবং কেবল সেই পথেই 'অনশনবন্দী' লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির সঙ্কেত, নজরুলের কবিতায় তার দৃঢ়প্রত্যয় উৎকীর্ণ। পরবর্তীকালের অনেক বাঙালী কবিই মেহনতী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামকে কবিতায় স্থান দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই কমবেশি নজরুল ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাসের কবিতায় নজরুল ইসলামের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যদিও নজরুল শেষ পর্যন্ত অপর্যাপ্ত প্রতিশ্রুতির, উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিশিষ্ট কবি, তবু বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি ও সহজাত কবিত্বগুণে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি তিনিই দ্বিতীয় কবি-ব্যক্তিত্ব, যাঁর সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান-ব্যবধান সামান্য নয়।

বাঁকা চোখে জীবন : জগদীশ গুপ্তর গল্প

জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ধারণা এই যে, তিনি শরৎচন্দ্র ও কল্লোল কালি-কলম গোষ্ঠীর সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করেছিলেন, ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন এবং জোলা-পন্থী ন্যাচারালিজমের লেখক হিসেবে তিনি বাংলা সাহিত্যে ক্ষণকালের জন্য আলোড়ন সৃষ্টি করেই হারিয়ে গেছেন।

এ বিষয়ে মতান্তরও অল্প নয়।

নিছক নেতিবাচনের কথাশিল্পীর সামনে মুক্তির পথ খোলা থাকে না বলেই তিনি নিজের সংশয়-কাম-অস্তিত্বের যন্ত্রণা-জলন্ত কুম্ভীপাকে কেবলই ঘুরে মরেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যাঁর কলমে অত তেজ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশ ভাগ, দাঙ্গা, স্বাধীনতা, আশাভঙ্গ, নতুন স্বপ্ন ইত্যাদি পটপরিবর্তনে (১৯৫৭ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন) তাঁর কলমে কালি শুকোল কেন ? মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন, বসুমতী সংস্করণের সঙ্কলক জানিয়েছেন, 'লেখা এখন ছেড়ে দিন। এ বয়সে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, কিন্তু সৃষ্টিশক্তি কমে।' —এ ব্যাখ্যা মোটেই সন্তোষজনক নয়। কারণ দৃষ্টিশক্তি পরিণত হলে লেখার ধরন বদলাতে পারে মাত্র। লেখা বন্ধ হবে কেন ?

জীবনের পক্ষে যেমন জল হাওয়া আলো, তেমনি লেখকের পক্ষে লেখা। না হলেই তাঁর জীবন ব্যর্থ, না লিখে তিনি পারেন না। তাই তো জরার হাতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েও কোনো জীবনশিল্পী তাঁর রচনার স্বক্ষেত্র ত্যাগ করতে চান না। পাঠক তাঁকে পছন্দ করুক বা না করুক।

এ মতের বিপরীতে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণা উদ্ধৃত হতে পারে : 'জগদীশ গুপ্ত বলেছেন কিছুতেই বাঁচা যায় না, কেন না সেই অন্ধ শক্তি প্রবলতর ও ভয়ঙ্কর —তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর উপন্যাসে টুকি কিংবা কিশোরীকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারে, যেখানে কোনোখান থেকেই আলো এসে পড়ে না… ।'

গল্পের আলোচনা থেকেই আমরা গল্পকারের নিজের জগৎ, তাঁর মনের জগতে পৌছাতে চেষ্টা করব। শ্রীযুক্ত সুবীর রায়চৌধুরী 'জগদীশ গুপ্তর গল্প' নামে একটি সুন্দর সঙ্কলন প্রকাশ করে তাঁর রচনার সঙ্গে এ কালের পাঠকদের পরিচিত হবার

সুযোগ করে দিয়েছেন। বসুমতীর এক খণ্ড সুলভ সংস্করণে ঔপন্যাসিক জগদীশ গুপ্তর আংশিক পরিচয় সুলভ হলেও গল্পগ্রন্থগুলি অধুনা প্রায় দুষ্প্রাপ্য।

'জগদীশ গুপ্তর গল্প' মাত্র বারোটি গল্পের সঙ্কলন। সংখ্যার বিচারে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু লেখকের রচনাবৈশিষ্ট্য বা তাঁর বিশ্বাসের জগৎ বিশ্লেষণের পক্ষে এই নির্বাচিত সংখ্যাই যথেষ্ট—অন্তত জগদীশ গুপ্তর ক্ষেত্রে। সাকুল্যে তিনি ৭০/৭২টি গল্প লিখেছিলেন মাত্র।

জগদীশের রচনার সংখ্যাল্পতা থেকে দুটি জিনিস অনুমান করা যেতে পারে। এক, তাঁর দেখার জগৎ ছিল সীমিত, রচনার শক্তিও সামান্য। দুই, জীবনকে দেখার এবং দেখানোর কাজ বহুকাল ধরেই চলে আসছে। 'পূর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্র ওঠে,' 'বন্যায় বাড়িঘর ভাসিয়া যায়'—এই ধরনের কথা না-লেখার প্রতিজ্ঞা এবং যেভাবে জীবনকে দেখানো হয়েছে এতাবৎকাল, সেভাবে না লেখার প্রতিজ্ঞা; সত্যের অদেখা চেহারার সঙ্গে পরিচয় করানো—এই ছিল তাঁর সচেতন অঙ্গীকার। জগদীশ গুপ্তর লেখা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অনিলবরণ নরেশচন্দ্র প্রেমেন্দ্র তারাশঙ্কর অশোক গুহ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক, একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, জগদীশ বাংলা গল্প উপন্যাসের বাঁধা খাতে চলবার মানুষ নন।

এখানে একটি পুরনো তর্ক উঠতে পারে। সাহিত্যে আদর্শবাদ বনাম বাস্তববাদ। সাহিত্যের অনেক তর্কের মতোই এ তর্কেরও এমন কোনো জবাব নেই যাতে সবাই তৃপ্ত হতে পারে। যা সমাজকল্যাণকর এবং ন্যায় অন্যায়ের উচিত আদর্শে সুন্দর, সাহিত্যিক তাই দেখাবেন, অথবা আলোর পেছনে ছায়া, ত্যাগের পাশে ছলনা, উদারতার পাশে শঠতা, নীচতার কথাও বলবেন? বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য আছে—কিন্তু সকলেই শ্রেয় সত্যের কারবারী, সকলেই ইতিবাচক মূল্যবোধকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। যদি ইতিবাচনের পক্ষপাত এতদিন চলে থাকে, তাহলে নেতিবাচনের আংশিকতায় দোষ কোথায়? জগদীশ গুপ্ত এই প্রশ্নগুলি নিয়ে কিভাবে বিচলিত হয়েছিলেন, তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন তাঁর ডায়েরি বা চিঠিপত্রে থাকা সম্ভব। শুনেছি সেগুলি তাঁর পরিবারে রক্ষিত আছে, এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু গল্প থেকেই প্রশ্নগুলির পরোক্ষ এবং শ্রেষ্ঠ উত্তর মিলবে—কেন তিনি নেতিবাচনের শিল্পী হয়ে উঠলেন।

প্রথম গল্পগ্রন্থ 'বিনোদিনী'-র 'পয়োমুখম', 'ভরাসুখে', 'দিবসের শেষে'-র কথাই ধরা যাক। 'পয়োমুখম' নামেই প্রমাণ মিষ্টিমুখের মানুষটি আসলে বিষকুম্ভ অর্থাৎ কবিরাজ কৃষ্ণকান্ত সেনশর্মা কবিভূষণ। তিনি নিজে শাস্ত্রজ্ঞ তাই গুরুবর্গের কাছে অবজ্ঞাত, মেধাহীন, পুত্র ভূতনাথের শিক্ষার ভার তিনি নিজেই নিয়েছেন। কলাপ শেষ করে ধরিয়েছেন মুগ্ধবোধ। কৃষ্ণকান্ত জানেন, 'ছেলের বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত বলদ দিয়ে টানাতে হবে'। গৃহিণী মাতঙ্গিনীর সঙ্গে এ বিষয়ে ঠাট্টা-তামাশাও করেছেন। কিন্তু ভূতনাথ যোগ্য হলে যত টাকা উপার্জন করতে পারত, পিতা কৃষ্ণকান্ত অপূর্ব

বুদ্ধিবলে ছেলের মাধ্যমে তার চেয়ে কিছু বেশি সংগ্রহ করছিলেন। উপায়টা সহজ, কিন্তু একান্ত গোপন। গৃহিণী মাতঙ্গিনীকেও বলা যায় না। ভূতনাথের প্রথম বিবাহ সতেরো বছরে, স্ত্রী মণিমালিকা—কলেরায় মৃত্যু। দ্বিতীয় বিবাহ বছরখানেক পরে, স্ত্রী অনুপমা—কলেরায় মৃত্যু। তৃতীয় বিবাহ—স্ত্রী বীণাপাণি—মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে ভূতনাথের সম্বিৎ। মধ্যে কিছু গৌণ বিষয় আছে। গল্পের জাল বিস্তারের পক্ষে যেগুলি অপরিহার্য; মাতঙ্গিনীর সরলতা, অনুপমার সরস চাতুর্য, বীণাপাণির আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য। ভূতনাথ নির্বোধ হতে পারে, কিন্তু পিশাচ পিতার আচরণ তাকেও বিচলিত করেছে। তাকে জাগিয়ে তুলেছে। খেলার সামগ্রী মণিকে হারিয়ে যে কষ্ট, তাকে হয়ত ভোলা যায়। কিন্তু 'সম্মুখে হাসির মুক্তধারা/উদ্ভিন্ন নিটোল যৌবন/মুক্তামালার মত দন্তপাঁতি/আরক্ত গণ্ডতট/ফুল্ল অধরপুট'—এই যে অনুপমা, এ যে যৌবনের আলোকলতা, জীবনেরই রূপোজ্জ্বল প্রতিমা। জগদীশ গুপ্ত না-কি অতিমাত্রায় ফ্রয়েডীয়। ইদানীংকালে সমরেশীয় দেহ-বিকার-চিত্তবিকারের পর্নো-বাস্তবতায় তাঁর রুচি ছিল না। অন্ধকার দিক থেকে হেঁটে তিনি সত্যেরই একটা পর্যায়ে পৌঁছাতে চেয়েছেন। তিনি সত্যসন্ধানী কথাশিল্পী। তাই অনুপমার ভরা যৌবনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে সম্ভোগীর লালসার বদলে প্রধান হয়ে উঠেছে সৌন্দর্যমুগ্ধের রূপচেতনা এবং স্মৃতিবেদনা—

'অনুপমার নিরুপম রূপ-দীপালির চতুর্দিকে যৌবনের যে রাস-আয়োজন দিন-দিন অপর্যাপ্ত নিবিড় হইয়া উঠিতেছিল, তাহারই আবেদন তাহার বুকে-রক্ত দুর্নিবার জাগরণ আনিয়া দিয়া গেছে।...অনুপমার সমস্ত অকারণ নির্মমতা অতৃপ্ত তৃষ্ণার খরতাপে বাষ্প হইয়া দেখিতে-দেখিতে ভূতনাথের মনোরাজ্য হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইতো।...চক্ষুর সম্মুখে জ্বলিতে থাকিতো তার দেহখানা—ইন্দ্রজালের আলোকোৎসবের মতো রূপ, আর চির-বিলসিত বসন্তের কুসুমোৎসবের মতো যৌবন...তাহাদের অভাবে ভূতনাথের ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের দিগন্ত পর্যন্ত একেবারে রুক্ষ শুষ্ক কর্কশ হইয়া গেছে।'

ভূতনাথের দিক থেকে গল্প এখানেও শেষ হতে পারত। সে হত দুই নারীর স্বভাব ও বয়সের প্রতিতুলনায় ভূতনাথের যৌবনে পদক্ষেপের গল্প। কিন্তু লেখকের গল্প ভূতনাথের বাবা কৃষ্ণকান্তকে নিয়ে। তাই তৃতীয় পুত্রবধূ বীণাপাণির আবির্ভাব। ছেলের শ্বশুরবাড়িকে মোচড় দিয়ে নানা অছিলায় টাকা আদায় করা ছিল কৃষ্ণকান্তের কৌশল। কিন্তু তাঁর মুখের মিষ্টি কথায় কারও সন্দেহ হত না। তৃতীয়ার সময়ে ভূতনাথ অনেক সচেতন। একই পদ্ধতিতে দুই বৌ মরেছে। অসুস্থ বীণা যখন প্রায় সুস্থ তখন কেন গোপনে ওষুধ দিতে এসেছেন শ্বশুরমশাই? সন্দেহ বীণার নয়, ভূতনাথের। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরীসৃপ' গল্পের চারু ও পরীর কথা মনে পড়বে। সেখানে ফল ঈপ্সার বিপরীত, এখানে কৃষ্ণকান্ত শুধু ধরা পড়ে গেছেন।

তুলনায় 'দিবসের শেষে' রচনা হিসেবে অপরিণত। তবে এখানেও লেখক বাঁকা চোখে জীবনকে দেখেছেন। মৃত্যুরূপা নিয়তি সর্বদা যেন অন্ধকারে ওঁত পেতে আছে। অনিলবরণ রায় প্রকৃতির এই শক্তিকেই বলেছেন 'শয়তানী শক্তি'। গল্পটিতে সেই শক্তির নিষ্ঠুর অপ্রতিরোধ্য লীলা দেখানো হয়েছে।

মৃতবৎসা নারাণী রতি নাপিতের স্ত্রী। পরপর তিনিটি পুত্রের মৃত্যুর পরে পাঁচুর জন্ম। সুতরাং সে মায়ের নয়নের মণি। 'দেবতার নির্মাল্য ও প্রসাদ একসময় কমজোর হইয়া পড়িতেও পারে—তাই পাঁচু চোখের আড়াল হইলেই নারাণীর মনে হয় পাঁচু বুঝি নাই।' এ হেন পাঁচু রাত্রিতে হয়ত স্বপ্ন দেখেছিল, তাকে কুমিরে খাবে। কেন তার এ ধারণা হল, সে বলতে পারেনি। রতি নাপিত যথাসময়ে ছেলেকে কামদা নদীতে স্নান করিয়ে এনেছে। দিনের শেষে দামাল ছেলের হাতমুখ থেকে কাঁঠালের আঠা ধুইয়ে আনার সময় পাঁচু হঠাৎ তার ঘটটা আনতে ভুলে গেল। ঘট আনতে গিয়েই নিয়তির সঙ্গে দেখা—তাকে কুমিরে নিয়ে গেল। দৈবের নির্বন্ধ নিয়ে গল্প? না, এত সহজের জন্য জগদীশ গুপ্তের কলম নয়। বাপ-মা'র স্নেহের সব আয়োজন সত্ত্বেও এবং বাপেরই চোখের সামনে শান্ত কামদা নদীতে হঠাৎ কুমিরের মুখে অসহায় বালকের নিষ্ঠুর মৃত্যু পাঠকের অনুভবে একটা প্রবল ধাক্কা দেয়। যে শয়তানী শক্তি নারাণীকে আগেও তিনবার পুত্র দিয়ে কেড়ে নিয়েছে, এ যেন তারই নির্মম আনন্দ! সুতোয় খেলিয়ে মাছ ধরবার মতো কিছুদিন আনন্দ দিয়ে আবার কেড়ে নেওয়া—নিরানন্দের অন্ধকার থেকে আলোয় এনে আবার নীরন্ধ্র শোকের অন্ধকারে নিক্ষেপ। জগদীশ বাঁকা চোখেই জীবনকে দেখেছেন; তাঁর নজর যেখানে পড়ে সেখানেই সত্যের অসুস্থ মূর্তি, শান্ত প্রকৃতির আড়ালে নিষ্ঠুর নখরদংষ্ট্রা, ভালোবাসার শান্তি, স্নেহের মাধুর্য, কৃতজ্ঞতা, ত্যাগ এ সব—ক্ষণপ্রভার আলো—দপ করে জ্বলেই নিভে যায়—'বাড়ায় মাত্র আঁধার রে।'

'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে অভিনব। এখানেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ঈষৎ তির্যক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ছায়া' গল্প মনে পড়বে। জ্যোৎস্নায় প্রতীক্ষমাণা ঝি-র ছায়াকেই স্ত্রীর মূর্তি মনে করে স্বামীর বিভোর হওয়া, তার সঙ্গে দেহাতীত মিলনের আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ভাবালুতা সত্যই 'মধ্যবিত্তের নোংরা রোমান্টিকতা'। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি গল্পের যুবক তরুণী সুন্দরীর বৈধব্যের শুভ্রতা দেখে মুগ্ধ হয়, প্রেমের সফলতায় যখন তারা পরিণীত হল এবং তরুণীটি সালঙ্কারা চেলি পরা বেশে সানন্দে যুবকটিকে সম্ভাষণ করল, দেখা গেল যুবকটি আহত। কারণ বৈধব্যের সেই শুভ্র ম্লান সৌন্দর্য তো নেই। শশাঙ্ক কবিরাজের বন্ধুরা কমবেশি এই পর্যায়ের বিশেষত সতীশের ওপরই লেখকের ফোকাস। নিমন্ত্রণের দিন এক ঝলক মাত্র সে শশাঙ্কের স্ত্রীকে দেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছে, এ নারী সংসারের নয়, এ মানসসুন্দরী। সতীশের ধারণা

'এ নারী রাঁধে না, খাওয়ায় না, শয্যা রচনা করে না, মালা গাঁথে না, বাতায়নে বসে না, এ কেবল মানুষকে রসিক করিয়া তোলে ……এ নিকটে নাই, কিন্তু ঘিরিয়া আছে।' লেখকের মানসিকতা যতই অ্যান্টি-রোমান্টিক হোক, স্বভাব কবিত্ব গল্পের গদ্যকেও মনোরম করে তোলে —এও মনোরমকে বিদ্রূপ। আবার সতীশের চোখ দিয়ে শশাঙ্কর বউকে দেখা যাক।

'…অয়ি অনাবিষ্কৃতা এবং বহুবন্দিতা, তুমি একদিকে চিন্ময়ী অপরদিকে তীব্র চেতনাময়ী …তুমি নিত্যাভিসারিকা, তুমি বহু উপভোগ্যা, কিন্তু অনুচ্ছিষ্টা… অতএব তুমি এসো …বৃদ্ধ বাল্মীকি তোমাকে যে-রূপে পাইয়াছিলো, তোমার যে রূপের তরঙ্গ চির-উত্তাল, সেই রূপে তুমি আমার যৌবনের দুয়ারে অতিথি হইয়া এসো।' —কার সম্বন্ধে এই বর্ণনা? তিনি সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা, দ্বিতীয় পক্ষের বৌ এবং ছ'ফুট লম্বা —সাড়ে চার ফুট চওড়া শোবার ঘর আর্থিক অস্বাচ্ছল্যেরই ইঙ্গিতবহ। গল্পের স্বার্থে এই ইঙ্গিতটুকু যথেষ্ট। সবই সাধারণ, তাই শেষ সংবাদটিও সাধারণ। শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী মা হতে চলেছে। এই সংবাদেই সতীশের মন 'কামনার মোক্ষধাম অলকা' থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। পরিণামের মোচড়টুকুই জগদীশ গুপ্ত।

'চন্দ্র-সূর্য যতো দিন' একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ গল্প। এখানে বাঁকা চোখের বক্র দৃষ্টি নেই, আছে বাস্তবের নির্মোহ পর্যবেক্ষণ —অনেকটা মানিক গোত্রের. নারীর আত্মমর্যাদা তার একান্ত স্বামী নিষ্ঠাকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'মধ্যবর্তিনী', জগদীশ গুপ্ত সমস্যাকে আরও ঘোরালো করে দেখেছেন। বাঙালী ঘরের সুসন্তান মাত্রেই 'পিতার আদেশ শিরোধার্য' করে এবং 'জননীর অনুমতিক্রমে' বিয়ে করে। দীনতারণ তার বাপ-পিতামহের মতোই দু'বার বিয়ে করেছে। কিন্তু দীনতারণ সুবিবেচক, তাই সংসারের শৃঙ্খলা নষ্ট হতে দেয়নি। শ্বশুরমশায় 'স্বরূপচন্দ্রের সম্পত্তি যেন কথা কয়', সুতরাং সেটি তো বিভক্ত হতে দেওয়া ভালো নয়। স্বরূপচন্দ্রের দুই কন্যা —ক্ষণপ্রভা ও প্রফুল্লময়ী। ক্ষণপ্রভা দীনতারণের প্রথমা স্ত্রী, শিশু পুত্রও একটি আছে। তবু প্রফুল্ল বিবাহযোগ্যা এবং বিনা পণের সুপাত্র দীনতারণ আছে —তাই সম্পত্তি ও কুল দুই রক্ষা পেল। দীনতারণ শালী প্রফুল্লকেও বিয়ে করলেন। এখান থেকেই গল্পের সূচনা। লেখক যেন দীন-তারণের মায়ের সঙ্গে একাত্ম। তাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। জগদীশের উদ্দেশ্য ক্ষণপ্রভার মানসিক প্রতিক্রিয়া দেখানো। মনঃসমীক্ষণের কয়েকটি মুহূর্ত এমন স্বচ্ছন্দ বর্ণনায় ফুটে উঠেছে যা কেবল শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর কলমেই সম্ভব।

(১) ক্ষণপ্রভা মনে-মনে স্বামীর দিকে চায়—
আবার মনে-মনে নিজের দিকে চায়—

(২) সন্তান গর্ভে আসিতেই স্বামীর সঙ্গে যে একাত্মতার নিবিড়তম অচ্ছেদ্য বন্ধন অনুভব করিয়া তাহার অন্তর প্লাবিত করিয়া অনন্তসুন্দর সুখের ঢেউ

বহিতেছিল, সেই বন্ধন বোধটা হঠাৎ দুর্বল হইয়া তাহাকে যেন দুস্তর শূন্যের মাঝে বৃন্তচ্যুত নিরালম্ব করিয়া দিলো। সে বেদনার সীমা নাই।

(৩) প্রফুল্ল টিপ পরে, চুল বাঁধে —স্বামীর মনোরঞ্জনের অভিলাষটি যেন তার সর্বাঙ্গ দিয়া উপছিয়া পড়ে —ক্ষণপ্রভা শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে— দেখিতে-দেখিতে একদিন বুক দুরুদুরু করিয়া অকস্মাৎ উদ্ভূত একটা অতিশয় শঙ্কিত মমতায় ক্ষণপ্রভা বিগলিত বিহ্বল হইয়া প্রফুল্লকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলো। (আগের অনুচ্ছেদেই আছে, অন্ধকারে কাঁটার বেড়ার কথা।)

(৪) প্রফুল্লর প্রসাধনের দিকে নিঃস্পৃহ চক্ষে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ক্ষণপ্রভার মনে হইল, ইহার অদৃষ্টও তো তাহারই মতো ; ঊর্ণনাভের তন্তুকেই এ-ও প্রেমের বন্ধন বলিয়া ভুল করিতেছে ; ভোগের কেবলি বর্ধিষ্ণু ক্ষুধার মুখে আহার তুলিয়া দিয়া এ-ও মনে করিতেছে জীবনের চরিতার্থতার কিছু বাকি রহিলো না। কিন্তু যেদিন আত্মার ক্ষুধার দাবি মিটাইবার দিন আসিবে —সে-দাবি যখন আর কোনো কথা কানে তুলিতে চাহিবে না —তখনই মায়াবী এই স্বপ্নপুরীর চিহ্নও রহিবে না··· দেখিতে হইবে, সব শূন্য , পৃথিবী শবের মতো অসাড় , ···'

ক্ষণপ্রভার শিশু অঙ্কুরকে খুবই ভালোবাসে প্রফুল্ল, আদর করে ঘুম পাড়ায়। কিন্তু দীনতারণের মনের কথাটি বুঝেছে ক্ষণপ্রভা। 'স্বামী তাহাকে তাহার পুত্রসহ চাহেন নাই —উহারই গর্ভের সন্তানটিকে কামনা করিয়াছেন।' খুবই নিরাবরণ মনের গোপন দরজা-জানালা খোলার ছবি। স্ত্রীর চোখে স্বামীর এই নিছক জৈব বাসনার স্থূল রূপ প্রত্যক্ষ করে প্রভার জননী-সত্তা মনে মনে বিরূপ হয়ে ওঠে। তারপর ছোট বোন এবং সতীন প্রফুল্লর রসিকতা। সমস্ত ব্যাপারটা নোংরা মাছির ভন্‌ভনানির মতো ঘৃণা ধিক্কার জাগাল। শাশুড়ী সুভদ্রার নির্দেশ তার কাছে আর এক মৃত্যুদণ্ড। অনিচ্ছায় বহুকষ্টে যার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল সে 'কেবল একটি মাংসপিণ্ড —যেমন কদর্য তেমনি লোলুপ ; তার মাংসাশী দেহটা যেন সর্বাঙ্গ দিয়া হা করিয়া আছে। মন দিয়া ঐ দেহ স্পর্শ করা সে যেন স্মরণাতীত কোনো যুগে পরিত্যাগ করিয়াছে।' এর চেয়ে কঠিন ধাক্কা, নারীর ব্যক্তিগত জীবনের চরমতম গ্লানির মুহূর্ত অপেক্ষা করছিল ক্ষণপ্রভার জন্য। লেখক সংযত শালীনতার সঙ্গে সত্যের রূঢ়তম চেহারাকে তুলে ধরেছেন— 'কিন্তু দেবতা তার প্রাপ্য অর্ঘ্য আদায় না করিয়া ছাড়িলো না।' তারই মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ক্ষণপ্রভা নগ্নিকা উন্মাদিনী, কিন্তু 'ছেলেটি বুকে আছেই।' চন্দ্র-সূর্য যতদিন, ততদিন নারীর এ আত্মাভিমান থাকবে —গল্প শেষের এই ফলশ্রুতি যেমন শরৎচন্দ্রীয় ভাব জগতের, তেমনি গল্পের বিবৃতিশৈলী এবং ক্ষণপ্রভা ও সুভদ্রার দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই শরৎ ব্যতিক্রমী অর্থাৎ জগদীশের নিজের উপলব্ধির জগতে উত্তরণ।

'আদিকথার একটি' 'elemental passion'-এর গল্প। জগদীশ তারাশঙ্করের প্রতিবেশী ; তবু দু'জনের বীরভূম দুটি ভিন্ন ভূখণ্ড। কারণ বীরভূমের তান্ত্রিকতা, শাক্ত সাধনা কথাশিল্পী তারাশঙ্করকে একটি বিশেষ বীরাচারী নিস্পৃহতা দিয়েছে। জগদীশের কোথায় যেন একটু বৈষ্ণবীয় মমতা, স্নিগ্ধ করুণার লেশ রয়ে গেছে। তাই টুকি এবং টুকির মায়ের কথা একটি রূপকাশ্রয়ে ঢাকা পড়েছে—গতিহারা জাহ্নবী, জাহ্নবীর জলে গ্লানি অর্শায়, মালিন্যমুক্তির ব্যঞ্জনা, অন্যদিকে 'গতিহারা' বিশেষণে মা ও মেয়ের ব্যর্থতার অনবদ্য প্রকাশ ; সঙ্গে সঙ্গে সমাজের রীতি সংস্কারের অজঙ্গমতাকে লেখক ইঙ্গিত শায়কে বিদ্ধ করেছেন।

কাঞ্চন বিধবা ; তার প্রতি সুবলের আকর্ষণ তীব্র। কাঞ্চনের পাঁচ বছরের মেয়ে খুশিকে বিয়ে করল তেইশ বছরের সুবল। খুশির টানে তার দিকে এগোতেই হবে কাঞ্চনকে—তাহলেই সুবল অভিলাষ পূরণের সুযোগ পাবে। কাঞ্চন বুঝেছে সুবলের কৌশল, 'সে নিজেকে সর্বতোভাবে আগলাতে চেয়েছে। কিন্তু দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।' কাঞ্চনের কি ক্ষমতা সে রহস্য ভেদ করে। অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া, শেষ পর্যন্ত জৈবতার মূল্যকে এড়াতে না পারা। উপসংহারের বামনদাস অধিকার, শরৎচন্দ্রের বেণী ঘোষাল, জনার্দন রায় অথবা বঙ্কিমের বমানন্দ স্বামীরই আত্মীয়।

একটি অতি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঞ্চন আর সুবল। পূর্ব মুহূর্তে ঘুমন্ত সুবল আর খুশিকে দেখে এসেছে কাঞ্চন। 'পুরুষত্বের পূর্ণ বিকাশে সর্বদেহের অসাধারণ তেজপ্রাচুর্যে একজন যেন পৃথিবীর সমস্ত মর্মহীন রসহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া এখন শুধু সর্বব্যাপী ক্লান্তিতে ভারাক্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহার পাশে পড়িয়া আছে একটি অতিশয় শিশু।' কোমর ব্যথার ছলনায় কাঞ্চনের সেবা সান্নিধ্য পেয়েছে সে, হাত ধরতে গিয়েই লাঞ্ছিত হয়েছে। সুবলের অকপট উক্তি, 'কিন্তু আমার অপরাধটা কি ?' লেখকের মনোবিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিকের মতো বস্তুনিষ্ঠ, অথচ ভাষায় কবিত্বের মণ্ডন। জগদীশের বর্ণনার এই বৈশিষ্ট্য অন্যত্রও চোখে পড়ে। তিনি বলেছেন, 'সুবলের অন্তরভূমি কাঞ্চনের চোখের সামনে যেন প্রসারিত হইয়া দেখা দিলো ; সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলো, বহুদিনের সঞ্চিত ইচ্ছা খলতায় ছলনায় পরিপূর্ণ হইয়া শামুকের মতো ধীরে ধীরে বুকে হাঁটিয়া অগ্রসর হইয়া হঠাৎ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।' কাঞ্চনের 'গায়ে কাঁটা' ভয়, 'ভগবান আমাকে বাঁচাও' প্রার্থনা এবং পরিশেষে সুবলের ক্লিন্ন রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন করা খুবই বাস্তব মনস্তত্ত্বসম্মত। গোটা ব্যাপারটাই শরৎচন্দ্রীয় ছকে স্থাপিত। তবু চাষীর ঘরে এই সুবল কাঞ্চনের আবিষ্কার এবং তাদের মর্মে তিনিই প্রথম আলো ফেলেছেন। পাড়ার পিসী-চরিত্রটি জগদীশের নয়, বাংলা কথাসাহিত্যের পুরনো চরিত্র। এটি বর্জন করলেও বামনদাস গল্পে আসতে পারতেন নিজের দাপটেই (জুজু নামেই তার প্রমাণ)।

জগদীশের ন্যাচারালিজম ফরাসী ন্যাচারালিজমের মতো তিক্ত, ভোগসর্বস্ব, অতি বিদ্রোহী নয়। এ সত্যটি তিনি কখনও ভোলেননি যে, কাঞ্চন যুবতী হলেও জননী।

'…খুশি যেন ছাগশিশু, করালীর তৃষ্ণার আগুন তাহার জীবন-মুকুলটি লক্ষ্য করিয়া অহরহ জিহ্বা দুলাইতেছে।

'কাঞ্চন হঠাৎ শিহরিয়া চোখ বোজে। চোখ বুজিয়া নিজের দিকে চায়; ত্যাখে, দিকচিহ্নহীন অসীম প্রান্তর, তার কোথাও শব্দ নাই, কুয়াশা নাই, শৈত্য নাই, গতি নাই, প্রখর সূর্যকিরণ তাহার মধ্যস্থলে একটি মরীচিকার স্বচ্ছ সরোবর সৃষ্টি করিয়াছে।

'সর্বদেহ কাঁপিয়া রোমাঞ্চ জাগে। চোখ খুলিয়া বলিয়া ওঠে, 'চল্ খুশি বেড়িয়ে আসি।' বলিয়া খুশিকে পুরোভাগে লইয়া কাঞ্চন পল্লীর পথে পথভ্রান্তের মতো চলিতে থাকে।'

গল্পটি এখানেই শেষ হতে পারত; অন্তত হওয়া উচিত ছিল। পাড়ার পিসী আর বামনদাসের ভূমিকা লেখকের অভীষ্ট সত্যের দিক থেকে অপরিহার্য ছিল না। ছিঁচকে সুবলের পশুত্ব অথবা আত্মদমনে কাঞ্চনের শীর্ণতাও নতুন কোনো বক্তব্যে পৌছাতে পারেনি।

'অরূপের রাস' আর একটি বিশিষ্ট গল্প। গল্পের প্লট সামান্য। রানু ও কানুর কৈশোর প্রেমের অনুবৃত্তি কেমন ভরা যৌবনে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করল, অথচ কোথাও কোনো স্থূলতা বা গ্রাম্যতা ধরা পড়ল না।

রানুর বয়স যখন সাত, কানুর তখন চৌদ্দ। রানুর বিয়ের সম্বন্ধ হল। বরপক্ষ এলেন। কানু হাজির। পায়েস খাওয়ার প্রতীকী ব্যঞ্জনা গল্পের পরবর্তী অংশে তাৎপর্যে অন্বিত হয়েছে। কানুর লেখা বিয়ের পদ্য ছিঁড়ে উনুনে দেওয়াতেও রানুর সজাগ দেহ-মনের পরিচয় আছে।

অনেকদিন পরে রানুর স্বামী বসন্তবাবু বদলি হয়ে এলেন সেই গ্রামে। কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে খুব ভাব। আবার বদলি। এক রাত্রির মতো দুই সখীর সহবাস। লেখক ইঙ্গিতে জানিয়েছেন, 'ইন্দিরার অঙ্গ হইতে আমার স্পর্শ মুছিয়া লইয়া সে ত্বক রক্তপূর্ণ করিয়া গেছে। …আমি তৃপ্ত।' এখানে ফ্রয়েডের তত্ত্ব গল্পকারের শিল্পের সত্য হতে পেরেছে; চমক লাগানো ফ্রয়েডীয়ানার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। এই সংযমের জন্যই বোধহয় আদর্শবাদী এবং বাস্তবপন্থী কোনো পক্ষের কাছেই তিনি প্রাপ্য মর্যাদা পাননি।

যৎকিঞ্চিৎকে নিয়ে জগদীশের দুটি গল্প 'চার পয়সায় এক আনা' এবং 'আঠারো কলার একটি'। দুটি ভিন্ন রসের, ভিন্ন স্বাদের গল্প, কিন্তু দুটিতেই এক সন্ধানী মনের দৃষ্টি। প্রথমটিতে আছে কাশী ও শশীর দরিদ্র একান্নবর্তী পরিবারের ছবি। আগাগোড়া দারিদ্র্যের বর্ণনা, অথচ গল্পটি দারিদ্র্য ভিত্তিক নয়। দুঃখে যারা এক, সামান্য সুখের আশায় তারা কত ভিন্ন হতে পারে! দ্বিতীয়টি এক নিঃসন্তান

কৃষকদম্পতির মানসলীলা। বেণুকর মণ্ডল সম্পন্ন চাষী, বয়স ছাব্বিশ। স্ত্রী জানকীর বয়স উনিশ। বিবাহিত জীবন চার বছরের —বৈচিত্র্যহীন।

কাশী মজুর খাটে। শশী খঞ্জ, ভিক্ষাই তার উপার্জন। কাশীর একটি কন্যা, দুটি পুত্র, শশীর দুটি পুত্র, দুটি কন্যা। সঙ্গে আছে বিধবা বোন কুমারী, কাশী ও শশীর স্ত্রী যথাক্রমে কাঞ্চন এবং মোক্ষদা। তারা গরীব, খুবই গরীব, কিন্তু মনে গরীব নয়। তাই পেটের দায়ে গর্ভিনী গরু বিক্রি করতে চোখে জল আসে, মাংসের ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা থাকলেও কসাইয়ের কাজে বোনের আপত্তি থাকায় সে পথ সহজে ছাড়তে পারে।

লেখকের কথায়: 'একটি গোরু ইহাদের ছিলো —বেচিয়া দিয়াছে, গর্ভিনী অবস্থায় ওদের নিষেধ সত্ত্বেও, এবং ছেলেপিলে দুধ একটু পাইতে পারিতো কিন্তু পাইবে না জানিয়াই বেচিয়া দিয়াছে। কাশী আর শশী পরামর্শ করিয়া মাত্র দেড় কুড়ি টাকার বিনিময়ে এই অনুচিত কাজটি করিয়াছে —গৃহ-পালিত গাভীর সুস্বাদু এবং সুপুষ্টিকর দুগ্ধে শিশুগণকে বঞ্চিত করিতে যতোটা নিষ্ঠুর হইতে হয়, ভাতের অভাবে কাশী আর শশীকে তাহা হইতে হইয়াছে।'

'এমনি করিয়া কায়ক্লেশে আর জোড়াতাড়া দিয়া আর ফন্দি ফিকির করিয়া কাশী আর শশী দিনাতিপাত করে।' —দারিদ্র্যের কথাটা গল্পের মুখ্য বিষয় হলে রজনী হাজরার সঙ্গে কাশীর সম্পর্ক নিয়েই কাহিনী মোড় ফিরত অন্য দিকে। কিন্তু জগদীশ বাঁকা-চোখে সমস্যাটির অপর পিঠ দেখেছেন।

ছেলেমেয়েরা ধুলো নিয়ে খেলা করছিল। এর মধ্যে শশীর ছেলে কুড়িয়ে একটি আনি পায়। সেটিকে মহামূল্য রত্নের মতো সে লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল। তারপরে ছোট-বড় সকলের বিচিত্র কৌতূহল —আনির আত্মপ্রকাশ, কি করে খরচ করাটা শ্রেয় —তাই নিয়ে মতান্তর। অবশেষে কাঞ্চন-মোক্ষদার কলহ, ভিন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

কাশী শিল-নোড়ায় থেঁতলে আনিটা বিকৃত করে এনে অন্ধকারে নিক্ষেপ করল। ধরে নেওয়া যেতে পারে গোটা সংসারেরই চিত্তবিকারের অবসান। আবার দিন-আনা দিন-খাওয়া কষ্টকর কিন্তু সুস্থ জীবনাবর্ত।

'আঠারো কলার একটি' দেহ চেতনার এবং দেহাশ্রয়ী মনোবিকারের গল্প। চার বছরের দাম্পত্য জীবনে সব কিছু শান্ত ধীর লয়ে চলায় বেণুকর অস্বস্তি ভোগ করে। কেন? তার বর্ণনায় জগদীশ বলেছেন, 'মানুষ মাত্রেই মনে মনে স্বভাবতই অধার্মিক এবং মানুষ মাত্রেরই স্নায়ুরোগ ভিতরে থাকেই' —এটাই তার কারণ। পনেরো বছরের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হ'য়ে উনিশ বছরে উপনীত হ'তে যে-সময়টা কেটেছে তা আনুকে ক্ষয় করেছে, কিছু দান করেছে, কিছু অপহরণ করেছে —বেণুকর তা গ্রাহ্য করে না, কিন্তু মদিরায় অজানা জিনিশের ভেজাল মিশিয়ে তাকে হীনবল ক'রে দিয়েছে —এইটাই বড়ো সাংঘাতিক —বেণুকরের মনে ওতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের এই ক্ষোভটি সাংঘাতিক এবং তা না জন্মালে যৌবনের ওপর নূতন-নূতন সজ্জা প্রসাধনের প্রয়োজন হ'তো না —কটাক্ষ কৌশল বিলুপ্ত হ'য়ে যেত।'

বেণুকর মেয়েদের আঠারো কলার গল্প বলেছিল। তখনই জানকী ধরেছিল ওর রোগ। আঠারো কলার একটি (মধুর ছলনা) দেখিয়েছিল। চাষের মাঠে কাদার গর্তে অসময়ের মাগুর মাছ পেয়ে বৌয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল। খাবার সময় জানকী মাছ তো দিলই না, বরং তার মাগুর মাছ পৌছে দেওয়ার কথাটাও পাঁচজনের সামনে অস্বীকার করল। বেণুকর রুষ্ট, অসন্তুষ্ট হল। কিন্তু কিছু করার নেই। নধর চৌধুরী, গুণময় পাল প্রমুখের সামনে সে-ই অপদস্থ হল। যেই বাড়িসুদ্ধ লোক গেছে উঠোনের বাইরে, জানকী মৃদু হেসে বলল, 'আঠারো কলা দেখতে চেয়েছিলে না, এ তারই একটি।' বেণুকর এরপর মাগুর মাছের ঝোল খেয়েছিল কি-না গল্পের পক্ষে সেটি অবান্তর।

'কলঙ্কিত সম্পর্ক' ও 'শঙ্কিতা অভয়া' গল্প হিসেবে জমাট নয়, কিন্তু এখানেও লেখকের মৌলিক সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় আছে। অভয়া প্রথম প্রথম স্বামীর সংসার ছেড়ে মেয়ে সমেত প্রণয়ীকে নিয়ে নতুন সংসার বেঁধেছে। মেয়েটি অভয়ার প্রণয়ী সহবাসীকেই বাবা বলে জানে। বাবা মেয়ে কখন কি বিষয়ে আলোচনা করে, তাই নিয়েও সন্দেহ। একদিন রাত্রির শোতে সিনেমা দেখার পরই অভয়ায় বিস্ফোরণ। চাপা সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ল। তখন দু'জনেরই কান্না। উপন্যাসে এর পরিণতি যাইহোক, গল্পেই লেখক ঠিকমতো জিজ্ঞাসা উদ্দীপিত করতে পেরেছেন। 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' আর এক মানসিক বিকারের কাহিনী। সাতকড়ি জেল থেকে ফেরার পর 'পাছে লোকে কিছু বলে' আশঙ্কা তারই বেশি হবার কথা। ছেলের কি কুকীর্তি, কেন সে জেলে গেল —এ সব নিয়ে তার মা-ও মাথা ঘামাননি। ছেলে ফিরে এসেছে, তাতেই শান্তি। কিন্তু সাতুর বউ মাখন কিছুতেই এ পরিস্থিতি মেনে নিতে পারছিল না। জেলের আগে এবং পরে সাতকড়ি এক নয়। সে আসামী। মাখন যেন তাকে খুন করবে। শেষে শাশুড়ী গলা ধাক্কা দিয়ে বউকে বের করে দেওয়ায় গল্পের শেষ। এই মনোবিকলনী গল্পেও মায়ের উৎকণ্ঠা, বউয়ের অস্বাভাবিক মূর্তি দেখে সাতকড়ির ভয়ের বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তব। তবে মধুভাঙার মেলার বিবরণ লেখকের কাজে লাগেনি।

লেখকের সব গল্প নিয়ে বিশদ আলোচনায় হয়ত প্রমাণ করা যায়, তিনি শরৎ-বৃত্ত থেকে কত দূরবর্তী অর্থাৎ বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের উক্তি ('জগদীশ শরৎচন্দ্রেরই গোত্রজ, তাঁরই প্রতিভার মানসপুত্র। এই বস্তুতন্ত্র সংসারের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা কামনা বাসনার পাঁকে মধুগন্ধ সুরভিতে অনুপম পদ্ম ফুটিয়ে তোলবার শিল্পী এঁরা।') যে নিছক আপাতসাদৃশ্য দর্শন ; এবং বস্তুতন্ত্রী জগদীশ আসলে তিরিশের দশকের থমকে দাঁড়ানো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ —যিনি বিধাতা, পরকাল, ঈশ্বর মানেন না, তির্যক সন্ধানী আলোয় প্রচলিত মোহময় ধারণাগুলি ভেঙে টুকরো

টুকরো করেন। বর্তমানে সেই সামগ্রিক মূল্যায়ন আমাদের লক্ষ্য নয়। তবু নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের আলোচনাতেই দেখানো গেছে, জগদীশ গুপ্ত শিল্পী রূপে কোথায় স্ব-তন্ত্র। রবীন্দ্রনাথকে গ্রন্থ উৎসর্গ, রবীন্দ্রমতের প্রতিবাদ, প্রভাতকুমারের অপ্রশংসা পেয়েও তাঁর প্রতি জগদীশের সশ্রদ্ধ অনুরাগ, অনেকবার শরৎচন্দ্রের ছায়ায় দাঁড়ানো, অথচ সাবিত্রী-সরোজিনী কমলের দিকে ঝোঁক না দেখানো, 'শরৎচন্দ্রের শেষের পরিচয়' লেখা —সবই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

জগদীশ গুপ্ত প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ওঠে। কিছু সঙ্গত কারণ অবশ্যই আছে ; কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈসাদৃশ্যের চিহ্নই বেশি। প্রাগৈতিহাসিক, অতসীমামী, সরীসৃপ, মহাকালের জটার জট, শৈলজ শিলা, মমতাদি, খুনী, চোর প্রভৃতি গল্পের মানিক এবং জগদীশ অনেক অন্তরঙ্গ এমন কি ভেজালেও। কিন্তু আত্মহত্যার অধিকার, নমুনা, ছিনিয়ে খায়নি কেন, দুঃশাসনীয়, মেজাজ, পেটব্যথা, রাঘব মালাকার, স্থানে ও স্তানে, সখী, হারানের নাতজামাই, ছোট বকুলপুরের যাত্রী, সবার আগে চাই ইত্যাদি গল্পে মানিকের নাগাল জগদীশ গুপ্ত কেন, সমকালের ক'জন কথাশিল্পী ধরতে পেরেছেন ? প্রারম্ভিক প্রেরণাতেও মৌল পার্থক্য ছিল। আশৈশব 'কেন' রোগ মানিকের শিল্প তথা জীবনবোধকে মনোবিকলনী আতিশয্য, নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক মনস্কতা থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণ সত্যের দিকে নিয়ে গেছে। তাঁর দৃষ্টি ছিল মানবসমাজের ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। জগদীশের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভেদী, কিন্তু দৃষ্টির বলয় সঙ্কীর্ণ —চোখে দেখা অভিজ্ঞতার ছোট পরিধিতেই তার সীমানা। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাঙালী সমাজে মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, উদ্বাস্তু সমস্যা, গ্রাম-শহরে নতুন অধিকারবোধের লড়াই —কোনো কিছুই তাঁকে টানল না।

তবু ভাবের ঘরে কারচুপির দোষ নেই , অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের সৎসাহস নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে এসেছিলেন। সাহিত্যে ব্যবসায়ের প্রতি সম্পূর্ণ নির্লোভ অথচ ন্যাচারালিজমের গাঢ় রঙ তিনি ইচ্ছে করলেই ফোটাতে পারতেন —এমন একজন গল্পকার জীবনশিল্পী জগদীশ গুপ্ত পাঠকের কাছে আরও অভিনিবেশ অবশ্যই দাবি করতে পারেন।

চরকাশেমের লেখক

অমরেন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর অকাল মৃত্যু আকস্মিক না হলেও এত তাড়াতাড়ি প্রত্যাশিত ছিল না। দারিদ্র্য, অনটন, ব্যাধিকে নিত্যসঙ্গী করে অমরেন্দ্র ঘোষ বেঁচেছিলেন। সহজ সিদ্ধির পথ তাঁর অজানা ছিল না, বিবেকের সততাই হয়েছিল অন্তরায়। তাই শ্রেষ্ঠ গল্প, স্ব-নির্বাচিত গল্প প্রভৃতি বনেদী প্রকাশকদের গ্রন্থমালায় গ্রথিত হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। অবশ্য পাঠকের প্রীতি অর্জন করেছিলেন যথেষ্ট। চরকাশেম, ভাঙছে শুধু ভাঙছে, দক্ষিণের বিল, বেআইনী জনতা তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা।

অমরেন্দ্রবাবু নানা প্রসঙ্গে পাঠকসমাজের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছেন। 'আমার শুভার্থীর সংখ্যা অসংখ্য। তাদের ঋণ শোধ করাও অসম্ভব।' তবু ঋণশোধের 'নৈতিক আকুতি' থেকে তিনি 'জবানবন্দী' লিখে রেখে গেছেন।

অমরেন্দ্রবাবুর প্রথম আবির্ভাব কল্লোলের পৃষ্ঠায়। কয়েকটি গল্প লিখেই নিরুদ্দেশ। তারপর তিনি দীর্ঘকাল লেখেননি। তবে কি তিনি জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন? না, বরং বলা যায়, জীবনসংগ্রামে জনগণের মধ্যে এমনভাবে মিশে গেলেন যে, লেখক হিসেবে আপনাকে পরিচয় করানোর অবকাশ হল না। কল্লোল-গোষ্ঠীর গৌরব ঘোষণা করতে গিয়ে অচিন্ত্যকুমার অমরেন্দ্রবাবুকেও স্মরণ করেছেন—

'কল্লোলে অনেক লেখকই ক্ষণদ্যুতি প্রতিশ্রুতি রেখে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়েছে। অমরেন্দ্র ঘোষ তার আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কল্লোলের দিনে একটি জিজ্ঞাসু ছাত্র হিসেবে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। দেখি সে গল্প লেখে, এবং যেটা সব চেয়ে চোখে পড়ার মতো, বস্তু আর ভঙ্গি দুইই অগতানুগ। খুশি হয়ে তার 'কলের নৌকা' ভাসিয়ে দিলাম কল্লোলে। ভেবেছিলাম ঘাটে ঘাটে অনেক রত্নপণ্যভার সে আহরণ করবে।' নৌকাডুবি হয়নি। অচিন্ত্যবাবুর আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছিল। 'কলের নৌকা' ধীরে ধীরে হয়ে উঠছিল 'সমুদ্রাভিসারী বিশাল জাহাজ', নতুনতরো বন্দরে তার আনাগোনা, অনেক রত্নসম্ভার। অবশ্য সে সব পণ্য নয়, উপলব্ধির অমেয় রত্ন, সহৃদয়ের হৃদয়ে জ্বলবার জন্য।

'দক্ষিণের বিল' ব্যাপক পটভূমিকে নিয়ে লেখা। হয়ত অমরেন্দ্রবাবুর জীবন সত্য উন্মোচনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হয়ে উঠত বইটি। কিন্তু তা হয়নি। এতে সত্যের ইশারা আছে, প্রতিষ্ঠা নেই, বিশাল জীবনসম্ভাবনা চিত্রণের প্রস্তাবনা আছে, কিন্তু পরিণাম খণ্ডিত। কারণ 'ক্যানভাসে তুলি বুলাতে না বুলাতে টেনে ধরলেন হাত প্রকাশক। তাই দক্ষিণের বিলে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা কাহিনী থাকলেও আসলে অসম্পূর্ণ দু'খণ্ড উপন্যাস। শুধু ফসল তোলা হয়েছে, তার ঐশ্বর্যে যে কৃষ্টি, সভ্যতার উত্থান-পতন হল, তার চিত্র তো আঁকতে পারিনি।' (জবানবন্দী)

চরকাশেম অমরেন্দ্রবাবুর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বই। পাঠকের ভালোবাসা এ ধরনের লেখকের ক্ষেত্রে একেবারে তাৎপর্যহীন নয়। সত্যি চরকাশেম নদী-নির্ভর বাংলা উপন্যাসের ধারায় সার্থক সংযোজন। হাসেম আলির বেটা কাশেম আলি, রসময়, রহিম, ফরিদ সকলেই মাছ-মারা জেলে —যেমন কেতুপুরের কৈবর্ত কুবীর, ধনঞ্জয়, রাসু, যুগল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের নরনারী মূলত হিন্দুসমাজের, হোসেন মিয়া প্রধান নয়। অমরেন্দ্রবাবুর চরকাশেম মুসলমান জেলে সমাজের অন্তরঙ্গ চিত্র। অবশ্য রসময়, নিবারণও আছে। অমরেন্দ্রবাবু নিঃসন্দেহে 'পদ্মানদীর মাঝি'র দ্বারা প্রভাবিত। সেই চর, নতুন রাজ্য গড়ার স্বপ্ন, হোসেন মিয়ার মতো কাশেম আলিরও চরিত্রের মূল কথা। হোসেন মিয়া স্বপ্ন দেখেছে, তার নতুন পত্তন মানুষে-জন্তুতে, কৃষকে-জেলেয় কাচ্চাবাচ্চায় ভরে যাক। যে ক'জন বাসিন্দা পেয়েছে, তাদের মহাসমাদরে সে নিজের কল্পরাজ্যে অধিষ্ঠিত করেছে। চরকাশেমেও আছে স্বপ্নালু নায়ক। কাশেমের নানার বিশকানির চর। কীর্তিনাশা পদ্মার খামখেয়ালে সে চর তলিয়ে গেছে জলে। পদ্মা কেবল পাড় ভেঙে ভেঙে খেয়ে চলেছে। তবু হাসেমের ছেলে কাসেম ভাবে: 'চর তো নয় দুধের সর'…। ক'দিন এ চর জাগবে। মানুষ গরু বাছুর হাঁস পায়রা মোরগে ভরে যাবে চরের বুক। মানুষের হবে ছেলে মেয়ে। গরুর হবে বকনা এবং দামড়া বাছুর। হাঁস মুরগী চারদিক ঘিরে কিলবিল করবে, কিচমিচ করবে, কদম ফুলের মতো সব ছানা। আঃ কি নরম —বুক জুড়ান পাখির বাচ্চা সব।……

'গ্রীষ্ম, বর্ষা। তারপর শরৎ, হেমন্ত। পূজা পার্বণ দশহরা মজলিস দাওয়াতের মরশুম। শীতে শুকনায় আনন্দ। লাঠিতে দাড়িতে তেল। নাও বাইচ —বড় খালের ওপার এপার হৈ চৈ। সারা চর সরগরম। লাল নীল কাতারে কাতারে বৈঠা। সারি গান, খঞ্জরী। রাঙা মিঞা, না কালা মিঞা কে জিতবে তার জল্পনা কল্পনা।' —এখানে চরের স্বপ্ন মাছ-মারাদের মুক্ত জীবন যাপনের স্বপ্ন। হোসেন জেলে হয়েও ঠিক তাদের একজন নয়। সে মহাজন, দায়ে পড়ে জেলেরা তার কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। কাসেম জেলেদেরই একজন, রসময়ের পরামর্শমতো চলে। এর বেশি তুলনা অবান্তর, অপ্রয়োজনীয়। শুধু মনে রাখতে হবে অমরেন্দ্র ঘোষ 'পদ্মানদীর মাঝি'র পরে যাত্রা শুরু করেছেন। তারপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

এবং তিনি সমগোত্র, জীবন সংগ্রামে অংশীদার হয়েও স্বতন্ত্র শিল্পী। এবং সেই স্বাতন্ত্র্যই শিল্পীর কাম্য।

চরকাশেম উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাসে স্পষ্টত দুটি কাল-পরিচ্ছেদ নির্দেশ করা যায়। কাশেম চরপত্তন পাবার আগে ও পরে —দুটি বিভাজন। প্রথমাংশে কাশেম অত্যন্ত দরিদ্র। পঞ্চায়েতের ভাইয়ের বাড়ি সে লালিত পালিত হয়। দুর্ভিক্ষের বছরে হাসেম মাত্র আড়াই টাকায় পাঁচ বছরের কাশেমকে বাঁধা রেখে আসে। তারপরই এল মরণ। কাশেম অবশ্য ক্রীতদাসের মতো মানুষ হয়নি। ফুলমন আর কাশেম একসঙ্গেই বেড়ে উঠেছে। তারপর যুবক কাশেম দূর সম্পর্কের ফুফুর কাছ থেকে আড়াই টাকা নিয়ে এসে মুক্তি চেয়েছে, 'চাচা, আমি বঁড়শি বামু —বাজানের পেশা ছাড়ুম না।' সে-দিন থেকে কাশেম মুক্ত। টাকা অবশ্য নেয়নি ফুলমনের বাবা।

এ দিকে তিন বছর বয়সে বড়লোক স্বামীর সঙ্গে বিয়ের কিছু পরে বিধবা হয়ে ফিরে এল ফুলমন বাপের বাড়ি। সেই ফুলমনই রইল, কিন্তু একটু বদলে গেল। স্বামীর ঘরের আভিজাত্যের ছাপ লেগে রইল তার মনে। কাশেম অনেক বাল্য-প্রসঙ্গ স্মরণ করে —দুঃখের অপমানের। প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয় —মরুক, ফুলমনেরা মরুক। কিন্তু তার নতুন চরে ফুলমন না হলে ফুল ফোটাবে কে? সুতরাং অভিশাপটা অনুচ্চারিত থাকে।

ফরিদ রহিম মহম্মদ কাশেম সবাই মিলে মানিক খালি ধান কাটতে যায়। ফরিদের পেশা চৌর্য। তাতে তার সঙ্কোচ নেই। টাকাকড়ির অভাবে বাড়িতে কলহ হলে সে সকলের সামনেই চুরির গর্ব করে। সে আঞ্জুমানের ভাই, রহিম তার চাচাত ভাই এবং আঞ্জুমানের স্বামী। পথিমধ্যেই ফরিদের অসুখ হল, বোধহয় ভেদবমি। এক স্যাকরার নৌকায় সে ফিরে গেল বাড়ি। জগদীশ বৈষ্ণবের স্ত্রী প্রমীলার সংজ্ঞাহীন দেহ জেলেরা টেনে তুলল নৌকায়। এই সুবাদে প্রমীলার কাছে কাশেম চিরকাল পেয়েছে স্নেহ, সাহায্য।

চরকাশেম জাগবার আগের কাহিনী বিচ্ছিন্ন টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা ও দৃশ্যের সমষ্টি। দৃশ্যগুলি প্রাণবন্ত, শক্তিমান শিল্পীর রেখাচিত্রের মতো। কিন্তু রেখাচিত্রই, তার বেশি নয়। তাই গল্পের উপাদান হিসেবে উপভোগ্য, ঔপন্যাসিক সংহতি রক্ষিত হয়নি। দু'একটি নিদর্শন—

১॥ 'পদ্মা ও মেঘনা —যেন দুইটি বোন। দেখা হয়ে গেছে এই মন্থর যৌবনে। শীতের সায়াহ্ন। কতদিন পরে কত দেশ ঘুরে দেখা! কত ভাঙা গড়ার ইতিহাস দু'জনার বুকে! কত আনন্দ ও বিষাদের স্মৃতিকথা বলবে, কেন জানি, বলতে পারছে না। শুধু অন্তঃসলিলা কথার কাকলি গুমরে গুমরে মরছে বুকের পাঁজরে।'

২॥ 'সমস্ত বৌরা একত্র হয়ে বাড়ির এজমালি উঠোনখানা ভাল করে

নিকিয়েছে। যে যার ভাগ আলাদা করেছে বাঁশের আধলা দিয়ে। একটা উঠোন ভাগ হয়েছে অনেকটায়। তাতে ছড়িয়ে দিয়েছে সিদ্ধ ধান। শীতের তপ্ত রোদে মনে হয়, এতো ধান নয় —সোনার দানা। ঐ ছড়ান ধানের ফাঁকে ফাঁকে পথ। আঞ্জুমান অতি সন্তর্পণে হাঁটে, তার অব্যক্ত আনন্দ উছলে পড়ে সোনালি শস্যের বুকে।'

৩। 'কাশেম পাড়ি দিয়ে আসে। একি! কেমন যেন তার মনে হচ্ছে! একেবারে কূলের কাছের তলখাড়ি তো নেই। এক একবার জল সরে যাচ্ছে, আর তার কেবলই মনে হচ্ছে —ভরাট হয়ে এসেছে পাড়। একি সম্ভব? কিন্তু তাই তো মনে হচ্ছে! আবার জাগছে যেন নরম পলিমাটি আর বালি।'

প্রথম দুটি উদ্ধৃতি গ্রামজীবনের সঙ্গে লেখকের নিবিড় সাহচর্যের পরিচয় দেয়। অনেক দুঃখশোকের ঝড়ে জীবনের নৌকা টলমল হলেও অমরেন্দ্র বাবুর মনের মমতা কমেনি। 'লোক্যাল কালার' বা 'আঞ্চলিক রঙ'ই এর সবটুকু নয়। মাটির খেয়াল, মাটির মায়া, মানুষের মন, জৈব আবেগ, এমন কি মুখের কথাটি পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন উপন্যাসে।

'শীতকালের গাঙ মরা সাপের মত। কিন্তু হঠাৎ স্রোতের টান আসে। মরা সাপ যেন খাড়া হয়ে ওঠে।' সুতরাং জলের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয় জেলেদের। তবু কষ্ট, শীত ভুলে থাকা চাই। প্রকৃতির কোলের মানুষ স্বভাবত আনন্দকামী।

'একটা কেচ্ছা কও —বড় শীত।' সত্যাই উত্তুরে বাতাস যেন গায়ে বরফ ছুঁইয়ে যাচ্ছে। শীতবস্ত্রেরও নিতান্ত অভাব সকলের। দু'একজনের তো গামছা গেঞ্জি মাত্র সম্বল।

একজন আরম্ভ করে, 'তয় শোনো বলি : এক যে ছিল বাদশাজাদী —গোলে-বাখালি তার নাম। কন্যার ছুরাতের (রূপের) কথা কি আর কমু —আশমানের চাঁদ ছাইনা যেন গড়াইছে কন্যার দেহ...'

'তারপর ?'

যে গল্প বলতে আরম্ভ করেছিল, সে গান ধরে—

চিকণ চিকণ কালো চুল
(কন্যার) ভোমরার লাখান (মত) ভুরু
গালের কোলে কালা তিল
পায়ে সোনার খাড়ু.........

এই উপন্যাসের মানুষগুলি ব্যঙ্গে মুখর ঈর্ষায় নিষ্ঠুর হতে জানে, আবার একের দুঃসময়ে অপরে শেষসম্বলও উজাড় করে দেয়। ঐশ্বর্যবান হাওলাদারের যোগ্য গৃহিণী হবার সাধ ছেড়ে দিয়ে চরকাশেমের দুর্দিনে ফুলমন মেঝেয় পোঁতা টাকার কলস বার করে দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করেছিল মাত্র। এই দ্বিধাতেই ফুলমন

বাস্তব। আঞ্জুমানের প্রতি চাপা অভিমানও নারী-প্রকৃতিরই আর একটি দিক উন্মোচন করে। কাশেম আর আসে না বলে অভিমান, পুলিশের হাতে মিথ্যে চুরির দায়ে ধরিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া, আবার আঞ্জুমানদের বাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রবে উষ্মা কাশেমের প্রতি তার অজ্ঞাত ভালোবাসারই পরিচয় দেয়। কাশেমের'ও অবকাশের স্বপ্ন, যৌবনের সাধ —ফুলমনকে সে সঙ্গিনী করবে, চরকাশেমে সে হবে গোলেবকাওলি রাজকন্যা।

চরকাশেমে হাওলাদার হবার বহু আগে থেকেই কাশেমের ইচ্ছা, ফুলমনকে সে সাদী করবে। সেই ফুলমনকে বিয়ে করবে বিদেশী আগন্তুক ? হলই বা বড়লোক, বহুপয়সার মালিক। তাই বলপ্রয়োগ করে গভীর রাতে ডাকাতি করতে হল। Elemental force বা আদিম জৈব তাগিদ যেন উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বর্ণনায় শক্তির পরিচয় নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। কিভাবে ক্রুদ্ধ সর্পিণীকে কৌশলে ভয় দেখিয়ে ক্লান্ত করে অধিকার করতে হয় কাশেমের রক্তে সেই অভিজ্ঞতা দেখা গেছে। পরাজিত ফুলমনের ছবিটি বড় করুণ। 'ভীরু একটি রম্য মাছ যেন তার (কাশেমের) কবলে পড়ে কাঁপছে। আহা —সে ছেড়ে দেবে নাকি বঁড়শি খুলে ?'

ফুলমন-হরণ বর্ণনায় অমরেন্দ্রবাবু সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। পরস্পরের তীব্র জিগীষা কাছের মানুষকে দূরে নিয়ে গেছে। ফুলমনের প্রতিরোধ সেই প্রতিহত আভিজাত্যের দর্প। কাশেম তো বান্দা, গোলাম, নফর। কাশেম জানে, একই অন্নে দু'জনার দেহ পুষ্ট, সে ফুলমনের বান্দা নয়, ফুলমন হবে তারই বিবি। নিদ্রিতা এবং বহুবাঞ্ছিতা ফুলমনকে বক্ষোলীনা রূপে পেয়েও কাশেম অসংযত হয়নি। গভীর মমতা নিয়েই যেন জ্যোৎস্নার আলোয় বিবাহবেশে সজ্জিত ফুলমনকে সে চেয়ে চেয়ে দেখছে— 'পাট করা খোঁপা ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে। সাপের মত জড়িয়ে রয়েছে বেণী কাশেমের গলায়। আলুথালু হয়ে গেছে দেহের সজ্জা-আভরণ। চোখের জলে গলে পড়েছে সুর্মার সরু টান। নিটোল গালে একটা ম্লান ছায়া পড়েছে। ফুলমনের দেহের অস্পষ্ট একটা সুরভি কাশেমের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।' সংযমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন বলেই পূর্বের কয়েকটি দুর্বলতা বেশি অসঙ্গত মনে হয়। কাশেম ও ফুলমনের কয়েকটি মিলন দৃশ্য এঁকেছেন লেখক— সেখানে নায়িকা অপ্রস্তুত এবং নায়ক শুধু বাহুবলে তাকে অধিকার করে চুম্বন আলিঙ্গন করেছে। হয়ত নায়কের হৃদয়দৌর্বল্যের ব্যাপার বলেই অমরেন্দ্রবাবু 'রসের অসংযমে'র কথা বড় করে ভাবেননি। অবশ্য প্রেমের মহিমা যে অমার্জিত পশুশক্তিকেও কোমল করুণ মধুর করে দেয়, অমরেন্দ্রবাবু সে বিষয়ে সচেতন শিল্পী। তাই হৃদয় জয় করতে না পেরে হার মানে কাশেম। কত শান্ত, অন্তরঙ্গ তার স্বর : 'কাঁদিস না —কাইল তোরে দিয়া আমু ওপার। মাপ কইরা দে আমার গোস্তাকি।' লেখকের মন্তব্য, 'কাশেম যেন কৈশোরের অন্তরঙ্গতায় ফিরে গেছে।' সযত্নে বিছানার আয়োজন করে সে যেন ক্ষমা চায়. 'বড় ভুল করছি —এখন দুঃখ হয়

আমার, ক্যান্ ভাঙ্‌লাম তোর এ বিয়া ?' ফুলমন নীরব, তার ব্যঙ্গের তুণে সব শর হঠাৎ তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। কাশেম আরও মিনতি জানায়, আবাল্য সে কষ্টে মানুষ, শৈশবে বাপ মা হারিয়েছে, তবু শত কষ্টেও সান্ত্বনা ছিল ফুলমন। 'সেই মানুষটারেই আনলাম জোর কইরা, তার মনে দাগা দিয়া !' এই দীর্ঘশ্বাস, এই আত্মধিক্কার ফুলমনের দর্প, দম্ভ, অভিমানের আবরণ খুলে প্রকৃত প্রেমের জাগরণ ঘটাল। তাই ফুলমন অনেক দিন পরে আবার সুস্থ সপ্রতিভতায় ফিরে এল— 'যদি কই যে আমারে কেও জোর কইরা আনে নাই, আইছি আমি নিজে।' এর-পরের ঘটনা অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিক। কিন্তু লেখকের একটি মন্তব্যে কেমন খট্‌কা লাগে, যেন কাশেম-ফুলমনের প্রেমের ব্যাখ্যা নিছক 'দেহ-রীতি' হয়ে পড়ে। 'একখানা হাত সঞ্চালিত হতে থাকে ফুলমনের সারা দেহে। সে বিদ্যুৎ স্পর্শে পদ্মকলি দল মেলে ধীরে ধীরে রাতের আঁধারে।' তবে কি দেহমিলনেই মনের বৈষম্য আপনি ঘোচে ? পুরুষ ও নারীর সেই আদিম সম্পর্কই চলেছে ? অমরেন্দ্রবাবুর চরিত্রচিত্রণ তা মানেনি। আগে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ, তারপরে দেহ মিলন। এইভাবেই প্রেমের ফুল ফুটেছে ফুলমনের হৃদয়ে। আগে মমতা, সহৃদয়তা, দুঃখবোধ, তারপর আসঙ্গ। ফুলমন ডাকাত কাশেমের প্রতিরোধ করেছে, আত্মসমর্পণ করেছে প্রেমিক কাশেমকে। 'কালো তবু কত আলো সে রূপে ! সুদৃঢ় গঠন, কিন্তু কত শান্ত চাহনি টানা টানা দুটো চোখে।'

চরকাশেমের কাহিনী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। লেখক প্রকৃতির সন্তান নদীর লালিত মানুষগুলির জীবনসংগ্রামের গল্পে সর্বব্যাপী যুদ্ধের পটভূমিকার সুপ্রয়োগ করেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে বর্ণিত হয়েছে সুতোর অভাবে তাঁতীর কর্মসঙ্কট, অমরেন্দ্রবাবু সেই সূত্র ধরেই বলেছেন মাছ-মারাদের কথা। সুতোর অভাবে কি করে দেনার জালে কষ্টের জালে জড়িয়ে পড়ল জেলেরা, চরকাশেমের সবাই। ইতিমধ্যে রহিম যুদ্ধের মরশুমে শহরে কাজ নিয়ে ধনী হয়েছে। নারীদেহ বিক্রীর ব্যবসায়ে তার সংস্রব লেখক ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। রহিম মেয়েদের কাজ দেবার লোভ দেখিয়েছে। তখনও সে জানত না, তার বহিন আঞ্জুমানই তার কাছে সর্বপ্রথম আবেদন পেশ করবে।

চরকাশেম এবং অমরেন্দ্র ঘোষের জন্য আমাদের আক্ষেপ না করে উপায় নেই। চর তো নয় দুধের সর। সেই দুধের সরে পুষ্ট শক্ত সবল মানুষগুলির জীবনালেখ্য যতটুকু ফুটেছে, বেশ সুন্দর, যতটুকু ফোটেনি, তার জন্য কে স্বপ্ন দেখবে কাশেমের স্রষ্টার মতো ? প্রথমাংশের বর্ণনা শৈথিল্য, প্রমীলার সঙ্গে কাহিনীর সংযোগে আকস্মিকতা, আঞ্জুমান-কাশেমের সম্বন্ধে কুবের-কপিলার অহেতুকী ছায়া যে সহজেই এড়ানো যেত, এ আবেদন কার কাছে পৌছাবে ? শুধু চরকাশেম নয়, অমরেন্দ্র ঘোষের আরও অনেক ভালো গল্প ও উপন্যাস শেষ পর্যন্ত সার্থক 'প্রতিশ্রুতিমণ্ডিত' রচনা। তবু তাঁর সৃষ্ট নরনারীর জগতে 'চরকাশেম' অনেক

আশা ভালোবাসা সংগ্রাম স্বপ্ন নিয়ে জেগে উঠেছিল, আর একটু অবহিত হলেই অমরেন্দ্রবাবু তাকে অমর করে রাখতে পারতেন। পদ্মা মেঘনার কীর্তিনাশা টানে যেমন চর ভাঙে, তেমনি জীবিকার সর্বনাশা গ্রাসে তা সম্ভব হল না। এই আক্ষেপের সূচিমুখে চরকাশেমের লেখক চিরকাল পাঠকের সহানুভূতি বিদ্ধ করবেন।

রমেশচন্দ্র সেনের গল্প

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে যাঁরা আধুনিক ধারা প্রবর্তন করেন রমেশচন্দ্র সেন তাঁদের অন্যতম নন, কিন্তু সেই ধারারই অন্তর্গত। প্রচার বাহুল্যে যে ইতিহাস অহরহ বিকৃত হচ্ছে, তার বেদনাদায়ক প্রমাণ, রমেশচন্দ্র সেন এখনও অনেকের কাছে একটি অজ্ঞাত বা স্বল্পখ্যাত নাম মাত্র। অথচ রমেশচন্দ্র লিখেছেন বহু গল্প ও উপন্যাস, দীর্ঘদিন ধরে লিখেছেন এবং বহু লেখকের প্রতিভার অঙ্কুরোদ্গমে যথোচিত উৎসাহ দিয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে সুশীল জানা পর্যন্ত, এমন কি তরুণ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য সেবক সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বর্তমান দশক একান্তভাবেই নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত। তার পরে আছে রাজনৈতিক, পত্রিকা-গোষ্ঠীর দলাদলি। তাই দল-মত-বয়স নির্বিশেষে সাহিত্যের অঙ্গনে সকলে সমবেত হতে পারার সুযোগ বড় অল্প। সেই অল্প অনেক হত রমেশচন্দ্র সেনের আনুকূল্যে।

একটি শরৎচন্দ্রীয় প্রকৃতির লাজুক, সাদাসিধা, সহজ মানুষ, পেশায় কবিরাজ, মানুষের ব্যাধি জানা তাঁর কাজ, সাহিত্যের নেশায় স্বল্প অবকাশ ভরপুর, সেখানেও ব্যাধি জানার আগ্রহ—মানুষের এবং সমাজের; অকৃত্রিম হৃদয়—এই হলো রমেশচন্দ্র সেনের পরিচয়।

জনপ্রিয় পত্রিকা ও বনেদী প্রকাশকের সঙ্গে লেখকের সংযোগ না ঘটলে এ কালে খ্যাতি অর্জন করা দুরূহ। বিজ্ঞাপন ও প্রচ্ছদসৌকর্যের যুগে রচনার আভ্যন্তর-মূল্য গৌণ। রমেশচন্দ্র সেন এ কালের এমন বহু প্রথিতযশা লেখকেরই পুরোবর্তী উৎসাহদাতা, যাঁদের ছোটগল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, নির্বাচিত গল্প ইত্যাদি সংস্করণ বেরিয়েছে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, সেই বরেণ্যদের তালিকায় রমেশচন্দ্র অনুপস্থিত। এইভাবে 'কল্লোল' পত্রের অন্যতম কথাশিল্পী, চরকাশেম ও দক্ষিণের বিলের লেখক অমরেন্দ্র ঘোষকে আমরা হারিয়েছি। রমেশচন্দ্রও অমরেন্দ্রর মতো সাধারণ পাঠকের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছেন।

অথচ রমেশচন্দ্র কুরপালা-শতাব্দী-গৌরীগ্রাম লিখে বিদগ্ধ পাঠক ও সমালোচক

মহলের প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। 'অভ্যুদয়' মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশের সময়েই 'কাজল' রসিকজনের চিত্তজয় করেছিল। 'মৃত ও অমৃত' গ্রন্থের গল্পগুলি ডঃ. সুধাংশু সেনগুপ্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করেছিলেন। মনে আছে, অধুনালুপ্ত 'কথা ও কাহিনী' পত্রিকায় তাঁর 'দু'নম্বর' গল্প। একটি পত্রের 'শোকসংবাদ' স্তম্ভ থেকে অপূর্ব সমাজ-অধ্যয়ন। এক, দুই ক্রমিক সংখ্যায় চিহ্নিত শোকসংবাদের প্রথম ব্যক্তি ব্যবসায়ী, কোটিপতি, দ্বিতীয় জন দরিদ্র আদর্শবাদী শিক্ষক। প্রথম জনের আগে ও পরে গুণবাচক পদ, অনুচ্ছেদটি বড়, তারই অনুবৃত্তি 'দু'নম্বর' অন্য কলমে, ভাঙা হরফে সংক্ষেপে ছাপা। 'মারা গিয়াছেন'—এই তথ্যটুকু বিজ্ঞাপিত।

রমেশচন্দ্র সেনের গল্পগ্রন্থ চারটি; মৃত ও অমৃত, নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, ওরা তিনজন, কয়েকটি গল্প। 'শ্রেষ্ঠগল্প' নামে সম্প্রতি একটি সঙ্কলনও প্রকাশিত হয়েছে। যে-কোনো একটি গল্প হঠাৎ হাতে নিলেও প্রথমপাঠেই লেখকের শক্তি ও সংযমে সহৃদয় পাঠক মুগ্ধ হবেন।

রূপকথাশ্রয়ী গল্প 'রাজার জন্মদিন'। কোনো রাজার কারাগারে বন্দীনিবাসে বারোজন বন্দী ছিল। রাজার জন্মদিনে একজন করে মুক্তি পায়। ন'জন মুক্তি পেয়েছে। বাকী মাত্র তিনজন—জয়ন্ত, জীমূতবাহন, রাজশেখর। সুখে দুঃখে তিনজনের সৌহার্দ্যে দিন কাটে। রাজশেখরের মুক্তির পর রইল শুধু জয়ন্ত আর জীমূতবাহন। কে মুক্তি পাবে রাজার জন্মদিনে? এই নিয়ে বহু জল্পনা, ভাগ্য পরীক্ষা হল। কখনো জয়ন্ত কখনো জীমূতবাহনের শুভযোগ ঘটে। অমনি অপরের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া ঘনায়। তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পে মানুষের আত্মরক্ষার একটা ক্রূর পাশব রূপ ফুটেছে; রমেশচন্দ্র স্বভাবত শান্ত মনের শিল্পী, তাই জীমূতবাহনকে গলা টিপে মারার দৃশ্যটিতে বেশি মনোযোগ দেননি, ইঙ্গিতে বলেছেন। জয়ন্ত মুমূর্ষু জীমূতবাহনকে সেবা পরিচর্যায় রোগমুক্ত করেছে, আবার তাকে মুক্তির অন্তরায় ভেবে হত্যা করেছে। অথচ জয়ন্ত আন্তরিকভাবেই বলেছিল, 'তোমার মুক্তির বিনিময়ে আমি খালাস হতে চাই না।' মানবস্বভাবের গভীরে রমেশচন্দ্রের কৌতূহল সঞ্চারিত। প্রথম থেকেই তিনি জীবনরস রসিক। দাঙ্গার পরিবেশে অনেকেই যখন সুস্থ মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছেন, তখনও সাহিত্যিকের অতন্দ্র প্রহরা আমাদের সতর্ক করতে চেয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'ছেলেমানুষি', 'স্থানে ও স্তানে', অন্য লেখকেরাও সুস্থ সমাজচেতনা ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী ছিলেন। রমেশচন্দ্র এই পটভূমিকায় লিখেছেন, 'সাদা ঘোড়া'। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তিতির' এর মতো তাঁর সাদা ঘোড়াও প্রতীক, শান্তি-মৈত্রীর প্রতীক।

একটি নিরুদ্দিষ্ট সাদা ঘোড়া হিন্দু পল্লীতে এসে পড়েছে। দু'দিন কাটে। সেবাযত্ন, নতুন নাম পেয়েও ঘোড়া অনম্য। হঠাৎ 'একগাল পাকা গোঁফ-দাড়ি,

খালি গা, পরণে ময়লা লুঙি, মাথায় ফেজ, হাতে টিনের মগ' ঘোড়ার প্রকৃত মালিক এসে পৌছাল। ঘোড়াটির নাম সোরাব। বাবুদের বহু স্নেহে সাদা ঘোড়া জলস্পর্শ করেনি, কিন্তু প্রকৃত মালিকের স্পর্শে অনেক দানাপানি খেলো। কিন্তু পুলিশের গুলিতে ছত্রভঙ্গ জনতা আত্মস্থ হয়ে দেখল, ঘোড়াটি মরে গেছে। মানুষ পশুর চেয়ে পাশব হয়ে পড়েছে ইঙ্গিতটি অনবদ্য। দাঙ্গাবাজ যমুনা প্রসাদদের হাতে আইন দিয়ে রক্ষক বানানো একান্ত গর্হিত। এই একাধারে গাড়োয়ান-সহিসটির মতোই এ গল্পে আছে সমাজের নীচুতলার মানুষ কৈলাস, জন্মেজয়, বারিবালা, কানাই, যাদব, বিষ্টু, ওরাংওটাং ভজরাম প্রভৃতি। এরা অশিক্ষিত, অমার্জিত, কিন্তু মনুষ্যত্বের দৈন্য কিছু নেই। নসীরাম নকুলকে খুন করবার শপথ নিয়েও ক্ষমা করে, ভজরাম অপরাধ গোপন করে না, গণেশ প্রতিদ্বন্দ্বী জন্মেজয়কে ভালোবাসে।

তারাশঙ্করের বহু গল্পের নায়ক নায়িকা কুশ্রী, বিকলাঙ্গ, বীভৎস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্র তির্যক দৃষ্টি প্রথম পর্বের রচনায় জীবনের বাঁ-দিকের প্রতিই আগ্রহী ছিল। রমেশচন্দ্রে যুগচেতনা আছে, দুঃখ গ্লানি জৈবলিপ্সা কুরূপতা আছে, কিন্তু সুন্দরের পাদপীঠে বীভৎসকে বরমাল্য দিতে কখনও তাঁর মন সায় দেয়নি। এখানেই চিকিৎসকের সংস্কার তাঁর শিল্পকে রক্ষা করেছে। বীভৎসকে আলঙ্কারিকরা রসপর্যায়ে অন্য রসের মতোই আনন্দনিস্যন্দী বলা সত্ত্বেও কবিরা জুগুপ্সা নিয়ে মহৎ কাব্য অল্পই লিখেছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বুঝেছিলেন, নিছক নেতিবাচনে শিল্পীর বক্তব্য সীমিত নয়, তারাশঙ্কর দেহ ও মন, জৈব লালসা ও দেহোত্তীর্ণ ভাবের দ্বন্দ্বে সমাজের পটধৃত মানুষকে ছেড়ে উপকথায় এবং ধর্মভাবে আশ্রয় নিলেন। চিকিৎসক কঠিন মৃত্যু-যন্ত্রণার মুহূর্তেও আরোগ্যের ওষধির কথা ভাবেন, তখন রোগী নিজেই হয়ত মরণপ্রার্থী। চিকিৎসক বোঝেন, মরণপ্রার্থনা কারো আন্তরিক নয়, দেহ বা মনের বিকার। তাই উষ্মাপীড়িত মনের ক্ষোভ, বক্রোক্তি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গশায়ক রমেশচন্দ্রের রচনায় কখনও ঝলসিত হয়ে ওঠেনি। দেহের মনের অসুখে অসুস্থ মানুষ তাঁর কাছে পরিচর্যা পেয়েছে। গভীর সহানুভূতি সমবেদনা তাঁর সমগ্র রচনার প্রেরণাউৎস। অথচ কখনোই রমেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রের মতো ভাবালুতাগ্রস্ত হননি। এখানেও চিকিৎসকের নির্লিপ্ত, নিরীক্ষা রমেশচন্দ্রের গল্পগুলিকে আতিশয্যদোষ থেকে মুক্তি দিয়েছে। নতুবা 'ডোমের চিতা' 'ওরা নির্জন' বা 'কৈলাস' গল্পের পরিণাম অন্য রকম হত।

'ডোমের চিতা'-র পরিবেশটি অদ্ভুত। গ্রামের বাইরে নদীতীরে শ্মশান। সেখানে থাকে হারু ও বদন। শব-সৎকার তাদের জীবিকা। চিতার ওপরেই হাঁড়ি চড়ায়, অঙ্গার দিয়ে কল্কে সাজে। জনপদের কোলাহলের সঙ্গে সম্পর্ক কম। 'জীবিত মানুষের কণ্ঠস্বর অপেক্ষা মৃতদেহই যেন প্রাণবন্ত।' তারা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে চেতনাহীন। এ হেন হারু ও বদন বড় বিপন্ন হল। দু'দিন ধরে মুষল ধারায়

বৃষ্টি। অন্ত্যেষ্টির জন্যও কেউ পথে বেরোয় না। দ্বিতীয় দিন গভীর রাত্রিতে এল একজন পদ্মরাজ, তার কোলে শিশুপুত্রের শব। তখন শুক্‌নো কাঠ দুর্লভ। সুতরাং মাত্র এক টাকায় বদন কাঠ দিতে রাজী নয়। শেষে হারুর সহানুভূতি দেখে বদন সম্মত হল। একটি শর্ত, পরে সে আর এক টাকা দিয়ে যাবে।

পরদিন ভোরে হারু গেল চাল আনতে বাজারে। চিতা নেভার আগে ফিরতে হবে। নতুবা কাঠের অপচয়। কিন্তু সময় বয়ে যায়, চিতা নেভে, হারু আসে না। অসীম জলরাশির মধ্যে বদন একা। ডিঙিটাও হারু নিয়ে গেছে। অভুক্ত বদন ক্ষীণকণ্ঠে অনেকবার হারুকে ডেকেও সাড়া পেল না। শুধু শকুনের চিৎকার শোনা গেল। পরদিন স্ত্রীর শবদেহ নিয়ে এল একজন। তাদের ডিঙি নিয়ে বদন কাঠ আনতে গিয়ে আর একটি ডিঙিসমেত ফিরে এল। সর্পাঘাতে হারু মারা গেছে। চাল পড়ে আছে নৌকোর খোলে। কই মাছগুলো ক্ষিধের তাড়নায় হারুর দেহ খুবলে খেয়েছে।

শব দেখে বা মৃতের স্বজনের কান্না শুনে যে বদন কোনোদিন কাঁদেনি, তারই অশ্রুসজল আন্তর রূপ দেখেছেন রমেশচন্দ্র। সযত্নে হারুর চিতা সাজিয়ে আগুন দিয়েছে বদন। 'এত ধোঁয়া জীবনে আর কখনো দেখে নাই।' 'দূর ছাই কিছু ভালো লাগে না' —উক্তির বেদনাবৈরাগ্য যেমন সত্য, তেমনই সত্য আত্মরক্ষার তাগিদ। 'আগুনটা আবার নিবে যাবে। এর উপরই চাল চড়িয়ে দি।' উপসংহারটি লেখক-মানসের ইঙ্গিতবহ: 'দূরে আকাশের বুকে বকের পাতি উড়িতেছে। বৈকালসূর্য চিতার উপর ফাগের গোলা ঢালিয়া দিয়াছে। চিতার আগুন ও সূর্যের আলোয় মাদারের ভিটা একটা লাল আভা ধারণ করিল। চিতার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বদনের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।'

আরেকটি উল্লেখ্য গল্প 'খোসা'। আরম্ভটি অত্যন্ত সাদাসিধে। 'নসীরামের চাষের জমি মাত্র দুই বিঘা। তাতে দিন চলে না। তাই তাকে কেরায়া নৌকা বাহিতে হয়।' এই নসীরাম পিরোজপুর থেকে ফিরে এসে সোহাগভরে ডাকল, 'বৌ ও বৌ'। কিন্তু নিরুত্তর। শুধু প্রতিধ্বনি। পোষা কুকুরটা এসে কাছে দাঁড়াল। নসীরাম বিরক্ত, 'আ, মর মাগী দেখ না আসিয়া, গঞ্জের থা কত সামগ্রী আনছি।' কিন্তু ঘরের ঝাঁপ খোলা দেখে এবং লতা বাঘার কান্নার মতো শব্দ শুনে নসীরাম বুঝল, স্ত্রী উধাও। বনমালী খুড়োর কাছে সন্ধান পাওয়া গেল, আদরমণি নকুলের সঙ্গে পালিয়েছে। নকুল গ্রাম সম্পর্কে আত্মীয় আদরমণির সঙ্গে প্রকাশ্যে নানা রসিকতা করত। তাই নসীরাম কোনো সন্দেহ করেনি। নকুল এ কালের ছেলে 'ফুরুক ফুরুক সিগারেট খায়, জালি গেঞ্জি পরে,' নববধূ কিশোরী কুমারী দেখলেই ট্রেনের হুইস্‌লের মতন শিস দেয়। নসীরাম হাটেবাজারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করে, হাতে একখানি ধারালো দা। প্রতিহিংসায় নসীরাম দাঁতে দাঁত ঘষে। 'শুনিলে মনে হয় কোন হিংস্র জানোয়ার শিকারের হাড় চিবাইতেছে।'

নসীরাম কেবলি শত্রুর সন্ধান করে, কাদা কাঁটা জোঁক কিছু মানে না। গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে এক জায়গায় বন্ধু জয়নালের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা। চেহারা জীর্ণ শীর্ণ, যেন নসীরামের প্রেত। জয়নাল তাকে বাড়ি ফেরাতে পারেনি। নসীরাম দা দিয়ে জোঁক কেটে কুচিকুচি করে। নকুলকেও না-কি কুচিকুচি করবে।

শেষে পাইকপাড়ার হাটে গিয়ে পাগল নসীরাম আদরমণির সন্ধান পেল। এখন সে মুমূর্ষু। সেই করুণ অবস্থায় নসীরামের হিংসার হিসাব গোলমাল হয়ে গেল। আদরমণি নসীরামের অক্লান্ত সেবায় সংজ্ঞা ফিরে পায়। কিন্তু স্বামীকে দেখেই তড়িতাহতের মতো আবার চোখ বোঁজে। নসীরামের তৃপ্তি। 'ভালো ত তুই আমারেই বাস্‌তি।' আদরমণির মৃত্যুর পর নসীরাম গ্রামে ফিরে এল, নকুলও এল। মেঘলা দিনের নিস্তব্ধ অপরাহ্ণ। বর্ষাণান্তের কালো মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। নকুল সাঁকোর ওপর দিয়ে চলেছে গান গাইতে গাইতে—

ও মোর মন বাগানের পাখী
সাঁজের বেলায় উড়িয়া গেলি
দিয়ে গেলি ফাঁকি,
তোরে ধরিয়ে রাখিতে নারলাম রে।

হঠাৎ নকুল দেখে সামনে নসীরাম। যেন সে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে। চতুর্দিকে মিশকালো অন্ধকার। নীচের জল সাপের মতো ফুঁসে উঠে সাঁকোয় ধাক্কা লাগে। নসীরাম তার কাঁধে হাত রেখে বলে, 'আদরমণিরে ভুলাইয়া নিছিলি কেন, সে ত তোরে ভালবাসত না।' নকুল ঘর্মাক্ত, ইচ্ছে হয়, সে নসীরামের পায়ে ধরে। কিছুক্ষণ বিমূঢ় থেকে সে উত্তর দেয়, 'না বাসত না।' নসীরাম খুশী। এ জন্যেই আদরমণিকে সে 'হেলাছেদ্দায়' মেরে ফেলেনি, নকুলকেও কোনো আঘাত করেনি। একদিন নসীরাম কথাটা জয়নালকে বলে তৃপ্তি পেল: 'আদর ভাল আমারেই বাসত। ও শালা পাইছিল শুধু খোসা।'

'যৈবন' গল্প রমেশচন্দ্রের মনোবিকলনী প্রবণতার পরিচয়। পাঁচখানা হাল, সাতটি বলদ, তিনখানা টিনের ঘরের মালিক হীরালাল বেশ সচ্ছল গৃহস্থ। তার ছেলে গনুও চাষ আবাদ করে। প্রৌঢ় হীরালাল ক্ষেতের মাঝেই ছোট্ট ঘর বাঁধে। সঙ্গে থাকে বালবিধবা দুঃখী মেয়ে সুভদ্রা। কিন্তু প্রকৃতি দুঃখের বাধা মানে না। হীরালাল বলে, 'যৈবন বটে ভদ্দরার—আমার পাছ দুয়ারের পাকুড় বেক্ষডার মতন।' এই যৌবনের টানেই গভীর রাতে হীরালাল একদিন ঢেঁকিঘরে গিয়ে উপস্থিত। সুভদ্রা ভীত, বিস্মিত। তারপর সুভদ্রা-হীরালাল চার বছর সুখে কাটিয়েছে। ইতিমধ্যে হীরালালের অঙ্গে জরার লক্ষণ দেখা দিল। তখনো সুভদ্রার যৌবন আগত নয়। হীরালাল অনুভব করে, দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, হাত কাঁপে, কাজ নিখুঁত হয় না। সুভদ্রার সব নিখুঁত। একদিন কাঁপা-হাতে জলের গেলাস পড়ে মাংস-ভাত-জল একাকার দেখে সুভদ্রা বয়োধর্মবশেই হেসে

ফেলেছিল। হীরালাল সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। রোজই বোধহয় সে আড়ালে হাসে, আজ চোখে পড়ল। লাঠির ঘায়ে সুভদ্রার ডান হাত অবশ করে দিল হীরালাল। তবু একহাতেই সে সংসার চালায়। একবারও হীরালাল তার হাতের ব্যথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে না। 'তার নিকট যৌবনের এই পরাজয় যেন হিংস্র আনন্দের ব্যাপার।'

সামান্য চুন-হলুদেই আরোগ্য হয়ে ওঠে সুভদ্রা। কিন্তু হীরালালের কাশি কিছুতেই সারে না। হীরালাল মনস্থ করে, ছেলেদের কাছেই সে ফিরে যাবে। গনু বাবাকে নিতে আসে। সমস্ত জিনিস বোঝাই কাঠের বাক্সের ওপর সুভদ্রা বসে পড়ে। তার কি উপায় হবে? বৃদ্ধ হীরালাল যুবতী সুভদ্রাকে টেনে সরাতে পারে না, পিঠে লাঠির ঘা মারে। গনু প্রতিবাদ করে। আবার আঘাত। সুভদ্রার পক্ষে রুখে দাঁড়ায় গনু: 'মাইয়াডারে মারিয়া ফেলবা নাকি'। জরাগ্রস্ত হীরালালের ভর্ৎসনা, 'যৈবন দেইখ্যা ভোলছ হারামজাদা, সেইজন্য মোরে সরাইতে চাও।' সুতরাং হীরালাল যাবে না। 'সুভদ্রা তখন গনুর হাতের মধ্যে একটু একটু কাঁপিতেছে।' এমনি আর একটি গল্প 'কৈলাস'। যে পরিবারে সে কাজ করে চল্লিশটি বসন্ত পার হয়ে এসেছে, সে পরিবারে তার একটা স্নেহের দাবি ছিল। কিন্তু সে দাবি নিশ্চয় এমন নয় যে, বাড়ির কিশোরী কন্যাকে তার হাতে সমর্পণ করা যেতে পারে। অথচ পাড়ার লোকেরা কৈলাসকে রাগায়, যূথীর সঙ্গেই বাবুরা তোর বিয়ে দেবে। যূথীকে সত্যি কৈলাস যত্ন করে, সাঁতার শেখায়, বাগানে বেড়াতে নিয়ে যায়। সেই কোলে-পিঠে করা যূথীর বেণীবাঁধা টিপ-পরা পরিচ্ছন্ন চেহারা দেখে কৈলাস মুগ্ধ। লেখকের কথায়, 'প্রস্তরযুগের মানুষ একটা লাল পুতুল পাইলে যেমন ভালবাসিত এ ভালবাসা সেই ধরনের, স্নেহ ও বিস্ময়ের খাদে মিশানো আদিম প্রবৃত্তির একটা রূপান্তর।' জনৈক হরপ্রসাদের সঙ্গে যূথীর বিবাহ হয়। কিছুদিন কর্মবিরতির পর আবার সেই বাড়িতে এসে কাজে যোগ দেয়। তার আপনার জন বলতে ঘরে ছিল ভ্রাতৃবধূ টগর। সেও রসিকতা করে, 'এবারে বুঝি ভুইয়ারা বীথিরে দেবে কইছে?' বীথি যূথীর বোন। অন্য কোনোভাবে বীথির প্রতি তার অনুরাগ প্রকাশ পায় না। কেবল অন্যলোক ডাকলে যখন কৈলাসের সাড়া মেলে না, তখন বীথির কথায় নিঃশব্দে কৈলাস সব কাজ সেরে দেয়।

এ হেন বীথির বিবাহ। গৈলা থেকে বর ও সম্ভ্রান্ত বরযাত্রী আসবে। যে কখনও চিৎকার করে না, সেই কৈলাসের হঠাৎ হিংস্র গর্জন শোনা গেল। 'তার চোখে মুখে হিংস্র ভাব, মুখ দিয়ে লালা গড়াইতেছে, যেন খাঁড়া হাতে একটা গরিলা।' সকলে ভীত, বিপর্যস্ত। কিন্তু কৈলাস বুঝি মানুষ খুন করে। কেউ সাহস করে বাড়ি থেকে বেরোয় না। ওদিকে বর আগমনের ব্যাণ্ড বেজে ওঠে। বাজনা শুনে কৈলাসের অবস্থা 'লড়াইয়ের ষাঁড়ের মতন। সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে, শুনলে ভয় হয়।' বীথির মা প্রমাদ গোনেন। কিন্তু বীথি পায়ে পায়ে উঠোনের ওপর দিয়ে কৈলাসের দিকে এগিয়ে যায়।

'বৈকালের পড়ন্ত সূর্যের আলো তার মুখের উপর ঝলমল করে, নবযৌবনের জয়পতাকার মতন হাওয়ায় উড়িতে থাকে রেশম-কোমল কেশগুচ্ছ, উপবাসক্লিষ্ট চোখমুখের মধ্য দিয়া বুদ্ধির দীপ্তি যেন ঠিকরাইয়া বাহির হয়।' —কৈলাসের হাত ধরে বীথি বলল, 'খাঁড়াটা ফেলে দাও কৈলাসদা।' খাঁড়া ফেলে দিয়েই কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে কৈলাস। মানিকবাবুর কলমে হয়ত গল্পটি এখানেই সমাপ্ত হত, কিন্তু রমেশচন্দ্রের দরদী মন গল্পটিকে আদর্শবাদে পৌঁছে দিয়েছে। বিয়ে বাড়ির আনন্দ-হাসির প্রগলভ বন্যার মাঝে টগরের চুণ-পাত্র হাতে কুণ্ঠিত প্রবেশ আমাদের গভীর করুণা আকর্ষণ করে। 'পুষ্করা' 'হলুদপোড়া'র মতো গল্প। সংস্কারের অবসেশন এমনই জিনিস, অবিশ্বাসীর যুক্তিবাদও তার কাছে হার মানে। যোগমায়ার ছেলে নন্দ মৃত্যুর সময় পঞ্জিকামতে তিথিদোষ বারদোষ নক্ষত্রদোষ পেয়েছে। শবসংকারের পরও যোগমায়া পুষ্করাখণ্ডন করেননি। প্রথমে জগন্নাথ পোড়েল, পরে ক্রমশ কৈলাস ধূপী, ভুবন মাঝি, নবীন ঠাকুর আরও অনেকে যোগমায়ার বাড়ি সংলগ্ন বাগানে প্রেতাত্মার দর্শন পেয়েছে। যোগমায়ার বিশ্বাস হয় না। কারণ তিনি জানেন, 'যারা পাপ করে, ভগবানের বিধানকে ভঙ্গ করে' তারাই ভূত হয়। নন্দর জীবন ছিল অকলঙ্ক, পবিত্র।

যোগমায়া পাড়ার লোকের রটনাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে গভীর রাতে বাগানে বেরোলেন। 'যদি এসে থাকিস, একবার দেখা দে' বলে ডেকে ডেকে ক্লান্ত হলেন, কিন্তু নন্দের প্রেতমূর্তির সাক্ষাৎ পেলেন না। বাল্যসখী সরোজিনীর মুখেও পুষ্করার কথা শুনে এবং মৃত নন্দের প্রতি গভীর স্নেহ অনুভব করেই যোগমায়া ভাবলেন, তার এত সাধের নোনা গাছ, খাসচারা আম, পরগাছা ফুল সে কেমন করে ভুলবে। শেষে অপরিচিত কালো বিড়ালের মধ্যেই পুষ্করাপ্রাপ্ত নন্দকে দেখলেন যোগমায়া।

'পুষ্করা'-র অপর পিঠ 'প্রায়শ্চিত্ত'। এখানে কুসংস্কারের আড়ালে সঞ্চিত নির্মম সমাজসত্যের দিকে লেখকের দৃষ্টি পড়েছে। উমাশঙ্করের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দেশে এসেছে প্রবাসী পুত্র দিলীপশঙ্কর। গ্রামে পৌঁছেই মনে পড়ল বাবার বাল্যস্মৃতি, ছেলেবেলায় দেখা ডাইনীর কথা।

শ্রাদ্ধশান্তির আগে গ্রামের কর্তাব্যক্তি লোকের বাড়ি যাবার পথে থমকে দাঁড়ালো দিলীপ। কুশ্রী কাদামাখা চেহারার এক কৃষ্ণবর্ণ নারীমূর্তি তার সামনে। কিন্তু তার মধ্যেও যৌবনের চিহ্ন প্রস্ফুট। সে নারীমূর্তি ডোরির। ডোরি ছিল তাদের বাড়ির ঝি। অস্পৃশ্যা, তাই ঘরে ঢোকার হুকুম ছিল না। 'কি করে এ দশা হ'ল তোর?' প্রশ্নের জবাবে ডোরি বলেছে, 'তাই বলার লাগিই ত অপিক্ষে করছি।' পুরুষ মানুষ মেয়েছেলের যে সর্বনাশ করে ডাইনীর এ যুক্তি মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতারই ফল।

'মানুষ কি করে ডাইনী হয় এ জানার কৌতূহল ছিল তার বরাবর। আজ

কৌতূহল মিটল, শুনল ডাইনী সৃষ্টির কলঙ্কময় ইতিহাস মানুষের কাম, দ্বেষ ও হিংসার কাহিনী।' এখানেই গল্পটি শেষ হতে পারত। লেখক তারাশঙ্করের মতোই গল্পকে মাঝে মাঝে অতি পল্লবিত করেছেন। অবশ্য তাতে গল্পের আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়নি।

চিকিৎসক রমেশচন্দ্রের ব্যাধিনির্ণয়ের দুটি গল্প 'রোগনির্ণয়' ও 'গ্রহবৈগুণ্য'। রোগনির্ণয়ের কেন্দ্রবিন্দু জনৈক বাতিকগ্রস্ত স্বামী। তাঁর স্ত্রী না-কি চোদ্দ বছর অনিদ্রা-রোগগ্রস্ত। রোগের রুট নির্ণয় করার জন্যই চিকিৎসককে তিনি সব বললেন। তখন তাঁর স্ত্রী আঁতুড়ে। বরিশালের অরক্ষিত আঁতুড়ঘরে তেলের প্রদীপ নিভে গেছে। এমন সময় একটি শব্দ, বাঁশের দরমার ফাঁকে দেখা গেল ছায়ামূর্তি। সেই পাজীটা তাঁরই কাজিন। বললেন, নানাবিধ সন্দেহের কথা। কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে যেন সন্দেহ না করা হয়।

চিকিৎসক দেখলেন রোগিণীর অসুখ সামান্য। ভয় পাওয়া বা কাজিনের ছায়ামূর্তি দেখা সত্য নয়। সে রাতে পায়ের আঙুলে ইঁদুর কামড়েছিল। চিকিৎসক দু'জনকেই ওষুধ দিলেন। একজনের ব্যাধি, অন্যজনের ব্যাধির চেয়ে বাতিকই হল বড। 'গ্রহবৈগুণ্যে'ও মনোব্যাধি নির্ণয়। মানস ও অতীন দুই প্রৌঢ়। মানসের স্ত্রী বর্তমান, তরুণী স্ত্রী তাঁর গল্পের অনুরাগী এবং সুলেখিকা। অতীন এক রহস্যময়ী নারীর আকর্ষণের কথা বন্ধুকে বলে। সে অতীনকে আঙ্কল বলে, তার সঙ্গে বিবাহ সম্ভব নয় বলে এবং অন্য গ্রুম দেখতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও অতীনের ধারণা, মেয়েটি তাকে ভালোবাসে। অতীনের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মানস নিজেকে জানল। মানস উপলব্ধি করতে পারেনি যে, তারও মনোবিকার ঘটছিল। সেই বিকারেই মানস ব্যাধিগ্রস্ত।

জেণ্টল্‌ম্যান এ্যাণ্ড কোম্পানী, ওরাংওটাং, মানরক্ষা প্রভৃতি গল্পেও রমেশচন্দ্রের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সামাজিক মানসিক ব্যাধির উপসর্গ, কারণ ও নিরাময়ের আকাঙ্ক্ষা, তাঁর পরিচর্যাপ্রবণ স্নেহস্নিগ্ধ কবিরাজের মনটি চেনা যায়।

রমেশচন্দ্র আঙ্গিক-প্রকরণে হয়ত যথেষ্ট মার্জিত নন, সাঙ্কেতিকতায়, তির্যক শ্লেষে চোখে পডবার মতো আধুনিকও নন ; তবু মানুষের প্রতি গভীর মমতা ও আত্মীয়বোধে, গল্পের সংক্ষিপ্ত দ্যুতিময় বিন্যাসে তাঁর কোনো রচনাকেই একান্ত তুচ্ছ বলা যায় না। তিনিই বোধহয় কথাশিল্পে বাংলার শেষ স্বভাবশিল্পী। বনফুলের মতো পোষ্টকার্ড-গল্প প্রবাসীতে তিনিও লিখেছিলেন। সে সব এখন সুপ্রাপ্য নয়। পল্লীবাংলা ও নগরবাংলার জীবনে সমান আগ্রহী, অজাতশত্রু রমেশচন্দ্রের গল্পগুলি আমাদের জীবনপথের দু'পাশে ফোটা অজস্র ফুল, প্রত্যহের অত্যন্ত চেনা তাই চোখে পড়ে না, চোখে পড়লে তৃপ্ত হতে হবেই এমনি সে ফুলের আকর্ষণ।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা

চল্লিশের দশকেই অনিবার্যভাবে ভারতবর্ষের মানচিত্রে পরিবর্তন ঘটেছিল। ভৌগোলিক মানচিত্র নয়, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটই আমার উদ্দিষ্ট। এই দশকের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়; কিন্তু সমাজের নাড়িতে নাড়িতে যে-পরিবর্তনের ঝড়ো হাওয়ার টান লেগেছে তাঁর সূক্ষ্ম সংবেদী মনের তারে তার প্রতিস্পন্দন জেগেছিল। তাই অনাগত কালের ঈপ্সিত কবিকে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেছিলেন—

এসো কবি যত অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার।

আর চল্লিশের দশকের এক উদীয়মান কবি মহান্ অগ্রজের উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছেন—

এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর,
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।

*　　*　　*

যদিও সে অনাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক
আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ॥

অদ্ভুত যোগাযোগ! তবে কাকতালীয় নয়, ইতিহাসের যুগসন্ধিকে দুই কবি অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। এখানেই প্রবীণ ও নবীন কবির যোগসূত্র।

এক

কিন্তু সুকান্তর কবিতা হাতে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়বে কেন? রবীন্দ্রনাথের অভীপ্সার সেই 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন', কিংবা 'শৌখীন মজদুরি' সম্পর্কে হুঁশিয়ারি মনে রেখেও তো অনেক বর্ষীয়ান কবির নাম

স্মরণ করা যায়। সাম্যবাদী শিবিরেও অনেক অগ্রজ কবিরা তখন প্রতিষ্ঠিত বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সমর সেন প্রমুখের নাম তো বিনা আয়াসে মনে পড়ে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা' তরুণ পাঠকদের প্রায়-কণ্ঠস্থ। 'আমি কবি যত ইতরের, মুটে-মজুরের··· কর্মের আর ঘর্মের।' 'আজকের চাঁদ পুড়ে হোক বাঁকা কাস্তে' লিখে দিনেশ দাস বিখ্যাত হয়েছেন। সকলেই সুকান্তর পুরোবর্তী। এঁদের সকলেই খুব শিক্ষিত বিদগ্ধ, অনেকে পেশাতেও অধ্যাপক। টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড থেকে স্টিফেন স্পেণ্ডার, লুই ম্যাক্নীশ, লুই আরাগঁ, রোজার গারোদি প্রমুখ কবিদের রচনার সঙ্গে এই কবিদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ—অনুবাদে ও অনুকরণে তার ছাপ স্পষ্ট। তরুণ কবি হিসেবে প্রগতি শিবিরে তখন গোলাম কুদ্দুস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অবন্তী সান্যালের বেশ সমাদর। এঁরাও বিদগ্ধ মধ্যবিত্ত ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী।

কিন্তু সুকান্তর পুঁজি ছিল অল্প। একে তো তার আয়ুর ঘরে বিধাতা কৃপণ, তার ওপরে অবস্থা বৈগুণ্যে প্রবেশিকার গণ্ডি পেরোতে পারেননি। সুতরাং ইংলণ্ড-ফ্রান্সের কাব্য-আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে সেই সব য়ুরোপীয় কবিদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তিক্ততায় আশ্চয উত্তরণ, কিংবা আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যকলার চিত্রকল্প, শব্দ-ছন্দ-ধ্বনির অভিনব ব্যবহার কিছুই সুকান্তর জানা ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলার দুরূহতম সাধনায় তাঁরা যখন সিদ্ধিকে প্রায় করায়ত্ত আমলকিতে পরিণত করেছেন, তখন সুকান্ত অত প্রশস্ত কাব্যাকাশের দিকে না তাকিয়েও প্রচুর প্রেরণার আলো পেয়েছিলেন—যে আলোয় শেষদিন পর্যন্ত তিনি কলম ডুবিয়ে কবিতা লিখে গেছেন এবং পূর্বোল্লিখিত বয়ঃজ্যেষ্ঠ কবিদের ডিঙিয়ে তিনি পাঠকের মনের গভীরে পৌছে গেছেন।

বিবৃতিটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। উক্ত অগ্রজ 'কমিটেড' কবিদের চেয়েও সুকান্ত সহজে জনপ্রিয় হলেন কোন গুণে? অকালমৃত্যুর কারুণ্য বা বিশেষ রাজনীতিক দলের প্রচার-সহযোগিতা পাবার আগেই তো বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, শিবরাম চক্রবর্তী, প্রাণতোষ ঘটক প্রমুখের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও প্রীতি তিনি পেয়েছিলেন। তাহলে তাঁর সর্বতোমুখী সাফল্যের চাবিকাঠিটি কি?

দুই

সুকান্তর সাফল্যের রহস্য নিহিত তাঁর কবিভাষায়। সাথক কবি নিজের কবিভাষা সৃষ্টি করেন। যেমন style is the man, তেমনি কবিভাষা কবিব্যক্তিত্বের দর্পণ। প্রাগুক্ত অগ্রজ কবিদের জনগণপ্রীতি প্রায়শ মেধার অঙ্গীকার, হৃদয়ের সঙ্গে অন্বিত নয়। তাই কবিতা যে কমিউনিকেশন এ সত্যটাকেই তাঁরা উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিংবা এলিয়টী আদর্শে তাঁরা মনে করতেন যে, 'Funda-

mental brainwork' ছাড়া কবিতা বোঝা যায় না; সুতরাং সকলে না বুঝতে পারলেও কবিতা ঠিকই সিদ্ধির কৈলাশে পৌঁছে যাবে। ইংরেজি-ফরাসী-সংস্কৃত পুরাণের সঙ্গে লোকগাথার ঐতিহ্য মিলিয়ে প্রতীক বা চিত্রকল্প রচনা সেখানে উপযুক্ত পাথেয় যোগাবে। তাঁদের অতি-মার্জিত (সফিসটিকেটেড) বিদগ্ধ, শ্লেষ-বক্র পদবিন্যাস অবশ্যই গণমানসের হিতৈষী; কিন্তু হতবুদ্ধি সাধারণ পাঠক সে বাগ্-ব্যূহের মর্মভেদ করতে পারত না। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' থেকে 'ঐকতান', 'ওরা কাজ করে' পর্যন্ত ভালোই বোঝেন। কিন্তু তাঁরা জানেন না উর্বশীর সঙ্গে আর্টেমিসের সম্বন্ধ কিংবা উটপাখির মনোযন্ত্রণা। 'আপনার মুদ্রাদোষে হতেছি আলাদা' এই বোধ পরবর্তীকালের, তাও সব কবির নয়। এ ত্রুটি অবশ্যই আমাদের কলোনীয় শিক্ষাব্যবস্থারই ত্রুটি। তবু পাঠকের সঙ্গে কবিদের যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হচ্ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। শিক্ষিত কবিরা লিখছিলেন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিতরা পড়ছিল। দুশো থেকে পাঁচশো বই ছাপানো হত। পাঠকদের বোধবুদ্ধির প্রতি উপেক্ষা এবং তাচ্ছিল্য ঐ সব কবিদের গদ্য-রচনাতেও প্রকট। তাঁদের গদ্যশৈলীও গভীর প্রযত্নে ক্লিষ্ট এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সাবলীলতার পরিপন্থী।

সে ক্ষেত্রে সুকান্ত ভট্টাচার্য ব্যতিক্রম। তার আন্তরিক অনুভব এবং কাব্যরূপের মধ্যে কোনো উন্নাসিকতার আড়াল নেই; বৈদগ্ধ্যজনিত মুদ্রাদোষ নেই। আচণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথের বাংলা কবিতা অনেকগুলি সরণী বেয়ে এগিয়েছে। ধীরে ধীরে সাধারণ বাঙালী পাঠক সেগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। পরিচিত পথেই ঘটেছে ছন্দ ও ভাবের দিকে অনেক অভিনব প্রবর্তনা, কিন্তু বাংলার মাটির সঙ্গে নাড়ীর টান ছিন্ন হয়নি। স্বীকার করতেই হবে, গণজীবনের ক্রান্তিতে বিশ্বাসী উক্ত শক্তিমান কবিগোষ্ঠী সে টান গভীরভাবে অনুভব করেননি। এখানেই সুকান্তর জিত। বুদ্ধিবিলাসের পাকা সড়কে হেঁটে আত্মতৃপ্তির আনন্দে সে দিগ্‌ভ্রষ্ট হয়নি, তার কলমের ভাষার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের মুখের কথার ব্যবধান ঘটেনি। চল্লিশের দশকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু, নজরুল ইসলামের নীরবতা এবং উক্ত সমাজ-সচেতন কবিদের সঙ্গে পাঠক-সাধারণের চিত্তের অনন্বয় ঘুচলো সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতায়। যুগ প্রস্তুত ছিল নতুন কবির জন্য। সুকান্ত তাই আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

তিন

সার্থক কবিমাত্রেই নিজের ভাষা সৃষ্টি করেন। যেমন বলা যায় 'স্টাইল ইজ দ্য ম্যান' তেমনি কবিভাষা বিশেষ কবিব্যক্তিত্বের দর্পণ। সেই কবিভাষায় উপমা উৎপ্রেক্ষা রূপক শেষ ধ্বন্যুক্তি থাকবে; সমাসোক্তি ব্যাজস্তুতি থাকবে। আরও অনেক অলঙ্কার এবং বিবক্ষিত শব্দ-ধ্বনি-সঙ্কেত-প্রতীক ইত্যাদির ব্যবহার —যা

সেই বিশেষ কবির বিশেষ অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করে। সেই অভিপ্রায়েরই অনিবার্য রূপায়ণ। নতুবা সব ব্যর্থ, সব মিথ্যে। সে হবে এ কালের মম্মট ভট্টের কাব্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, সুকান্ত ভট্টাচার্য কি ঐ বয়সেই, তাঁর কবিভাষা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন? পরিণতির প্রথম পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন নিঃসন্দেহে। নিশ্চয় আরও পর্যায়-বদল হত। সে-সময় আর তাঁর জীবনে আসেনি। কিন্তু সুকান্ত যে নিজের পথের নিশানা পেয়েছিলেন তার নিদর্শন কয়েকটি অযত্ন চয়িত পঙক্তিতেও ধরা পড়ে—

(১) আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,

(২) মৃত্যুরা প্রত্যহ সঙ্গী, নিয়ত শত্রুর আক্রমণ
রক্তের আল্পনা আঁকে, কানে বাজে আর্তনাদ-সুর;
তবুও সুদৃঢ় আমি, আমি এক ক্ষুধিত মজুর।

(৩) ক্ষয়িষ্ণু দিনেরা কাঁদে অনর্থক প্রসব ব্যথায়।
নশ্বর পৌষ দিন, চারিদিকে ধূর্তের সমতা
জটিল আবর্তে শুধু নৈমিত্তিক প্রাণের স্পন্দন;

কয়েকটি টেনসন-ওয়ার্ড চোখে ও কানে দাগা দিয়ে যায়। যা ছিল স্বভাবে সোনার দেশ, ১৯৫০ সালে সেখানেই মন্বন্তর —অজন্মার জন্য নয়, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ, সাহা-ইস্‌পাহানীর সংযোগ, লোভী গভর্নর আমিরীর স্বর্ণমোহ ইত্যাদির পটভূমিতে দাঁড়িয়ে 'অবশেষে' কথার নতুন তাৎপর্য। লঙ্গরখানার ভুখামিছিল —পঞ্চাশের অতিপরিচিত ছবি, 'ভ্রষ্টনীড়' তাই নিছক 'ঘর-ছাড়া' অর্থবহ নয়। দেশপ্রেমিকরা কারারুদ্ধ, দেশ আন্দোলনে উত্তাল, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ শেষ আঘাত হানছে, অত্যাচার পীড়ন সত্ত্বেও তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কিন্তু সময়টা সঙ্কটের —এই জটিল মানসিকতার ব্যঞ্জনা ধরা যায় পরন্তু, বিপুল, হানে, নেই —শব্দের বিন্যাসে।

'বিপুল' বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েই —'মৃত্যুর স্রোত' এবং 'প্রাণের শিকড়ে' কবির সংবেদনের জগতে আলোড়ন তোলে। কি জীবনের অপচয়, কি সুলভ মৃত্যু! অন্যায় 'করে', কিন্তু কবির অমোঘ শব্দ 'অন্যায় হানে'। সাম্রাজ্যবাদের শেষ কামড়। প্রত্যহ নতুন নতুন পীড়ন —সুতরাং সবই আক্রমণ, হিংস্রতা, আঘাত। তাই 'হানে' ও 'নেই' এখানে সুকান্তর মনে ক্লিষ্ট বর্তমানের অনুভূতি এবং দেশপ্রেমীর ঘৃণাকে ফুটিয়ে তুলেছে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'মৃত্যুরা', 'আর্তনাদ-সুর' একই মনোভাবের তীরকাঠি, বিশ্বাসের সরু কিন্তু শক্ত সুতো দু'গাছি 'জানি', 'তবুও সুদৃঢ়' —তাদের গেঁথে রেখেছে। মেহনতী শ্রমিকের চেতনার সঙ্গে আত্মার সংহতি সম্পন্ন হয়েছে, তাই 'আমি এক ক্ষুধিত মজুর'; এবং সে জন্যেই তো মনে জোর, ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা। 'সুদৃঢ়' কথাটি পুরনো। কিন্তু নতুন অর্থ নিয়ে এসেছে। তৃতীয় দৃষ্টান্তে আছে আত্মগ্লানি, আত্মধিক্কার। প্রতিরোধ আন্দোলনে কেন সারা দেশ সামিল হচ্ছে না! কেন বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চেষ্ট দর্শকের ভূমিকায়। কিন্তু শত্রুরা বসে নেই। ওদিকে

'ধূর্তের সমতা' জোটবদ্ধ। 'ভান' কথাটির বিদ্রূপ লক্ষ্যভেদী। এইসব বক্তব্যমুখ্য ঠাসবুনোট শব্দচয়নে একটি বেদনাদীর্ণ তরুণ কবিমনের পরিচয় স্বতঃই উন্মোচিত। আন্তরিকতায় তিনি মহৎ কবিদের সতীর্থ।

চার

উপমাই কবিত্ব —প্রাচীনেরা বলেন। সার্থক কবি নিজের উপমা রূপক প্রতীক নির্বাচন করেন। সেই নির্বাচনেই তাঁর অন্তর্জগতের প্রকাশ। কয়েকটি রূপকাত্মক বাগ্‌বিন্যাসের দৃষ্টান্ত এখানে যথেচ্ছ সঙ্কলন করে দেওয়া গেল—

ভাঙি জীর্ণ সংস্কারের খিল / ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে /
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো / ঘৃণার কামান দাগি /
রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল /
অনুশোচনার আগুনে ছাই হচ্ছে উৎসাহের কয়লা /
মুক্তির ফুল / অগ্রগতির মেলে / সহানুভূতির চিঠি /
স্মৃতির ফেউ / সর্বনাশের থাল /

সুকান্ত বেশ কিছু কবিতা লিখেছেন যেগুলি প্রতীকেই স্থিত। অর্থাৎ পুরো কবিতাই প্রতীক —ভাব ও রূপের অদ্বৈতসিদ্ধি। যেমন সিঁড়ি, দেশলাই কাঠি, সিগারেট, আগ্নেয়গিরি, চিল এবং সম্প্রতি প্রকাশিত ড্রাইভার ইত্যাদি। রানার একটু ভিন্নগোত্রের —কাহিনীর ধরনে সূচনা, প্রতীকী জিজ্ঞাসায় সমাপ্তি। 'ঐতিহাসিক' কবিতায়ও চাল-চিনি-গম-কাপড়ের লাইন মুক্তির লাইনে পরিণত, সেখানে কবির চেতনা বিশ্বপ্রেক্ষিতে ব্যাপ্ত।

বস্তুত সুকান্ত যে-দশকের কবি তার প্রতিটি ভাবস্পন্দন তাঁর কবিতায় ধৃত ; বস্তুর আকারে, ঘটনার আকারে নয়, কাব্যের আয়তনে।

চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন ?
এ সব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।

এ পর্যন্ত ছবি সেকালের কিশোর তরুণদের অতি পরিচিত। কিন্তু সেই কষ্টের যন্ত্রণার দিনগুলিতে মানুষ যখন অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রাখতেই ব্যস্ত, তখন আত্মস্থ কবিই বলতে পারেন—

কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারো জন্যে চাই চল্লিশ কোটি দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।

পাঁচ

১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ সালের ঘটনাবলীর দিকে একবার পিছন ফিরে তাকানো যাক। প্রত্যেক কবি শিল্পীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁর কালের বিপ্লবকে শিল্পিত করেন। স্বকালকে আত্মসাৎ করেই কবি কালোত্তীর্ণ। সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন কাল-চিত্রের

কবি ? সেটি বুঝতে গেলে উক্ত ছ'বছরের ভারতবর্ষ এবং বাইরের দুনিয়ার পরিবেশ স্মরণ করতে হবে।

১৯৪১ সালে বাঙালীর জীবনে সব চেয়ে বড় ঘটনা রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। আনন্দবাদের ঋষি মৃত্যুর পূর্বে যেন মন্ত্রভ্রষ্ট হয়ে 'বিনিপাত, বিনিপাত' বলে সাম্রাজ্যবাদকে অভিসম্পাত দিয়েছেন। সভ্যতার সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে—এ কথাও রাজনীতিবিদ্‌রা বুঝতে পারেননি, বুঝেছিলেন কবি। যুদ্ধ চলছে। সুভাষচন্দ্র গৃহবন্দী। জাতীয় নেতারা দ্বিধাগ্রস্ত! তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিপদের দিনে তাকে আঘাত করতে চাইলেন না। তবু ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন হল। গান্ধীজী 'ভারত ছাড়ো' হাঁক দিলেন। হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষ সামিল। পুলিশ মিলিটারির অকথ্য পীড়ন। গুলিচালনা। সারা কলকাতা রণক্ষেত্র। ট্রাম জ্বলছে, বাস জ্বলছে। পথে পথে সাঁজোয়া গাড়ি, পথে পথে ব্যারিকেড, প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদ ও মৃত্যু। নেতারা সরে দাঁড়ালেন। আক্ষরিক অর্থে কারা 'বরণ' করলেন। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ, প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ, সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি—এই সময়েই সারা দেশে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪৫ সালে অনেক আন্দোলন। আবদুর রশীদের মুক্তি চাই। রশিদ আলি দিবস। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্তী প্রমুখ সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। নভেম্বরে আবদুস সালাম ও রামেশ্বর ব্যানার্জি শহীদ হলেন। রোজই ছাত্র-আন্দোলনে তীব্র প্রতিবাদ। দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নিজের কবিতা পড়লেন। 'একুশে নভেম্বর' সালাম ও রামেশ্বর ইত্যাদি। ডিসেম্বরে চট্টগ্রামে ছাত্র সম্মেলন। লোককবি রমেশ শীল গাইলেন—

তোমরা শুনছনি খবর ?
গুলি কইর‍্যা মানুষ মারে কৈলকাতা শহর।

সেখানেই সুকান্তর 'ঠিকানা' কবিতা পড়া হয়।

১৯৪৬ সালেও আন্দোলনের ঢেউ সমান জোরদার। প্রধান শত্রু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ। প্রধান দাবি স্বাধীনতা। কমিউনিস্টরা 'জনযুদ্ধ' ঘোষণা করেন। নানা বিরূপ সমালোচনা। কিন্তু আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৬ ফেব্রুয়ারী ছাত্র-ধর্মঘট, পুলিশ-ধর্মঘট, শ্রমিক-ধর্মঘট—১২-১৫ বিক্ষুব্ধ, উত্তাল শহর শহরতলী। ২৯শে জুলাই ঐতিহাসিক প্রথম সর্বভারতীয় ডাক-তার ধর্মঘট। ধর্মঘট ভাঙার ঘৃণ্য চক্রান্ত। পথে পথে গোরা পল্টনের পাহারা স্টেনগান রাইফেল হাতে। কে বলবে ১৫ই আগস্টের অন্ধকার আসন্ন। ২৯শে জুলাই নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল। সে জন্যেই সুকান্ত ভট্টাচার্য দাঙ্গা-বিপর্যস্ত সমস্ত মূল্যবোধের চিতাবহ্নিতে আচ্ছন্ন কলকাতায় লিখতে পেরেছেন—

আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাস
এবারের মত মুছে যাক ইতিহাসে। [সেপ্টেম্বর, ৪৬]

ঐ বছরেই ২১শে নভেম্বরে লিখেছেন—

আবার এসেছে অবাধ্য এক একুশে নভেম্বর।

এখানেই রয়েছে ১৯৪৫ সালের ইতিহাসের উল্লেখ : 'পিছনে রয়েছে একটি বছর, একটি পুরনো সাল / ধর্মঘট আর চরম আঘাতে উদ্দাম উত্তাল।' ফেব্রুয়ারির সর্বদলীয় ছাত্রসমাবেশের কথা স্মরণ করে সুকান্ত আশা প্রকাশ করেছেন, বিদেশী দস্যু এ-বার পর্যুদস্ত হবেই।

আবার আসছে তেরোই ফেব্রুয়ারি,
দাঁতে দাঁত চেপে
হাতে হাত চেপে
উদ্যত সারি সারি,
কিছু না হলেও আবার আমরা
রক্ত দিতে তো পারি ?

ছয়

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা সম্বন্ধে কোনো কোনো মহলে কিছু আপত্তি উঠেছে নান্দনিক মূল্যবোধের দিক থেকে। আপত্তিটা এই রকম —সুকান্ত আসলে ১৯৪৩-৪৬ সালের যুগসন্ধির কবি। বলা যায়, চারণ কবি। সত্যি তখন দেশ-সমাজের চেহারা দ্রুত বদলাচ্ছিল। সুকান্ত বয়সে তরুণ। কাঁচা বয়সে সব কথাই তিনি কবিতায় বলতে চেয়েছেন। তিনি স্লোগান দিয়েছেন, স্লোগান লিখেছেন। সুকান্ত রাজনীতিক কর্মী হিসেবে পোস্টার লিখেছেন, তাঁর কবিতাও অনেকাংশে পোস্টার ধর্মী। তাই ঘটনাচঞ্চল পরের দশক পেরিয়ে এসে তাঁর অনেক জোরালো কথাই নেভা-হাউই মনে হয়। বারবার মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, শত্রু, হানো, ভাঙো, মিছিল, ধর্মঘট ইত্যাদি শব্দের পাথর ডিঙিয়ে সুকান্ত যেখানে নিয়ে গেলেন, সেখানে কেবল পাঠক সমবেতভাবে মুষ্টিবদ্ধ হাতে দাঁড়াতে পারেন। তার আর একটা প্রমাণ নানা রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর কবিতার পঙ্‌ক্তি (আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই / আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি / সম্রাট হুমায়ুনের মত একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন / যেখানেই মুক্তির যুদ্ধ সেখানেই কমরেড লেনিন / নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট …ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয়।

সার্থক কবিতার অর্থতাৎপর্য কবিকে, তার কালকে অতিক্রম করে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধের তাৎপর্য জরুরী অবস্থার সময়ে নতুনভাবে আমরা উপলব্ধি করেছি। স্বৈরতন্ত্র বা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের রচনাংশ উল্লিখিত হয়। আমাদের মহত্তম সুখ ও কঠোরতম দুঃখের মুহূর্তেও রবীন্দ্রপঙ্‌ক্তি মনে পড়ে।

প্রতিবাদে, সংগ্রামে তিনি বাণীর হাতিয়ার জুগিয়ে দেন। দেয়াল-লিখনে রবীন্দ্রনাথ নজরুল-সুকান্তের অবস্থান। এতে মূল্য কমে না। কবিতার উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্মে নতুন সৃজনী উদ্দীপনার উৎস হতে পারে। এতে কবিতার জাত যায় না, সমালোচকের জাত ধরা পড়ে। যুগে যুগে শেক্সপীয়রের নতুন নতুন তাৎপর্য-প্রাপ্তি আমাদের মনে রাখতে হবে।

সাত

যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে আসি। কোন গুণে সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর চেয়ে বয়স্ক, প্রতিষ্ঠিত, বিদ্বান কবিদেরও অতিক্রম করে গেলেন? রবীন্দ্র-উত্তর কাব্যসাধনায় রবীন্দ্র-ধুত্তোর যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল য়ুরোপীয় আধুনিক কবিদের অনুকরণ-অনুসরণ। সে অনুসরণও মুখ্যত কালানুগ, ভাবানুগ নয়। যেমন কল্লোলগোষ্ঠীর কল্পনাবিহার ছিল ন্যুট হামসুন ও গর্কির সমন্বয়ে, তেমনি এইসব অগ্রজ কবিদের র‍্যাঁবো-এলুয়ার-এলিয়ট-স্পেণ্ডার চর্চা। রোজার গারদি, লুই আরাগঁ-র সঙ্গে এঁরা অনায়াসে এজরা পাউণ্ডকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ 'জনসাধারণ অসাধারণ' উক্তি সত্ত্বেও এঁদের বৈদগ্ধ্য এঁদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। পাঠক ও কবিকুলের মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যবধান হয়ে পড়েছিল ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথ নজরুল পর্যন্ত তাঁরা গ্রহণ করেছেন। করুণানিধান কুমুদরঞ্জনেও অসুবিধে হয়নি। সুকান্তের বৈশিষ্ট্য হল তাঁর চারপাশের অগ্রজমণ্ডলীর এই ঐতিহ্য বর্জিত এবং রবীন্দ্র-ধুত্তোর মানসিকতায় গা না-ভাসানো। ছোট ছোট গাছের সারি ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল পরিণততম বনস্পতির দিকে —যার নাম রবীন্দ্রনাথ এবং স্বভাবতঃই আর দৃষ্টি ফেরাতে পারেননি। সেখানেই পেয়েছেন প্রচুর প্রেরণা, উজ্জ্বল উপমা, প্রতিবাদের ক্রোধের উচ্চারণ। বাকিটুকু তাঁর নিজস্ব। বলা যায়, রবীন্দ্রকাব্যের উত্তরাধিকার তাঁর কবিতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বদুঃখজয়ী আশাবাদ, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ' তাঁর গান ও কবিতার পঙ্‌ক্তির নতুন প্রয়োগ, তাঁর প্রতি নিবেদিত গীতিনাট্য এবং কবিতা ইত্যাদি এক সঙ্গে পড়লে বোঝা যায়, দুই কবির আত্মীয়তা যেন নৈসর্গিক। সুকান্তর আত্মীকরণে চল্লিশের দশকেও রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল উপস্থিতি। এমন কি নবীন কবি প্রবীণ কবির হাতের লেখাও কি নিপুণ রপ্ত করেছেন।

একালের পাঠক যেন সুকান্তর কবিতায় চেনা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল —আচণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার ভাষা। ব্যবধান রইল না। এলিয়ট পাউণ্ড, কামিংস অপরিহার্য নয়। তাই সব রাজনীতির সম্পাদক পাঠক কবিমহলেই সুকান্ত জীবদ্দশাতেই সম্বর্ধনা পেয়েছেন, পেয়েছেন অকৃত্রিম ভালোবাসা।

কবি ছাড়া জয় বৃথা। নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছিল। নতুন যুগের উন্মাদনা। চল্লিশের ক্ষুব্ধ দশক। নতুন যুগ পেয়েছিল নতুন কবিকে —সুকান্ত ভট্টাচার্যকে।

নির্দেশিকা